উৎসর্গ

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন এম. এ, পি. এইচ. ডি, ডি. লিট

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

বর্তমান গ্রন্থ সংকলনের সূত্রপাতে একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা পত্র-সাহিত্যের একটি সংকলন প্রকাশ করাই অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু কাজ আরম্ভ করার পর আধুনিক যুগের লেখকগণের পত্র সংকলন করা সম্পর্কে নানা অসুবিধা দেখা দেয় ; তাছাড়া গ্রন্থের আয়তনের কথাও চিন্তা করে সে চেষ্টায় ক্ষান্ত থেকে বর্তমান খণ্ডে প্রধানত উনিশ শতকের যুগনায়কগণের পত্রাবলী সংকলন করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে, কোন যুগের নির্দিষ্ট সীমাকাল শেষ হওয়ার সঙ্গেই যে সে যুগের সকল মানুষের জীবৎকালও শেষ হবে এমন কোন কথা নেই। রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর, শ্রীঅরবিন্দ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বহু মনীষীরই জন্মকাল উনিশ শতকে কিন্তু তাঁদের কীর্তিকাল বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত প্রসারিত। তাই যুগগত সীমারেখা টেনে তাঁদের পত্রাবলী এই সংকলন থেকে কোনক্রমেই বাদ দেওয়া চলে না। তাছাড়া, বিশ শতকের প্রথম ভাগে বাঙালার জীবনে যে রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ ঘটে, স্বাধিকার অর্জনের যে প্রয়াস দুর্নিবার হয়ে ওঠে, ধর্ম, কর্ম ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সাধনা ও সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তা উনিশ শতকেরই আরব্ধ শিক্ষা-দীক্ষা, আদর্শ-অধ্যবসায়ের পরিণত ফল বলা যেতে পারে। সেজন্য এই সংকলনের সীমা নির্দিষ্ট করতে হয়েছে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে মোটামুটিভাবে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। বিশেষ করে সংকলনের শেষভাগের পত্রাবলীর নির্বাচন ও বিন্যাস এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগে সমাজ, ধর্ম রাজনীতি, সাহিত্য এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী বাঙালীর প্রাণমনের উদ্দীপ্তির পরিচয় লাভে কোন বিঘ্ন না ঘটে।

মুদ্রণ সংশোধনের কাজে নানা বিঘ্ন ঘটায় বইখানিতে মুদ্রণের কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি থেকে গেছে। যেমন ৮ম পৃষ্ঠার পংক্তির 'সব চিঠিই' এর পর 'প্রধানত' কথাটি বাদ পড়ে গেছে ; 'রবীন্দ্রনাথ' স্থলে 'রদীন্দ্রনাথ' ছাপা হয়েছে (পত্রপ্রসঙ্গে পৃঃ ২৭), 'সুখেই' এর পরিবর্তে 'মুখেই' দেখা দিয়েছে (পৃঃ ৭১) 'শুদ্ধ'কে 'অশুদ্ধ' করেছে 'সুদ্ধ' শব্দ (পৃঃ ৮১), 'ক্রমওয়েলের' জায়গায় 'ক্রমওয়েল' রয়ে গেছে (পৃঃ ৯০), শিবনাথ শাস্ত্রীর চিঠি সম্বন্ধে লেখকের

মন্তব্যের মধ্যে 'পিসতুতো'র জায়গায় 'পিসতুতে' হয়েছে আর 'ভাইকেও' এর পরে 'একটি চিঠি লেখেন' কথাগুলি বাদ পড়েছে (পৃঃ ৯৯), 'সন্দর্শনে'র পরিবর্তে 'স্বদর্শনে', 'পৌর্ণমাসীতে' এর স্থলে 'পৌর্ণবাসীতে' আর 'বল্লভগমন' এর স্থলে 'বল্লভগমণ' ছাপা হযেছে (পৃঃ ১২৪), 'ধর্মসম্বন্ধীয়' এর পরিবর্তে ধর্মসম্বন্ধীর' মুদ্রিত হয়েছে (পৃঃ ১২৭), 'এরা' হয়েছে 'এর' (পৃঃ ১৩৫), 'সাতান্ন'র বদলে 'সাভান্ন' দেখা দিয়াছে (পৃঃ ১৩৮)। এই ধরণের আরও কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। সহৃদয় পাঠকের কাছে সেগুলি পাঠের বিষম বাধা হয়ে উঠবে না বলেই বিশ্বাস করি।

অনুসৃত বানান-পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থকারের বক্তব্য অংশে আধুনিক বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মূল রচনার প্রতিলিপির বানান যথাযথ রাখারই চেষ্টা করা হয়েছে।

বিনীত

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

৫, পীতাম্বর দে লেন

শ্রীরামপুর

স্বাধীনতা দিবস '৫৬

সূচী

পত্রপ্রসঙ্গে

প্রাচীন যুগের পত্রচর্চা

রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছেন—"মেঘদূত পড়তে পড়তে আর একটা চিন্তা মনে উদয় হয়। সেকালেই বাস্তবিক বিরহী বিরহিণী ছিল এখন আর নেই। পথিকবধূদের কথা কাব্যে পড়া যায় কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা ঠিক অনুভব কর্ত্তে পারিনে। পোষ্টঅফিস্ এবং রেলগাড়ি এসে দেশ থেকে বিরহ তাড়িয়েছে।" সেকালের বিরহিণীরা কেশ এলিয়ে আদ্রতন্ত্রীবীণা কোলে করে ভূতলে পড়ে থাকতো কিনা কে জানে কিন্তু অতি প্রাচীন কাল থেকেই যে আমাদের দেশে পত্রচর্চার চলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বররুচির 'পত্রকৌমুদী' থেকে। জ্ঞাতব্য কথা ছাড়াও পত্রে থাকে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বা তুল্য ব্যক্তির ইতরবিশেষ জ্ঞাপনার্থে পাঠাপাঠের নির্দেশ, যাকে বলা হয় 'প্রশস্তি'। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'পত্রকৌমুদীর' ভূমিকায় লিখেছেন—"বররুচিকৃত 'পত্রকৌমুদী' নামক সংগ্রহই অধুনা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তদৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, প্রশস্তি রচনা বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বিশেষ মনোযোগ হইয়াছিল এবং তাদ্বারা তাঁহারা বিশেষ ঔৎকর্ষও সাধন করিযাছিল।"

রাজেন্দ্রলাল বররুচির বই-এর আরও পরিচয় দিয়েছেন—"উক্ত গ্রন্থের মতানুসারে পত্রলেখনের অঙ্গমধ্যে ব্যক্তিভেদে পত্রের পরিমাণ, পত্রের ভাঁজ, পত্রের রঞ্জন, পত্রের কোণ কর্ত্তন, পত্রে শ্রীশব্দবিন্যাস্, পত্রের পাঠ এবং শিরোনাম, এই কয় বিষযের উল্লেখ আছে।

"পত্রের পরিমাণ বিষয় লিখিত আছে যে উত্তম পত্র একহস্ত ছয় অঙ্গুলী, মধ্যম পত্র একহস্ত এবং সামান্য পত্র মুষ্টিহস্ত (মুঠম্ হাত) দীর্ঘ হওয়া কর্ত্তব্য। এই পত্রকে তিন ভাঁজ করিয়া তাহার উর্দ্ধের দুই ভাগ ত্যাগকরত শেষ ভাগে পত্র রচনা করিবে।

"পত্রের রঞ্জন-বিষয়ে বর্ণিত আছে উত্তমের পত্র স্বর্ণদ্বারা, মধ্যমের পত্র রৌপ্য দ্বারা এবং সামান্য পত্র রাং, তামা, সীসা প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জিত করিবে, এতদ্ভিন্ন ভদ্র নিয়ম রক্ষা হয়না।

"পত্রের কাগজ এইরূপ প্রস্তুত হইলে তাহার অধোভাগের দক্ষিণ কোণের এক অঙ্গুলি পরিমাণ কাটিয়া পত্রের উপরিভাগে মঙ্গলার্থে অঙ্কুশাকার এক রেখা ও তাহার মধ্যদেশে একবিন্দু, তাহার নীচে সাতের অঙ্ক, তাহার অধোভাগে

'স্বস্তি' এই শব্দের বিন্যাস করিয়া বিহিত প্রশস্তি লিখনান্তর পত্রের বক্তব্য রচনাকরত 'কিমধিকমিতি' লিখিয়া পত্রপ্রেরণের সংবৎসর মাস ও দিনের অঙ্ক দিয়া পত্র সমাপন করিবেক।

"তৎপরে পত্রের পৃষ্ঠে শ্রীবিন্যাস ও পত্রোর্দ্ধভাগে পত্রচিহ্ন নিয়োগ করা আবশ্যক। ব্যক্তিভেদে ঐ চিহ্ন এবং শ্রীসংখ্যার অন্যথা করিতে হয়। আদিষ্ট আছে যে, গুরুর পত্রে ৬শ্রী, স্বামীর পত্রে ৫শ্রী, রিপুর পত্রে ৪শ্রী, মিত্রের পত্রে ৩শ্রী এবং পুত্র স্ত্রী ও ভৃত্যের পত্রে ১ শ্রী লেখা কর্ত্তব্য।

"পত্রের চিহ্ন বিষয়ে কথিত আছে যে, রাজপত্রের ঊর্দ্ধ হইতে ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান নিম্নে চন্দ্রমণ্ডলের সদৃশ বর্ত্তুলাকার কস্তূরী কুঙ্কুম দ্বারা চিহ্নিত করিবেক। মন্ত্রি ও যতির পত্রে কুঙ্কুমের চিহ্ন, এবং পণ্ডিত ও গুরু ও পিতা ও পুত্র ও সন্ন্যাসীর পত্রে চন্দনের চিহ্ন, স্বামীর পত্রে সিন্দুরের চিহ্ন, স্ত্রীর পত্রে অলক্তের চিহ্ন, ভৃত্যবর্গের পত্রে রক্ত চন্দনের চিহ্ন এবং শত্রুর পত্রে রক্তের চিহ্ন নিরূপিত আছে।"

বলাবাহুল্য যে এই সব নিয়মের অধিকাংশই বেশি দিন বজায় থাকেনি। তবে প্রশস্তি চর্চা যে বরাবর চলে এসেছে তার বহু প্রমাণ আছে। বাংলা সাহিত্যের আলোচকেরা বাংলা গদ্যের উৎস সন্ধানে যাত্রা করে পৌঁছেছেন প্রায় চারশ' বছর আগেকার এক রাজসভায়। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ আহোমরাজ চুকাম্ ফা স্বর্গদেবকে চিঠি লিখছেন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা সেই বৈষয়িক চিঠিখানিই এখন পর্যন্ত প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের নিদর্শন বলে গ্রাহ্য। এক রাজা লিখছেন আর এক রাজাকে চিঠি; কাজেই রাজকীয় সম্বোধনের আড়ম্বরে ঘাটতি হ'লে চলবে না। অবশ্য সে চিঠি যতই রাজকীয় হোকনা কেন, একালের পাঠকের কাছে বিশেষণ-বহুল বলেই মনে হবে। সম্বোধনটুকু এখানে তুলে দেওয়া হ'ল :

"স্বস্তি সকল-দিগদন্তি কর্ণতালাস্ফল সমীরণ প্রচলিত হিমকর-হার-হাম-কাশ-কৈলাস-প্রান্তর-যশোরাশি-বিরাজিত-ত্রিপিষ্ট-ত্রিদশ তরঙ্গিনী-শলিল-নির্ম্মল-পবিত্র-কলেবর ভীষণ প্রচণ্ড ধীর-ধৈর্য-মর্য্যাদা-পারাবার সকল দিক্-কামিনী-গীয়মান্-গুণ সন্তান শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ প্রতাপেষু।"...কোচবিহাররাজের চিঠির সম্বোধন অংশটুকু প্রশস্তির মধ্যে গণ্য। এরও অনেক পরে প্রায় পৌনে দুশো বছর আগেকার বৈষয়িক চিঠিপত্রের প্রশস্তি চর্চা কেমন ছিল তার নমুনা ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের "প্রাচীন বাঙ্গলা পত্র সংকলন" গ্রন্থে

পাওয়া যায়। কোচবিহারের রাজার মত সুদীর্ঘ বিশেষণমালার উল্লেখ অবশ্য পাওয়া যায় না কিন্তু "৺মহামহিম মহিমা শ্রীযুতে বড়সাহেব জিউ", 'ইয়াদ্দাস্ত ও দরখাস্ত শ্রীরুদ্ররাম বড়ুয়া' ইত্যাদি সম্বোধনে পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান দেখানো হত। অনেক চিঠিতে দেখা যায়, তৎসম শব্দের পাশেই রয়েছে আরবী-ফারসী শব্দ। স্বাক্ষরের সঙ্গেও কোথাও আছে ফারসী সাল, কোথাও শকাব্দ, সন, শকাব্দ, মোতাবেক ইত্যাদি নানা ধরণের সালের উল্লেখ।

মুসলমান আমলে

মুসলমান রাজত্বকালেও বাংলা দেশে চিঠির পরিমাণ, রঞ্জন ইত্যাদি কি রকম হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা আছে। পারসীতে "দস্তুর সিবিয়ান" নামে পত্র রচনা পদ্ধতির বই লেখা হয়েছিল। এই বই-এ একশো রকমের চিঠি ও প্রশস্তির আদর্শ আছে। মুসলমান আমলে রাজা ও জমিদারের চিঠিপত্র লেখার যে আদর্শ বই থাকতো তার নাম 'আলকাপ'। জমিদার মুসলমান হলে তাকে কি ভাবে সম্বোধন করতে হবে তার নমুনা 'শিশুবোধকে' পাওয়া যায়।

"দেশের জমিদার যদি হয় মুসলমান।
বন্দেব চাকর বলি লিখিবে সেলাম॥"

'শিশুবোধক' থেকে স্বামীকে লেখা স্ত্রীর আদর্শ পত্রের কিছু নমুনা এখানে দেওয়া হ'ল।

"সাবিত্রী ধর্ম্মাশ্রিতা"—"গুণাধিকা স্বধর্ম্ম পরিপালিকা শ্রীমতী মালতী মঞ্জরী দেবী" - "ঐহিক পারত্রিক নিস্তারপূর্ব্বক ভবার্ণবনাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বরভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদপল্লবে নিবেদন করিতেছেন—

"শ্রীচরণসরসী দিবানিশি সাধনপ্রয়াসীদাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্যপ্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোরুহ স্মরণ মাত্রে অত্র শুভ বিশেষ।"

কোম্পানীর আমলে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের দেশী ভাষা শেখানোর জন্যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ফোর্ট উইলয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তার ঠিক দু'বছর পরে সিবিলিয়ানদের সহজে দেশীয় লোকের বৈষযিক ব্যবহার শেখানোর জন্যে রামরাম বসু 'লিপিমালা' রচনা করেন। এর প্রথম ধারায় ১৫টি আর দ্বিতীয় ধারায় ২৫টি আদর্শ পত্র আছে। 'লিপিমালার' পরও পত্ররচনারীতি সম্বন্ধে কয়েকখানি বই লেখা হয়েছে। তার মধ্যে রাজনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'বিজ্ঞানাঞ্জন' (১৮৪০ খ্রীঃ) এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "পত্রকৌমুদী" (১৮৪৭ খ্রীঃ) উল্লেখযোগ্য। 'বিজ্ঞানাঞ্জনে' নায়ক নায়িকার আদর্শ পত্রের যে নমুনা দেওয়া হয়েছে আজকের দিনে তা নেহাৎই অচল। নায়িকাকে দেখার পর নায়কের লেখা দ্বিতীয় পত্রের কিছু অংশ সে-বই থেকে এখানে তুলে দেওয়া হ'ল :

"স্বস্তি খঞ্জনগঞ্জনাক্ষি শ্রীমতী কামলতা গুপ্তা

মহাভাবিকা কামনাযিকাসমেষু।

৺স্বস্তি প্রেমাভিলাষিণ শ্রীচন্দ্রমোহন বর্ম্মণঃ তব সন্তোষে মদীয় হৃষ্টঃ পরং তব রূপ গুণানুরাগ শ্রবণে মনোজবাণে ব্যথিত চিত্তে স্থির করিয়াছিলাম যে দর্শনমাত্র গাত্রজ্বালা অদর্শন হইবে, পরে আপনার সাঙ্কেতিক পত্র পাইয়া আশে-পাশে বদ্ধ হইয়া শ্রবণানুরূপ রূপরঞ্জনে কিছুকাল হরণকরতঃ বারি প্রত্যাশায় বারিবাহ প্রতীক্ষায় নভোমণ্ডলে চাতকপ্রিয় তব দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কল্য সুখসাগরে সুরনিম্না-তীরে তপস্বীবৎ নিরাহারে প্রচণ্ড মার্তণ্ডতাপ সহিষ্ণু হইয়া উদয়াস্ত করিয়া সায়ংপ্রাক্‌কালে ভাগ্যফলে তব লাবণ্য দর্শনকরতঃ জ্ঞানহত হইয়া এই মত বিতর্ক করিয়াছি।......"

দাসী মারফৎ সেই পত্র পেয়ে নায়িকাও তার উত্তরে লিখছে : "পরচিত্তমধুর ভাষক প্রেমোপাসক শ্রীযুক্তবাবু চন্দ্রমোহন রায় মহাশয় যুবতীজন-মনোরঞ্জকেষুঃ ভাবানুভাবিকা শ্রীকামলতা গুপ্তায়াঃ।

রাম রাম নিবেদনমিদং উভয় হিতৈষিনী দাসী কস্তুরীমঞ্জুরী দ্বারা পত্র পাত্রে সুধাভিষিক্তা হইলাম অব্যবহিত গতে সায়াহ্নে কি কুক্ষণে তব সন্দর্শনে হতচিত্তা গতবুদ্ধ্যা হইয়া চঞ্চলাবৎ চঞ্চল আছি এবং স্বভাবানুভাবে তব ভাব বুঝিযাছি এতদ্বিষয়ে হর্ষবিষাদে জড়ীভূত হইয়া বুঝি দুর্য্যোধনের অকালে কালপ্রাপ্তি হয

যেমন রাম রাবণ বিরোধ উত্থানে মারীচ উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া নিহত হইল তেমন আমিও মিলনামিলনের উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি অমিলনে কটাক্ষানল-দহনে প্রাণরক্ষা ভার এবং মিলনেও কলঙ্ক দুর্নিবার পশ্চাৎ বিচ্ছেদানলে সংহার তাহার এড়ান নাই······" ইত্যাদি।

ইংরেজ রাজত্বের সূচনা কালে পারিবারিক পত্র রচনা রীতি কি রকম ছিল তার নজীর আছে মহারাজ নন্দকুমারের (১৭০৫-১৭৭৫ খ্রীঃ) মত সে-যুগের কৃতবিদ্য রাজপুরুষের চিঠিতে। নন্দকুমার টোলে ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন পড়েছিলেন আর সে-যুগের সরকারী ভাষা ফারসীও শিখেছিলেন ভাল করে। নন্দকুমারের পুত্রকে লেখা একখানি চিঠির কিছু অংশ নমুনা হিসাবে এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল ঃ-

"প্রাণপ্রতিমেষু পরম শুভাশীর্ব্বাদ শিরশ্চ বিশেষ ঃ—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করণক অত্র কুশল পরন্তু শ্রীযুক্ত মিস্তার মেদনটিন সাহেব ৯ই পৌষ সোমবার দুই প্রহর দিবসকালে এথান হইতে রাহীহর হইয়াছেন তাহার সহিত সকল কথোপকথন হইয়াছে তাহা কার্য্য দ্বারা বুঝিতে পারিবে তুমি কোন বিষয় অসন্তোষ করিবে না তোমার নামে ওয়ার্জীবন আরজ লিখাইয়া শ্রীযুক্ত বড় সাহেবের মিস্তার মেদনটিন সাহেব দিয়া দস্তখত করিয়া লইয়াছি শ্রীযুক্ত লালা সুবংস রায় অল্প দিবসের মধ্যেই যাইবেন ইহার মারফৎ পাঠাইব ইহা তোমাকে দিবেন তাহার এক পরামর্শ ঠাওরাইছি লালা মজকুরের প্রমথাৎ জ্ঞাত হইয়া তাহার মত কার্য্য করিবে জে জে বিপক্ষতা করিতেছে তাহারা পোশমান হবেক দাস্তমানের দফা এবং আর আর সবিশেষ সকল পশ্চাৎ লিখিব তাহাতে ওয়াকিফ হইবে।" ··

এ চিঠির ভাষা প্রচুর ফারসী শব্দ ঘেঁষা। বাক্যশেষে বিরতি চিহ্নেরও কোন বালাই নেই।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছেন—"এতদ্দেশীয় মুসলমানেরা পত্রের পরিমাণ ও রঞ্জন বিষয়ে অদ্যপি মনোযোগী আছে, কিন্তু হিন্দুসমাজে তাহার আর কোন অনুধাবন নাই। বিলাতি চিঠির কাগজে পত্রের প্রাচীন পরিমাণ লুপ্ত করিয়াছে। চন্দন·· হরিদ্রাদি দ্বারা পত্রচিহ্নকরণ কেবল বিবাহের সম্বন্ধ-পত্রে দেখা যায়; অন্যত্র তাহার ব্যবহার একেবারে রহিত হইয়াছে। প্রাচীন ভদ্র বাঙ্গালীদিগের পত্রে অদ্যপি কোণ কর্ত্তন ও শ্রীমুখের রীতি আছে; কিন্তু ত্বরায় তাহার লোপ পাইবার সম্ভাবনা; যেহেতু এই কালে পত্র

লিখিবার আবশ্যক নানাপ্রকারে বর্দ্ধিত হইয়াছে, অনেককে প্রত্যহ ৩০-৪০-৫০ খানি পত্র লিখিতে হয়; তাহাদিগের পক্ষে পত্র রঞ্জন-চিহ্ন স্বস্তি শ্রীমুখ কোণ কর্ত্তনাদির নিয়ম রক্ষা করা কোনমতে সুসাধ্য নহে; অধিকন্তু তাহার পরিত্যাগে কোন অভিষ্টের হানি হয় না, সুতরাং লোকে তাহার প্রতি সম্যক অনাস্থা প্রকাশ করিতেছেন।...আমাদিগের বিবেচনায় সকল পাঠ উঠিয়া গিয়া পত্রারম্ভে একটি মাত্র সম্বোধন রাখিলেই যথেষ্ট হয়।" রাজেন্দ্রলালের এই মন্তব্যের পর আদর্শ পত্র-রচনার আরও একখানি বই 'জ্ঞানকৌমুদী' প্রকাশিত হয়েছিল। তারও পরে বিশ শতকের প্রথম দিকে 'আদর্শ লিপি-মালার' সঙ্কলন প্রকাশ করেন আনন্দলাল সেনগুপ্ত। এই বই-এ সামাজিক ও বৈষয়িক পত্রের প্রশস্তি ও আদর্শ রীতি দেখান হয়েছে।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা পত্র রচনা পদ্ধতির ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। চিঠির সম্বোধন হিসাবে "শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন, প্রিয়দর্শন প্রভৃতি পাঠ ব্রাহ্মেরাই প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন।" চিঠির ভাষা ভাবগম্ভীর হয়েও যে কতটা সুন্দর ও মিষ্টি হতে পারে তার নিদর্শন ব্রাহ্মসমাজের নায়কদের লেখায় পাওয়া যায়।

পত্র ও পত্রসাহিত্য

উনিশ শতকের বাংলা পত্রাবলীকে সাধারণ চিঠি এবং সাহিত্যগুণান্বিত পত্র মোটামুটি এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ চিঠি বৈষয়িকতাশূন্য হলেও অল্পবিস্তর তথ্যপূর্ণ এবং সেই কারণেই সমসাময়িক সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এইধরণের চিঠি সাহিত্য-গুণান্বিত হয়ে ওঠে না। রচনারীতি এবং ভাষার সৌকর্যের কথা বাদ দিলে সাধারণ চিঠির সাহিত্য অপেক্ষা ঐতিহাসিক মূল্যই বেশী। জাতির পরিচয়, সংস্কৃতির রূপ এবং পত্রলেখকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের এমন নিখুঁত পরিচয় চিঠি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া শক্ত।

সাহিত্যগুণান্বিত চিঠি পত্র-লেখকের শুধু ব্যক্তিত্বেরই নয়, হৃদয়েরও স্পর্শবিজড়িত। এই ধরণের পত্রের সৃষ্টি বাইরের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে নয়। এ হ'ল সৃষ্টিধর্মী। আত্মপ্রকাশের এক নবভংগী। তাই এ সৃষ্টিতে আছে আনন্দ। সাহিত্যপদবাচ্য চিঠির কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

লিখেছেন—"যে চিঠিতে ভরতি মনের অবস্থায় জরুরী কথা ছাপিয়েও মুখরতা উদ্বৃত্ত থাকে—সেই চিঠিই প্রকৃত সাহিত্যপদবাচ্য।" সৃষ্টি প্রেরণার মূল কথাই ত মনের মুখরতা। যে মুখরতা থেকে ভাবের নানা-চারী অভিব্যক্তি, কবিতার স্ফুরণ, তা থেকেই সাহিত্যগুণান্বিত চিঠির জন্ম। রূপগত বৈশিষ্ট্য ছাড়া ভাল একখানি চিঠির সঙ্গে ভাবের গাঢ়তা বা প্রকাশের ব্যঞ্জনায় একটি নিটোল গীতিকবিতার কি বা তফাৎ! বরং জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন কবিতায় যে কথা বলেও বলা যায় না তখন একটি ভাল চিঠি লিখতে পারলে মন যেন খুশী হয়, অন্তরের ব্যাকুলতা প্রশমিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ত এমন অনেক চিঠি লিখেছেন যা একেবারে লিরিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু একথা ঠিক যে, "রীতিমত ভাল চিঠি লেখা খুব একট দুরূহ কাজ।" কবি নিজে লিখেছেন—"যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানালার ধারে বসে লেখে—আলাপ করে যায়—তার কোন ভার নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে। এই সব চলতি ঘটনার 'পরে লেখকের বিশেষ অনুরাগ থাকা চাই, তাহলেই তার কথাগুলি পতঙ্গের মতো হালকা পাখা মেলে হাওয়ার উপর দিয়ে নেচে যায়। অত্যন্ত সহজ বলেই জিনিষটি সহজ নয়...ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস। সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া অল্প লোকের শক্তিতেই আছে।" একথা সত্যি যে, এই সহজের রস পরিবেশন করে যশস্বী হ'তে পেরেছেন পৃথিবীতে অল্প কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে আবার মেয়ের সংখ্যাই বেশি।

সাহিত্যপদবাচ্য চিঠি আবার সব একজাতের নয়। কোন চিঠি অন্তহীন নীল আকাশের মত স্নিগ্ধ ও অতলস্পর্শী। সে চিঠি ভাবসমৃদ্ধ ও মননধর্মী। আবার কোন চিঠি যেন শরতের আকাশের বুকে ভেসে যাওয়া হাল্‌কা মেঘ। তাতে নানা ছবি, নানা ভাব, সুরের প্রতিধ্বনি। দ্বিজেন্দ্র নাথ, বিহারীলালের ছড়া-চিঠির ভাবকল্পনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিন্ন-পত্রের গোত্র মেলে না। আবার রবীন্দ্রনাথের 'পথে ও পথের প্রান্তে'র চিঠির সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর চিঠির সুর মেলে না। কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় আর শরৎচন্দ্র—এঁরা দুজনেই কত হাল্কা, হৃদ্য চিঠি লিখেছেন কিন্তু তাঁদের চিঠির মধ্যেও শুধু বাণীভংগীরই নয়, দৃষ্টিভংগীরও পার্থক্য সুপরিস্ফুট।

উনিশ শতকের চিঠির বৈশিষ্ট্য

বর্তমান সঙ্কলনে উদ্ধৃত সব চিঠিই উনিশ শতকের মনীষীদের লেখা। বাংলা দেশ এবং বাঙালীর ইতিহাসে উনিশ শতক নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় নবজাগরণের যুগ। এই নবজাগরণের লক্ষণ সে যুগের সমাজ-সাহিত্য-ধর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। জাতির আত্মবিস্মৃতি কেটে গিয়ে আত্মপরিচয় হয়েছে প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস জেগেছে। কিন্তু বাঙালীর মানস-জীবনে যে ভাবে আঘাত-প্রতিঘাত-সামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়ে এই নবজাগরণের সূচনা হ'ল তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। সে বিষয়ে আলোচনা যে কম হয়েছে তা নয়, কিন্তু সে যুগের গূঢ় প্রবৃত্তি, সংস্কার ও মানসিক রূপান্তরের সমগ্র পরিচয় কোন এক গ্রন্থে বিধৃত নেই।

ইংরেজী সভ্যতা ও শিক্ষার সংস্পর্শে এসে উনিশ শতকে বাঙালীর ভাবজীবন ও চিন্তাজীবনে যে বিপ্লব দেখা দেয় তার লক্ষণ ও পরিচয় সমগ্র যুগের সাধনায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। কোন একজন যুগনায়কের সাধনায় তার স্ফুরণ ও বিকাশ ঘটেনি। এই মানসিক বিপ্লবের ফলে বাইরের জগতে প্রথম সংঘাত বাঁধে বাঙালীর সমাজ-প্রাঙ্গণে; সে প্রাঙ্গণে প্রথম নতুন অস্ত্র নিয়ে এলেন রামমোহন, কিন্তু সেই অস্ত্র ইংরেজী শিক্ষা সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে, "এ-যুগের প্রধান ও মূল প্রবর্ত্তনা ইংরেজী শিক্ষার ফলেই ঘটিয়াছে,······সে পক্ষে কোন ব্যক্তিবিশেষই যুগ-প্রবর্ত্তক নহেন; ছোট বড় কত পুরুষেরই প্রচেষ্টা, এবং শেষে জাতির প্রবুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা সেই শিক্ষাকে প্রসারিত ও প্রয়োজনীয় করিয়াছে।"

নব জাগরণের সেই বিচিত্র ইতিহাসের কথা মনে রেখেই বর্তমান সঙ্কলনে সে-যুগের সাধকদের পত্রাবলী কালানুক্রমিক যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কেবলমাত্র চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে সে-যুগের সাধনা ও সংস্কৃতির পরিচয় দেওয়া যায় না। এখানেও সে চেষ্টা করা হয়নি। উনিশ শতকের বাঙালীর মানস-জীবনের নব-চাঞ্চল্য, চরিত্রগত সংস্কার, আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও মহতী প্রয়াসের কিছু পরিচয় দেওয়াই বর্তমান সঙ্কলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। সে-যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা এবং প্রাণের আকৃতির এমন সত্য পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না।

উনিশ শতকের ইংরেজী পত্র-সাহিত্যের সঙ্কলয়িতা James Aitken লিখেছেন—"It is one thin to read in history books of such an era of change, the results of which are familiar and commonplace to us all, it was a different thing to live in it; not knowing how far the changes would go or what the effect of them would be" অর্থাৎ যে নবযুগের ফলাফল আমরা নিতান্ত সাধারণ কাহিনী বলে জানি ইতিহাসের পাতায় সেই যুগ-পরিবর্তনের কাহিনী পড়া এক জিনিষ, আর সেই পরিবর্তন কতখানি কার্যকরী হবে বা তার ফলে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তা না জেনে সে-যুগে বাস করা অন্য জিনিষ। উনিশ শতকের বাংলার ভাব-বিপ্লবের ফলাফল অবশ্যই নিতান্ত সাধারণ নয় কিন্তু এক্ষেত্রে লেখকের মূল কথাটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সে যুগের নীরস ইতিহাসের তুলনায় যুগসাধকদের চিঠিপত্র আরও চিত্তাকর্ষক। নতুন ভাব-চিন্তা তাঁদের মনোজগতে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটেছে তাঁদের চিঠিপত্রে। বর্তমান গ্রন্থে যতদূর সম্ভব প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের চিঠিই সঙ্কলিত হয়েছে। বলাবাহুল্য যে এই সঙ্কলন সম্পূর্ণ নয়। স্বভাবতই অনেকের চিঠি এ থেকে বাদ পড়েছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, এ'ধরণের সঙ্কলনকে একটা সামগ্রিক রূপ দেওয়া যেতে পারে না। তাই সে চেষ্টায় ক্ষান্ত হয়ে সে যুগের চিঠিপত্রের মধ্যে যুগচিন্তা কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পত্র কি ভাবে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তারই এক নমুনা সঙ্কলন উপস্থাপিত করা হয়েছে।

পত্রে যুগকথা : রামমোহন

এখন সংক্ষেপে সেই যুগসাধকদের চিঠিপত্রের আলোচনা সূত্রে যুগের মর্মকথায় আসা যাক্।

ভারতে আধুনিকতার অগ্রদূত রামমোহনই প্রথম বাংলা গদ্য রচনারীতিকে সরল ও সুষম করে তুলতে চেষ্টা করেন। বর্তমান সঙ্কলনে রামমোহনের যে চিঠিটি দেওয়া হয়েছে সেটি ইংরেজিতে লেখা হলেও অত্যন্ত মূল্যবান। শিবনাথ শাস্ত্রী সে চিঠির প্রসঙ্গে লিখেছেন—"রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাকেই এই নব যুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি বা ভেরি-নিনাদ মনে করা যাইতে পারে। তিনি যেন স্বদেশবাসী-দিগের মুখ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে ফিরাইয়া দিলেন।"

দেবেন্দ্রনাথ

এই ভাবে রামমোহনের রচনার মধ্যে দিয়ে বৈষয়িকতাহীন চিঠির যে সূচনা হ'ল উত্তরসাধক দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলীর মধ্যে দিয়ে তা আরও অনেকখানি এগিয়ে গেল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ দেবেন্দ্রনাথকে মহর্ষি উপাধি দেন। তত্ত্ববোধিনী সভা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যাতা দেবেন্দ্রনাথের গদ্য রচনারীতির সরলতা এবং ব্যঞ্জনা বিস্ময়কর। দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভায় উদ্ভাসিত। এর সুরে গাম্ভীর্য, ইঙ্গিতে প্রসাদ, আস্বাদনে শান্তি। তিনিই প্রথম পত্রকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করে গেলেন।

বিদ্যাসাগর

উনিশ শতকের বাঙালীর জীবনে নবজাগরণের দ্বিতীয় তরঙ্গ নিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মানবিকতার মূর্ত প্রতীক বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস, যুক্তি, কর্তব্যনিষ্ঠা আর সংস্কারব্রতের মধ্যেই সে যুগের সমস্ত যুগলক্ষণ সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের নৈষ্ঠিক শিল্পী। তাঁর কলানৈপুণ্যে বাংলা গদ্য অলংকৃত হয়েছে। এই কৃতিত্বের পরিচয় তাঁর অন্যান্য রচনা ছাড়া পত্রাবলীতেও মেলে। কিন্তু শুধু গদ্যসাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে নয়, বিদ্যাসাগরের মর্মবেদনা এবং সমসাময়িক সমাজের প্রাণহীনতা উপলব্ধি করার পক্ষে তার চিঠিগুলি অমূল্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"তাঁহার মতো লোক পরমার্থিকতা ভ্রষ্ট বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া চতুর্দিকের নিঃসাড়তার পাষাণখণ্ডে বারংবার আহত-প্রতিহত হইয়াছিলেন বলিয়া, বিদ্যাসাগর তাঁহার কর্মসঙ্কুল জীবন যেন চিরদিন ব্যথিত ক্ষুব্ধভাবে যাপন করিয়াছেন।" বিদ্যাসাগরের এই ব্যথিত ক্ষুব্ধ জীবনের পরিচয় তাঁর পত্রাবলীতেই আছে।

অক্ষয়কুমার ও প্যারীচরণ

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের কাজে যাঁদের আন্তরিক সমর্থন এবং সহানুভূতি ছিল অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচরণ সরকার তাঁদের অন্যতম।

অক্ষয়কুমার জ্ঞানপিপাসু, শিক্ষাবিস্তারেও তাঁর সমান উৎসাহ। ১৮৩৪

থেকে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনা করে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি আদর্শ স্থাপন করেছেন।

প্যারীচরণ ছিলেন রামতনু লাহিড়ীর নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন। 'সুরাপান নিবারণী সভা' সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁর অক্ষয় কীর্তি। প্যারীচরণের স্বাদেশিকতা এবং তেজস্বীতার দুর্লভ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চিঠিতে।

রাধাকান্ত দেব

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ বাংলা দেশে নানা কারণে স্মরণীয়। এই বছরেই 'বঙ্গদেশীয় জমিদার সভা' এবং 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' এক করে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার লক্ষ্য হয় সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক উন্নতি। রাজা রাধাকান্ত দেব এই সভার সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ সমাজের শীর্ষস্থানীয়েরা এই সভার সভ্য ছিলেন।

"সভাটি স্থাপিত হইবামাত্র ইহার শক্তি সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন। ইংরাজ রাজপুরুষগণ দেখিলেন দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ আপনাদের অভাব গভর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য এবং দেশীয়গণের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এদেশীয়দিগের প্রতি তাহাদের যে উপেক্ষার ভাব ছিল তাহা তিরোহিত হইতে লাগিল। দেশের লোকও জানিল তাঁহাদের হইয়া বলিবার জন্য লোক দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সকল শ্রেণীর দৃষ্টি এই নবপ্রতিষ্ঠিত সভার দিকে আকৃষ্ট হইল। একথা এখানে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সে সময়ে সে আশা প্রচুর পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছিলেন। যখন দেশের লোকের হইয়া বলিবার কেহই ছিলনা, তখন তাহারাই একমাত্র মুখপাত্র ছিলেন।" শিবনাথ শাস্ত্রীর এ উক্তি যে কতদূর সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারত-বন্ধু রেভারেণ্ড জে, লং সাহেবকে লেখা রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ দেব, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ কলিকাতার আরও ৪৩জন ভারতীয়ের পত্রে।

রাজেন্দ্রলাল

'ভার্ণাকিউলার লিটারেচর কমিটি' বা বঙ্গভাষানুবাদক সমিতিও এই বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

এই সমিতির আনুকূল্যে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এই সচিত্র মাসিক পত্রটির স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজেন্দ্রলাল সমাজ-সেবা, সাহিত্য পুরাতত্ত্বচর্চা, রাজনীতি কিছুই বাদ দেননি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা।" রাজেন্দ্রলালের চিঠিতে তাঁর ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দুকলেজের ছাত্র

উনিশ শতকে নববাংলার উন্মেষ সাধনে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার ও লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও সাহেবের অবদান অসামান্য। তাঁদের সেই জ্ঞান-সাধনার কথা সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করেই তাঁদের উত্তরসাধক ও প্রধান শিষ্যদের প্রসঙ্গে আসা যাক্। মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ সে যুগের 'ইয়ং বেঙ্গল'দের স্বভাব, আচরণ, নীতিবোধের মধ্যে পার্থক্য বড় কম ছিলনা কিন্তু এঁরা "সকলেই সগোচরে এবং কখনো কখনো নিজেরও অগোচরে স্ব স্ব প্রযত্ন দ্বারা মূল সাধন-প্রবাহকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।" এঁদের সেই বিচিত্র কর্ম-সাধনা ও আদর্শের কিছু আভাস চিঠিপত্রে আছে। সে যুগের মূল প্রেরণা বাংলা ভাষায় বিশেষ করে কাব্যের মধ্যে দিয়ে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার ইঙ্গিত রয়েছে মধুসূদনের চিঠিতে। সে চিঠি ইংরেজীতে লেখা বটে কিন্তু তার সুর বাংলা, আবেগ বাঙালীরই।

গিরিশচন্দ্র

বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন তথা জাতীয় চেতনার উন্মেষে "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার অবদান সুপরিজ্ঞাত। পেট্রিয়টের সম্পাদকরূপে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বাস্তবিকই হরিশ্চন্দ্রের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা এবং গঠনমূলক দৃষ্টিভংগী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল। তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড ক্যানিং পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্রের সমালোচনা পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর আগে "হিন্দুপেট্রিয়টে"র সূচনাকালে সম্পাদক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইনি পরে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক রূপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে লেখা গিরিশচন্দ্রের একটি মূল্যবান চিঠি এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

যতীন্দ্রমোহন

বাংলা সাহিত্যের পোষক ও উৎসাহদাতা হিসাবে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে। মধুসূদনের নতুন ছন্দ নিয়ে পরীক্ষার কাজে তিনি ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতা। তাঁর আহ্বানেই মধুসূদনের একাজে উৎসাহ আর উত্তেজনা।

কেশবচন্দ্র

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মধর্মের প্রচার এবং নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা করার স্থান এ নয়। তবু সে যুগের অধ্যাত্ম আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে কেশবচন্দ্রের উল্লেখ করা দরকার। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্যে ইংলণ্ডে যান। সেখান থেকে স্ত্রীকে তিনি যে চিঠি লেখেন বর্তমান সঙ্কলনে তা উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা তাঁর আর একটি চিঠিও উদ্ধৃত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতান্তরের ফলে নববিধান সভা প্রতিষ্ঠার অনেক পরে তিনি এই চিঠি লেখেন।

বিহারীলাল

মধুসূদনের পর বিহারীলাল চক্রবর্তী আর একবার বাংলা কাব্য-ধারার মোড় ফিরিয়ে দিলেন। কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্য-কলার বহুমূল্য কারু-খচা জীর্ণ আভরণ সরিয়ে দিয়ে তিনি কাব্যলক্ষ্মীর অঙ্গে তুলে দিলেন বাসন্তীরঙের নব সজ্জা। রসিক চিত্তে সাড়া জাগলো। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাহিত্য-প্রাঙ্গণে স্বাগত জানালেন। বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথকে বিহারীলাল পদ্যে যে দীর্ঘ চিঠিখানি লেখেন সেটি এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র

উনিশ শতকের নবজাগরণের লক্ষণ সাহিত্যের মধ্যে প্রথম প্রতিফলিত হয় কাব্যে মধুসূদন এবং গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। বঙ্কিম ইংরেজী শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন কিন্তু বিলাতী দেশপ্রেমকে তিনি কোনদিন সুনজরে

দেখেননি। ইংরেজী সাহিত্য-দর্শন চর্চা করতে গিয়ে মাতৃভাষাকে ভুলতে বসেননি বরং দীনা মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনেই তৎপর হয়েছিলেন।

আগুস্ত কোঁৎ-এর (Auguste Comte) মানস-শিষ্য বঙ্কিম ছিলেন মানবতার পূজারী। ব্যক্তি অপেক্ষা জাতির কল্যাণই তাঁর কাছে বড় ছিল। বাংলার জনগণের কল্যাণ-ব্রতই ছিল তাঁর আদর্শ. একটি চিঠিতে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"আমাদের কর্তব্য, নিজেদের সাহেবীয়ানা কিছু পরিমাণ ত্যাগ করিয়া দেশের জনসাধারণের নিকট তাহাদের বোধগম্য ভাষায় বক্তব্য পেশ করা।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই মূল্যবান চিঠিটি যথাস্থানে উদ্ধৃত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের বন্ধুবান্ধবকে পদ্যে চিঠি লেখার অভ্যাস ছিল। রাজনারায়ণ বসুকে তিনি প্রায় মন্দাক্রান্তা (?) ছন্দে এক ছড়া লিখে পাঠান। দ্বিজেন্দ্রনাথ শুধু দার্শনিক নন, তিনি কবি, রসিক, দিলখোলা হাস্যময় পুরুষ। তাঁর এই দিল-দরিয়া মেজাজের হদিশ পাওয়া যায় বহু চিঠিতে। খাস্ দেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দ জুড়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজে গম্ভীর হয়ে পাঠকের মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছেন। চিঠিতে ইংরেজী শব্দ তিনি একটু বেশী ব্যবহার করতেন। লঘু আলাপের চিঠি তাঁর মনের এক অংশের প্রতিচ্ছবি। গভীর চিন্তামূলক চিঠিও তিনি লিখেছেন। সে সব চিঠিতে আছে নানা জটিল সমস্যার আলোচনা। কিন্তু লেখার ভংগী অত্যন্ত সহজ এবং রসায়িত।

কালীপ্রসন্ন

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' এবং মহাভারতের বাংলা অনুবাদ কালীপ্রসন্ন সিংহের অক্ষয় কীর্তি। কালীপ্রসন্ন কর্মী। কর্মের আদর্শ নিয়েই তিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভা স্থাপন করেছেন, সমাজ সংস্কারের কাজ করেছেন। তাঁর সমাজসংস্কারেচ্ছার নিদর্শন হিসাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের উদ্দেশে লেখা চিঠিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের মত কালীপ্রসন্ন ঘোষও ছিলেন সাহিত্য-কর্মী। বাংলা ভাষাকে বিশুদ্ধ করে তোলাই ছিল তাঁর ব্রত। সেই উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমের

'বঙ্গদর্শনের' আদর্শে তিনি 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষা‹ ওপর অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় আছে তাঁর চিঠিপত্রে।

চন্দ্রনাথ

বাংলা সাহিত্যে চন্দ্রনাথ বসুর স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"বাংলা সাহিত্যে চিন্তাশীল সাহিত্যরসোত্তীর্ণ প্রবন্ধ লেখকের সংখ্যা অল্প; বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব, বঙ্কিম এবং পরবর্তীকালে রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ—ইঁহাদের মধ্যে ভূদেব-শিষ্য চন্দ্রনাথ বসুও একজন।" বর্তমান সঙ্কলনে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর যে চিঠিটি তুলে দেওয়া হয়েছে তা চন্দ্রনাথের সমালোচনা-শক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই সূক্ষ্মদর্শী সমালোচককে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী য়ুরোপীয সমালোচকদের সমকক্ষ বলে অভিনন্দিত করেছেন।

দ্বারকানাথ

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। এই সভা প্রতিষ্ঠার কাজে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন কর্মী। তাই সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজসংস্কার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি সব কাজের প্রাঙ্গণেই তাঁর গতিবিধি ছিল অবাধ। "মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দীকালের (৫৪ বৎসর) জীবনে তিনি যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, অথবা যে সকল কাজের সূত্রপাত করিয়াছে৲, নিরলস অক্লান্ত কর্ম্মী না হইলে কাহারও পক্ষে তাহা করা সম্ভব নয়।"

নবীনচন্দ্র

'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' এর কবি নবীনচন্দ্র সেন 'প্রবাসের পত্রে' ভারতের তীর্থ ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের কিংবদন্তী-মেশানো অতীত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। চিঠির ভাষা কবির ভাবনার অনুগামী। কোথাও গুরু গম্ভীর সংস্কৃত শব্দসমৃদ্ধ, আবার কোথাও সরল, সহজ, চপল ও কৌতুকময়। ঐতিহাসিক চিত্র হলেও এ-পত্রাবলীর সাহিত্যিক মূল্য আদৌ নেই বলা যায় না। স্বদেশপ্রেমী কবি মানসের বিস্ময়-আনন্দ-ভাবাবেগের আন্তরিকতাটুকু দুর্লক্ষ্য নয়। মাঝে মাঝে গভীর মননেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

শিবনাথ

উনিশ শতকে যে মনীষীদের সাধনায় বাংলা দেশে নবযুগের সূচনা হয় শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদের অন্যতম। গভীর অধ্যাত্ম প্রেরণা এবং ঐকান্তিক স্বদেশানুরাগ তাঁকে আজীবন কল্যাণের কাজে অনুপ্রাণিত করেছে। শিবনাথ শুধু ধর্মবেত্তা এবং দার্শনিক নন, তিনি কবি, তিনি কল্যাণব্রতী। হেমলতা দেবী লিখেছেন, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিবনাথের ধর্মজীবনের সর্বোৎকৃষ্ট কাল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিবনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু তার পরের বছর তিনি কেশব-চন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। এর কয়েক বছর পর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতান্তরের ফলে যখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি সেই সমাজে যোগ দেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ ইংলণ্ডে যান। সেখানকার নানা প্রতিষ্ঠানের কর্মধারা এবং ইংরেজদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। স্বদেশে ফেরবার পথে তিনি কন্যাকে লেখেন—"যতই বাড়ির দিকে যাইতেছি, ততই দেশের দুর্ভিক্ষ, প্রজাদের দারিদ্র্য, অজ্ঞতার কথা মনে হইয়া প্রাণ বিষণ্ণ হইতেছে। আবার গিয়া সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতরণ করতে হইবে। ইংলণ্ডে আসিয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি, অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে হয়।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন—"সাহিত্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষের প্রথম ধাপ দেশের অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় দেশপ্রেমের উপলব্ধি, দ্বিতীয় ধাপ স্বাধীনতা বিরহিত প্রজাবর্গের হীনতা ও অত্যাচারবোধ। তৃতীয় ধাপ হইতেছে ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব অনুভূতি। হিন্দুমেলার প্রবর্তনে "ন্যাশনাল" আন্দোলনে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও মনোমোহন বসুর স্বদেশী গানে এই অনুভূতির প্রথম প্রকাশ, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের নাটকে তাহার বিকাশ।" দেশপ্রেমের পঠভূমিকায় লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "অশ্রুমতী" নাটক বাংলা দেশের বাইরে যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার আভাস জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিঠিতে আছে।

সুরেন্দ্রনাথ

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। এই সভাগৃহেই 'ন্যাশান্যাল কনফারেন্স' বা জাতীয় সভার প্রথম অধিবেশন বসে! ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বিতীয় কনফারেন্স করেন এবং সেই সময়েই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়বারে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলিকাতায়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। এই অধিবেশনের প্রধান বক্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভাতেই সুরেন্দ্রনাথ প্রথম স্বায়ত্তশাসনের দাবী ঘোষণা করেন। সেই বাণীই পরে কংগ্রেসের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে। বাগ্মিতাশক্তি ছিল সুরেন্দ্রনাথের স্বভাবদত্ত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা বলে তিনি দেশবাসীকে জাগ্রত করেছিলেন রাষ্ট্রীয় চেতনায়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন বাংলার নেতা। তাঁহার সহকর্মী ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, আনন্দমোহন বসু এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সেই স্মরণীয় যুগ সম্বন্ধে যতীন্দ্রমোহন বাগচী লিখেছেন—"মনে আছে পান্তির মাঠে শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে সভাপতি বালগঙ্গাধর তিলকের আবেগময় অভিভাষণে, রবীন্দ্রনাথের শিবাজী কবিতা পাঠে, সুরেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতায় বাঙ্গালীর যে আন্তরিক উৎসাহ ও অন্তর্বিকাশের অভিব্যক্তি দেখিয়াছিলাম তাহার তুলনা হয় না।" সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের উল্লেখ আছে তাঁ. .ঠিতে।

রমেশচন্দ্র, রজনীকান্ত ও উমেশচন্দ্র

সুরেন্দ্রনাথের বন্ধু এবং সহকর্মী রমেশচন্দ্র দত্ত যুগধর্মবশে রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন ভাবুক, পণ্ডিত, সাহিত্যসেবী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতিরূপে পরিষদের উন্নয়নের জন্যেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। এ কাজে তার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন রজনীকান্ত গুপ্ত। পরিষদের কাজে রজনীকান্তের ছিল অফুরন্ত উৎসাহ। শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে বাংলায় প্রচুর বইও লিখেছেন তিনি। তাঁর একমাত্র পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস'-ই ত যে কোন সাহিত্যসেবীর পক্ষে শ্লাঘার বস্তু। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বড়বাড়িতে' বাংলাভাষা

ও বাংলা সাহিত্য যখন ব্রাত্য বলে বিবেচিত হত সে খুব বেশীদিন আগের কথা নয়। সে সময় রজনীকান্তের প্রস্তাবেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হ'ন। তার ফলে তখন বি এ ক্লাস পর্যন্ত বাংলা রচনা পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। উমেশ চন্দ্র বটব্যালও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। উমেশচন্দ্রের চিঠি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হরপ্রসাদ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে যুগের দু'জন শ্রেষ্ঠ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র এবং রাজেন্দ্রলালের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহায়তায় তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন এবং পুঁথিসংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হন। সে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে চিঠিখানি লেখেন সেটি এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত হয়েছে। এই চিঠির মধ্যেও হরপ্রসাদের সহজ প্রাঞ্জল গদ্যরচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

অমৃতলাল

বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রসরাজ অমৃতলাল বসু এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সে যুগে সাধারণ রঙ্গালয় এবং অভিনেতাদের সম্পর্কে ভদ্রসমাজ যে কতদূর বিতৃষ্ণ ছিলেন তার উল্লেখ রসরাজ নিজেই করেছেন,—

"নিজ পরিবার মাঝে বিরক্তি কারণ।
কুটুম্বসমাজে লজ্জা নিন্দার ভাজন॥
দেশের দশের পাশে শ্লেষ ব্যঙ্গ হাসি।
সরে গেছে বাল্যসখা তাচ্ছিল্য প্রকাশি॥"

এই শোচনীয় অবস্থা দূর করে অভিনেতা ও জনগণের মধ্যে একটা সহজ সম্পর্ক সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি রঙ্গালয়ের সংস্কার এবং উপযুক্ত নাট্যরচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় হাতীবাগানে নবনির্মিত 'ষ্টার' থিয়েটারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং অপূর্ব নিয়মনিষ্ঠা ও দক্ষতা বলে রঙ্গমঞ্চের সর্বপ্রকার শৈথিল্য ও

উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করে ষ্টার থিয়েটারকে আদর্শ থিয়েটার করে তোলেন। থিয়েটারের সংস্কার এবং অভিনেত্রী নিয়োগব্যাপারে তাঁকে যে কত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে 'রঙ্গালয়' সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

স্বর্ণকুমারী দেবী

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ লেখিকা। শুধু কাব্য নাটক বা উপন্যাস রচনা নয়, দীর্ঘকাল ধরে তিনি 'ভারতী পত্রিকা' সম্পাদনাও করেছেন। সঙ্কলনে উদ্ধৃত তাঁর চিঠিখানি বাংলা পত্র সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

অশ্বিনীকুমার

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত সম্বন্ধে মনীষী মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় বলেন— What Keshab Chandra Sen was at Calcutta, Aswini Kumar Dutta is at Barisal.' অশ্বিণীকুমারের জীবনীকার শরৎচন্দ্র রায় লিখেছেন—"বরিশালে সেই যুগে অশ্বিনীকুমার শিক্ষা, সুনীতি ও ধর্মান্দোলনের পবিত্র অগ্নি জ্বালাইয়া শত শত লোককে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিযাছেন।" অশ্বিনীকুমারের চিঠিতে তাঁর অধ্যাত্ম আদর্শ এবং সমাজকল্যাণেচ্ছার উল্লেখ আছে।

বিপিনচন্দ্র

বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অন্যতম চিন্তানায়ক বিপিনচন্দ্র পাল সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—'One of the mightiest prophet of Nationalsim.' বিপিনচন্দ্র বাংলার স্বাধীনতা আকাঙ্খার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্য-কার। নানা রচনার মধ্যে দিযে এই অসীম তেজস্বী নেতা স্বাধীনতার অগ্নিগভ বাণী প্রচার করেছেন। দেশবাসীর বিশেষ করে যুবচিত্তের জাগরণে তাঁর প্রচেষ্টা অতুলনীয়। বিপিনচন্দ্র স্বদেশী যুগে চরমপন্থী দলের মুখপাত্র ছিলেন। বাংলার সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন এবং সে আন্দোলনের অন্যতম নেতারূপে বিপিনচন্দ্র সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর চিঠিতে।

জগদীশচন্দ্র

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় উৎসর্গ-পত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্র লেখেন—"ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞান মন্দির দেবচরণে নিবেদন করিলাম।" এই কয়েকটি কথার মধ্যেই উনিশ শতকের বাঙালী বৈজ্ঞানিকপ্রবর জগদীশচন্দ্রের সাধনা ও আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে। জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক কিন্তু মার্কনির মত বৈজ্ঞানিক নন, তাঁর সাধনার মূল প্রেরণা দেশপ্রেম। প্রতিকূল পরিবেশ ও নানা অসুবিধার মধ্যেও যে তিনি একাগ্রভাবে বিজ্ঞানচর্চা করেছেন তা শুধু এই দেশপ্রেমেরই জোরে, দেশবাসীর কল্যাণের প্রেরণায়। রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর পত্রাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই মহাপ্রাণ সাধকের পত্রাবলী 'প্রবাসী' পত্রিকায় যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার একটি পরিচায়িকা লেখেন। কবির সে পরিচয় পত্রে এই আত্মপ্রচার-বিতৃষ্ণ সাধকের কর্মজীবনের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। কবি লিখেছেন—"প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।" জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী শুধু তাঁর নয়, রবীন্দ্রনাথেরও জীবন-ইতিবৃত্তের অঙ্গরূপ আলোচ্য। জগদীশচন্দ্রকে দেশবাসী বিজ্ঞানের আচার্য বলেই জেনেছেন, কিন্তু এই পত্রাবলীতে আচার্যদেবের মনের এক নতুন ঐশ্বর্যের পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই মনৈশ্বর্যের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—"আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের করেছিলেন যেমন ক'রে শরতের শিশির-স্নিগ্ধ সূর্যোদয়ের মহিমা চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে।" পৌরাণিক বিষয় নিয়ে লেখা কবির বহু কবিতার মূলে ছিল জগদীশচন্দ্রের উৎসাহ ও অনুরোধ। শুধু সূক্ষ্ম রসবোধ নয়, জগদীশচন্দ্রের অকৃত্রিম দেশানুরাগেরও পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পত্রাবলীতে।

অবলা বসু

জগদীশচন্দ্রের সুযোগ্যা সহধর্মিনী লেডী অবলা বসু এই গরীব দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। সে যুগে 'হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়' এবং 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে' যাঁরা শিক্ষালাভ করেন লেডী অবলা

তাঁদের অন্যতম। তাঁর চিঠিতে বিশ শতকের গোড়ার দিকে এদেশের শিক্ষিতা মেয়েদের চিন্তাধারা এবং তাঁর শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী

উনিশ শতকের মহিলা কবিদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর নাম উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'জনৈকা হিন্দুমহিলার পত্রাবলী' ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে পাঁচটি চিঠি আছে। প্রথম চারখানি স্বামীকে লেখা এবং পঞ্চম পত্র ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে লেখা। বইখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। গিরীন্দ্রমোহিনীর চিঠি লেখার ধরণ প্রাচীন যুগের পত্ররচনার রীতি-সিদ্ধ। চিঠির পদ্যাংশ ভাগ তাঁর সহজ কবিত্বশক্তির পরিচয় দেয়।

ব্রহ্মবান্ধব

উত্তরজীবনে একে একে ব্রাহ্মধর্ম, প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টধর্ম এবং রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ ও বর্জন শেষে যিনি নিজেকে বৈদান্তিক খ্রীষ্টান বা ইণ্ডিয়ান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দেন সেই বিলাত প্রবাসী সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার আগেই ভারত উদ্ধারের নেশায় মশগুল হয়ে গোয়ালিয়র ছুটেছিলেন সামরিক শিক্ষা নিতে।

উনিশ শতকের যুগসাধকদের জীবনে আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রসারের যে প্রয়াস তার মূলে ছিল ভারতের অধ্যাত্মপ্রেরণার উপলব্ধি। এই শতকের শেষদিকে রাষ্ট্রচেতনার উন্মেষকালে ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই অধ্যাত্মজ্ঞানকেই সবচেয়ে উচুঁতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। বাংলার বিপ্লবী দলের নীতি ও আদর্শ থেকেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়বাদের মূলেও একটা আধ্যাত্মিক আদর্শ ছিল। আরও পরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে বিবেকানন্দের মানব-প্রীতির সঙ্গে অধ্যাত্ম আদর্শের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল। ব্রহ্মবান্ধবও আধ্যাত্মিক প্রেরণায় স্বামীজীর মৃত্যুর পর অক্সফোর্ডে বেদান্তধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের গোড়া থেকেই রাজনীতি দাবী করতে থাকে সর্বধর্মত্যাগী অনন্যশরণার্থী বাঙালীকে। বৈদান্তিক ব্রহ্মবান্ধব সেই দাবী মেটানোর জন্যেই 'সন্ধ্যার' সম্পাদকরূপে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। বিলাতীপ্রবাসী সন্যাসী ব্রহ্মবান্ধবের পত্রাবলী বিশ শতকের গোড়ার দিকে

'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পরে তা বই আকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু সে বই এখন দুষ্প্রাপ্য। ব্রহ্মবান্ধবের পত্রাবলী অনন্যসাধারণ। মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' সে চিঠিগুলি ১৩৫৫ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে আবার প্রকাশিত হয়। এই চিঠিগুলি সম্পর্কে মোহিতলাল লিখেছেন—"এ যেন ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শই নয়—যেন রক্ত-গত সংস্কার বা দেহ-মনের জীবন্ত ভারতীয়তা অনুভব করিয়া একজন ভারতবাসী বাঙালী ইংরাজের আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহার সেই ভারতীয় চেতনায় যাহা কিছু অভারতীয়, তাহাই যেন আপনা হইতে আঘাত করিয়া ঝঙ্কার তুলিতেছে, পাশ্চাত্ত্য সমাজের রাজসিক ঐশ্বর্য্য-পূজা ভারতের আত্মাকেই যেন পীড়িত করিতেছে।" ব্রহ্মবান্ধব তাঁর নিজস্ব ভংগীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছেন। চিঠির ভাষার দিকে তার বিশেষ দৃষ্টি ছিলনা, ভাবকে সুপরিস্ফুট করাই ছিল তাঁর সাধনা। সে সাধনা যে ব্যর্থ হয়নি তা তাঁর চিঠি পড়লেই বোঝা যায়। মাঝে মাঝে হালকা আলাপের সরসতায় বিষয়ের ভারও যেন লঘু হয়ে উঠেছে। এরকম লঘু আলাপের সুরে লেখা চিঠির কয়েক ছত্র এখানে তুলে দেওয়া হ'ল: "...বিলেতেও সেই কালিদাসের বসন্ত। এখানে পাখির ডাক এত মিষ্টি লাগে যে, মনে হয় কানে মধু ঢেলে দিচ্ছে। এমন তরু নাই যাতে বিহগ নাই—যে কলধ্বনি করে না। এমন কলধ্বনি নাই, যাহা মুগ্ধ করেনা। কি কপচান, কি শিস্—বিরহীর বাঁচা দায়। তবে আমার ভাগ্যগুণে বিরহ-জ্বালা নাই, তাই এখনও বেঁচে আছি।"

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাগুণে বাংলা পত্র-সাহিত্য পৃথিবীর সেরা পত্র-সাহিত্যের কৌলিন্য লাভ করেছে। 'য়ুরোপ প্রবাসীব পত্র'ই (১২৮৮) কবির সর্বপ্রথম পত্র-সঙ্কলন গ্রন্থ। কবির বয়স তখন মাত্র সতের-আঠারো। প্রথম মহাযুদ্ধ-পূর্ব ইংলণ্ডের জীবনযাত্রার যে ছবি কিশোর রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল, স্বতঃই ভারতের সঙ্গে তুলনায় তার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য কবি এই পত্রাবলীতে বর্ণনা করেন। পরিণত বয়সে কবি প্রথমে এই পত্রাবলী ছাপাতে রাজী হননি। কবির যুক্তি হচ্ছে—'যে-দেশে গিয়েছিলুম সেখানকারই যে সম্মানহানি করা হয়েছে তা নয়, ওটাতে নিজেরই সম্মানহানি।'

কিন্তু পরে আবার কবি লিখেছেন—"ইংরেজের চেহারা সেদিন আমার চোখে যেমনটা ধরা পড়েছিল সেটা যে নেহাত আমার বাল্যবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতার সৃষ্টি সে-কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবেনা। এই প্রায় ষাট বছরের মধ্যে সেখানকার মানুষের যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে ক্রমশ অভিব্যক্তির আখ্যা দেওয়া যায় না। এক-এক সময়ে ইতিহাস-শতরঞ্চের বোড়ে তার এক পা চাল ছেড়ে দিয়ে লম্বা চালে চলতে শুরু করে। পাশ্চাত্যে তাই ঘটেছে। সেদিনকার পাসপোর্টে তার যে ছবিটা ছিল সে ছবি আজ একেবারে চলবেনা।" সেজন্যেই কবি এই বইটিকে ইতিহাস ছেড়ে সাহিত্যের পংক্তিতে বসাতে চেয়েছেন। সাহিত্যের ইতিহাসেই এর মূল্য সর্বজনস্বীকৃত। এই বইটিতে চলতি ভাষার প্রকাশ রীতিমত বিস্ময়কর। 'সবজুপত্রে'র আবির্ভাব হতে তখনও পঁচিশ বছর দেরী। এ সম্পর্কে কবি বইটির ভূমিকায় লিখেছেন—"য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম। ...আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"

কবির দ্বিতীয় পত্র-গ্রন্থ 'ছিন্নপত্রের' রচনাকাল ১৮৮৫-খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর। এই দশটি বছরে নানাস্থানে যে পত্রগুচ্ছ জমা হয়েছে কবি তা ছিন্নাকারে উড়িয়ে দিয়েছেন। ছিন্নপত্র কবির শ্রেষ্ঠ গদ্য গ্রন্থের নিদর্শন। শুধু কি তাই, ছিন্নপত্র কবি-মানসের অভিজ্ঞান। যে সময়ে ছিন্নপত্র লেখা হয়, কবির সৃষ্টি-প্রাচুর্যের সে এক বিচিত্র ক্ষণ। কবিতা গান, ছোটগল্প, প্রবন্ধ আর চিঠিতে চিঠিতে কবি-মনের সৃষ্টি-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলেছে। কবির অনেক গল্প, গান আর কবিতার সুর এই চিঠিগুলিতে ধ্বনিত হয়েছে। শিল্পী তাঁর নিভৃত সাধন-কক্ষের দ্বার খুলে সকল রহস্য যেন মেলে ধরেছেন এই চিঠিতে। কখনো নানাচারী কল্পনার আধিপত্য, আবার কখনো কেন্দ্রনিষ্ঠ মননের গাঢ়তা ফুটে উঠেছে। কবির সংগ্রহ অফুরন্ত। রূপরহস্যময়ী পৃথিবী তাঁর চোখে চিরনবীনা। কবি লিখেছেন—"আমি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই আমার এই চেয়ে দেখার বিবরণটা লিখি।" সোনারতরী-চিত্রা-চৈতালীযুগের এই নিসর্গ-অনুভূতিই ছিন্নপত্রের বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে এখনো অনেক বিস্ময়

আমাদের মনে জমা হয়ে আছে। এ পর্যন্ত যেসব পত্র প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যেই কবির মন ও মননের এক অতুলনীয় পরিচয় ফুটে উঠেছে। সমস্ত চিঠি প্রকাশিত হলে তা হবে কবির মনোলোকের রহস্য-উন্মোচনের এক নির্ভরযোগ্য পরিচায়িকা। কবি নিজেও লিখেছেন—"আমার গল্পে-পদ্যে কোথাও আমার সুখ-দুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।"

যে দু'ধরণের সাহিত্যগুণান্বিত পত্রের কথা আমরা আগে বলেছি রবীন্দ্রনাথের পত্র-মালায় তার কোনটিই অপ্রতুল নয়। "ভানুসিংহের পত্রাবলী"তে লঘু ও ঘরোয়া কথার জাল বুনেছেন কবি একটি ছোট মেয়ের মনকে ঘিরে। বইটির ভূমিকায় কবি লিখেছেন—"এগুলিতে মোটা-সংবাদ বিশেষ কিছু নেই। হাসিতামাশায় মিশিয়ে আছে সেখানকার (শান্তিনিকেতনের) আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস আর তারই সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ।" এই স্নেহসিঞ্চিত লঘু কথার মধ্যে কিন্তু এমন একটা সর্বজনীনতা আছে যা কবির দৌহিত্রী ও পৌত্রীর কাছে লেখা চিঠিগুলিতে (চিঠিপত্র, ৪র্থ খণ্ড) পাওয়া যায় না। সেখানেও সকৌতুক স্নেহের প্রকাশ কিন্তু চিঠির সুর একেবারে ঘরোয়া। কৌতুক আর পরিহাসের সে এক বিচিত্র সঙ্কলন। যার যেমন বয়স, তার চিঠিও সেরকম। নন্দিতা দেবীর ম্যাট্রিক পাসের খবর পেয়ে কবি তাঁকে লিখছেন—"গতকল্য অপরাহ্নে চারু ভট্টাচার্যের কাছ থেকে একটা চিবকূট এসে পৌঁছল তাতে দেখা গেল নন্দিতা নামে এক মহিলা ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করে তার মাতামহের লোকবিখ্যাত পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তোমার সেই পরীক্ষা-খেয়ার কর্ণধার মুদ্রিতচক্ষু মাষ্টার মহাশয়ের জয়জয়কার। আমি লজ্জায় পড়ে গেছি—মনে করছি তার শরণাগত হব, অন্তত ম্যাট্রিকটাও কোনমতে যদি তরে যেতে পারি।" আরও ছেলেমানুষ নন্দিনীকে লিখছেন—"··· তোমাদের ওখানে যে রকম ঠাণ্ডা তাতে বোধ হয় তোমার পুতুলের সর্দিকাশি আরম্ভ হয়েচে তাই এই রুমাল পাঠিয়ে দিলুম।"

চিঠিপত্রের প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের চিঠিগুলি কবি তাঁদের বৃহৎ পরিবারের নানাজনকে লেখেন। এগুলিও ঘরোয়া সুরের চিঠি। প্রথম খণ্ডের চিঠিগুলি কবি-জায়া মৃণালিণী দেবীকে লেখা (১৮৯০-৯১ খ্রীঃ)। এই খণ্ডে মৃণালিণী দেবীরও কয়েকখানি চিঠি উদ্ধৃত হয়েছে কিন্তু সেগুলি কবির চিঠির প্রত্যুত্তর নয়। এই পত্রখণ্ড প্রকাশের ফলে রবীন্দ্রনাথের স্বামী ও পিতা

হিসাবে লেখা অপূর্ব চিঠিগুলি দেখার সৌভাগ্য হ'ল দেশবাসীর। স্ত্রীর কাছে লেখা এদেশের ওদেশের অনেক বিখ্যাত লোকের চিঠি ছাপা হয়েছে। কিন্তু হাসি-পরিহাস, পুত্রকন্যার জন্যে প্রবাসী পিতার সস্নেহ উদ্বেগ, ভবিষ্যতের ছবি, সাংসারিক দরকারী-অদরকারী কথার এমন সঙ্কলন বুঝি আর নেই।

সহধর্মিণীকে লেখা কবির চিঠিগুলি পড়লে সেই কবির কথাই মনে পড়ে:

"দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি
স্নেহমুগ্ধ জীবনের দু'চারিটি
স্মৃতির খেলেনা…

প্রথম চিঠিখানিতেই কি মিষ্টি পরিহাস—"যেমনি গাল দিয়েছি অমনি চিঠির উত্তর এসে উপস্থিত। ভাল মানসির কাল নয়। কাকুতিমিনতি করলেই অমনি নিজ মূর্তি ধারণ করেন আর দুটো গালমন্দ দিলেই একেবারে জল। একেই তো বলে বাঙ্গাল!" স্ত্রীকে-লেখা সব চিঠিগুলিতেই কবির যৌবন-চাঞ্চল্যশূন্য অপ্রমত্ত মনের এক অতুলনীয় পরিচয় পাওয়া যায়। প্রণয়মোহের উচ্ছ্বসিত মত্ততার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর যথার্থ স্থায়ী সম্পর্ক যে খুঁজে পাওয়া যায় না সে কথা কবি সুন্দর করে লিখেছেন একটি চিঠিতে। "স্ত্রী-পুরুষের অল্পবয়সের প্রণয়মোহে একটা উচ্ছ্বসিত মত্ততা আছে কিন্তু এ বোধ হয় তুমি তোমার নিজের জীবন থেকেও অনুভব করতে পারচ—বেশি বয়সেই বিচিত্র বৃহৎ সংসারের তরঙ্গদোলার মধ্যেই স্ত্রীপুরুষের যথার্থ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা আরম্ভ হয়, নিজের সংসারবৃদ্ধির সঙ্গে বাইরের জগৎ ক্রমেই বেশি বাহিরে চলে যায় —সেইজন্যেই সংসারবৃদ্ধি হ'লে এক হিসেবে সংসারের নির্জনতা বেড়ে ওঠে এবং ঘনিষ্ঠতার বন্ধনগুলি চারিদিক থেকে দুজনকে জড়িয়ে আনে।" চতুর্থখণ্ডের চিঠিগুলি দুই কন্যা মাধুরীদেবী ও মীরাদেবীকে লেখা। অসুস্থ সন্তানের জন্যে স্নেহাতুর পিতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার সঙ্গে কবির হোমিওপ্যাথি চর্চার খবরটুকুও এখানে আছে। কবির য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণকালের নানা কথাও আছে মীরাদেবীকে লেখা চিঠিতে। একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন—"দেশের গণ্ডী আমার ঘুচে গেছে—সকল দেশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে একদেশ করে তুলে তবে আমি ছুটি পাব। আমার নামের সঙ্গে আমার কাজের যোগ আছে। পূর্ব দিগন্তে আমার প্রথম জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছে পশ্চিম দিগন্তেই আমার জীবনযাত্রার অবসান হবে।" কবির এ' এক নতুন উপলব্ধি।

সবশেষে যে চিঠির উল্লেখ করে এই খণ্ডের আলোচনা শেষ করা হচ্ছে সে চিঠিটি কবি লেখেন দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। কবি লিখেছেন—"শমী যে রাত্রে মারা গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই···সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সুত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেছে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি ···" জীবনে স্বজনবিয়োগের বেদনা কবি কম পাননি কিন্তু সেই বেদনায় ভেঙ্গে না পড়ে কবি চেতনার গভীরতম স্তরে পরম উপলব্ধির সন্ধান করেছেন।

পঞ্চম খণ্ডের চিঠিগুলি প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীকে লেখা। এই চিঠিগুলি সাহিত্য আলোচনার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কবির নিজের এবং বিশেষ করে চৌধুরীমহাশয়ের রচনার যে সব আলোচনা এই পর্যায়ের চিঠিতে পাওয়া যায় সেগুলি সমালোচনা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

'পথে পথের প্রান্তে' নামক পত্র-সংকলনটির ভূমিকায় কবি লিখেছেন—*কিছুকাল ধ'রে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিরন্তর যে তর্ক-বিতর্ক আলোচনা চলেছিল তারই বাক্যালাপের বেগ এই চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।" 'পথে ও পথের প্রান্তে*'র কাহিনী চলমান বৈচিত্র্যের কাহিনী, নতুন নতুন অভিজ্ঞতারই বর্ণনা, কিন্তু এবর্ণনা ঠিক ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়। এর মধ্যে বাহিরের জগতের রূপ-রঙের শুধু স্কেচ নয়, তার সঙ্গে আছে কবির আত্মজিজ্ঞাসার বাণী।

'জাভাযাত্রীর পত্রে' কবি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। কিন্তু অন্যান্য রচনার মত এখানেও শুধু তথ্য আহৃত হয়নি, মননের মধ্যে দিয়ে সেই তথ্য জারিত হয়ে কবিকে নতুন উপলব্ধি এনে দিয়েছে। এই পত্রগুলি বিষয় গৌরবে প্রবন্ধের সামিল কিন্তু রচনাভংগীতে এগুলি চিঠির পর্যায়েই পড়ে। 'জাভাযাত্রীর পত্রে' প্রধানত ভারত-সংস্কৃতির ব্যাখ্যা আর জাভার উৎসবের প্রধানঅঙ্গ নৃত্যসংগীতকলার আলোচনা আছে।

রবীন্দ্রনাথের পত্র-সঙ্কলনের আলোচনায় 'রাশিয়ার চিঠি'র উল্লেখ করা প্রয়োজন। রচনারীতি এবং বিষয়ের জন্যে কেউ কেউ এই গ্রন্থটিকে পত্র-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করতে রাজী নন। কিন্তু প্রথমেই একথা মনে রাখা দরকার যে, বিষয়বস্তু যতই গুরুগম্ভীর হোক

না কেন এর অনেকগুলি আলোচনাই পত্ররচনার রীতি অনুযায়ী করা হয়েছে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, রাশিয়ার চিঠির·রচনারীতি প্রবন্ধধর্মী, সুতরাং কবির অন্যান্য পত্রাবলী থেকে এর মর্যাদাও স্বতন্ত্র। বিষয়বস্তু অনুযায়ী গদ্যরীতিও সংহত সুস্পষ্ট ও মননসমৃদ্ধ। কবির পত্রাবলী বললেই যে লিরিক-সুরের কথা মনে হয়, রাশিয়ার চিঠি তার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

বহু কঠিন বিষয় এবং পত্রতত্ত্ব নিয়েও কবি আলোচনা করেছেন চিঠিতে। চিঠির মূল্য সম্বন্ধে কবি এক জায়গায় লিখেছেন—"পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিষ নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে চিঠিপত্র দ্বারা তার চেয়ে আরো একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরো একটু রস আছে, যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই।…এই কারণে চিঠিতে মানুষের দেখবার এবং পাবার জন্যে আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হযেছে।"

এই সঙ্কলনে রবীন্দ্রনাথের পাঁচখণ্ড চিঠিপত্র ছাড়া অন্যান্য সব পত্র সঙ্কলন থেকেই একখানি করে পত্র বিশ্বভারতীর অনুমোদন ক্রমে উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রফুল্লচন্দ্র

আচার্য জগদীশচন্দ্রের মত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে দিয়ে দেশের সেবা করেছেন। অর্থের মোহ তাঁদের কোনদিনই ছিল না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালযে বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে যে টাকা পেতেন প্রফুল্লচন্দ্র তা শিক্ষার উন্নতিকল্পেই ফিরিযে দিয়ে আসতেন। এঁরা দুজনেই স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে দেশের কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত চিঠিতে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর এই সাধনার কথা ব্যক্ত করেছেন।

বিবেকানন্দ

রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়ে'র ভূমিকায় লিখেছেন ব্রহ্মবান্ধব তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারে বলেন—'রবিবাবু আমার পতন হয়েছে।' এই উক্তির

তাৎপর্য তাঁরা কেউই ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের এই পতনের অর্থ স্বধর্ম ত্যাগ ছাড়া আর কি হতে পারে? সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব আধ্যাত্মিক সাধনা ছেড়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েই হয়ত আত্মধর্ম সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই স্বধর্মাচরণ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মনে যে কোন সংশয় ছিল না তার প্রমাণ স্বামীজীর উক্তিতেই আছে। স্বামীজী বলেছেন—"Every man has to make his own choice ; so has every nation. We made our choice ages ago and ..it is the faith in an immortal soul...I challenge anyone to give it up". এই অমর আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি তাঁর মানব-প্রীতির দিগ্‌দর্শনস্বরূপ। এই আত্মার সাধনা, আত্মার প্রসার তাঁর সাধন-বেগ, তাঁর কল্যাণেচ্ছার মর্মবাণী। "The only God in whom I believe, is the sum-total of all souls and above all I belive in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races " বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অপরিসীম পৌরুষ ও অপার্থিব মানবপ্রীতির অতি আশ্চর্য প্রতিফলন হয়েছে তাঁর রচনায়। স্বামীজী ইংরেজী, সংস্কৃত এবং বাংলায় বহু চিঠি লিখেছেন। অবশ্য তাঁর ইংরেজীতে লেখা চিঠির সংখ্যাই বেশী। কিন্তু বাংলাতেও সাধু ও কথ্য ভাষায় লেখা চিঠিগুলির গদ্যভংগী অপূর্ব। স্বামীজার আত্মপ্রত্যয়ের সুর তাঁর লেখার মধ্যেও ধ্বনিত হয়েছে। সে ভাষা অনন্যসাধারণ, সে শুধু স্বামীজীরই ব্যক্তিত্বের বাহন। বর্তমান সংকলনে স্বামীজীর একটি বাংলা চিঠি এবং একটি ইংরেজী চিঠির অনুবাদ উদ্ধৃত হয়েছে। ইংরেজীতে লেখা চিঠিটির গুরুত্ব খুব বেশী। এই চিঠির মধ্যে স্বামীজীর শেষজীবনের এক নতুন উপলব্ধির কথা আছে। অমরনাথের নির্জন গুহায় সাধনায় বসে স্বামীজীর এক নতুন উপলব্ধি হয়। ক্রমেই তিনি গভীর তপস্যায় মগ্ন হন। ক্ষীর-ভবানীর মন্দিরে সাধনা করার পর তাঁর মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। যে স্বামীজী ছিলেন আদর্শ কর্মযোগী, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের যিনি সেবা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেই কর্মীশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ অধ্যাত্ম প্রেরণায় বিভোর হয়ে যান। স্বামীজীর মানস-মূর্তির রূপান্তরের অপূর্ব পরিচয় আছে এই চিঠিতে। ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল অন্তরের আকুতি ধ্বনিত হয়েছে স্বামীজীর কণ্ঠে। চিঠির ভাষায়ও সেই আবেগ, নিবেদনের সুর। এমন প্রাণস্পন্দন বিজড়িত চিঠি সাহিত্যে সত্যই দুর্লভ।

দ্বিজেন্দ্রলাল

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, শিবাজী উৎসব প্রভৃতি আন্দোলনের সঙ্গে শিখ, মারাঠা রাজপুত এবং প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায় প্রভৃতি বাঙালী বীরের জীবন কথা যে বাঙালী সাহিত্যিকদের দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁদের অন্যতম। দ্বিজেন্দ্রলালের দু'ভাই 'পতাকা' নামে এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। বিলাত যাত্রাকালে এবং বিলাতে পৌঁছে দ্বিজেন্দ্রলাল পতাকার জন্যে যে সব চিঠি লেখেন সেগুলি ১২৯১-১২৯২ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। সেই পত্রাবলীতে যুবক দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি, ভাবপ্রবণতা, স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসকুশলতার পরিচয় আছে। এ ছাড়া কয়েকটি পত্রে তিনি ইংরেজ ও বাঙালীর আচার-ব্যবহার, আহার-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্পর্কে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন। অনুরূপ একখানি পত্র এখানে উদ্ধৃত হ'ল। এই পত্রগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলা গদ্য রচনারও অন্যতম নিদর্শন।

রামেন্দ্রসুন্দর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী উনিশশতকের আদর্শ শিক্ষাব্রতী এবং সাহিত্যসেবী। তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে প্রধানত রামেন্দ্রসুন্দরের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সংবর্ধনা জানান হয়। তার কিছুকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান। রামেন্দ্রসুন্দর আর একটি চিঠিতে এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন যে ইতিপূর্বে যদি সাহিত্য পরিষৎ থেকে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার আয়োজন করা না হ'ত তাহলে তা আমাদের বড় লজ্জার কারণ হ'ত। এই ঘটনার জন্যে সারা দেশে কম আন্দোলন হয়নি সে সময়। রবীন্দ্রবিরোধী দল এই সম্বর্ধনার ব্যাপার নিয়ে এমন সমালোচনা করতে থাকেন যে রামেন্দ্রসুন্দরকেও তার জবাব দিতে হয়।

কেদারনাথ

সাহিত্যিক মহলে প্রবীণ কথাশিল্পী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'দাদামশায়' নামেই সমধিক খ্যাত। এই প্রিয় সম্বোধনের মধ্যেই কেদারনাথের চরিত্র ও

মধুর স্বভাবের ইঙ্গিত আছে। কেদারনাথ তাঁর দীর্ঘকালের সাহিত্য-সাধনায় মধ্যবিত্ত বাঙালীর হাসিকান্না ব্যঙ্গ করুণায় মাখানো জীবনের অপূর্ব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। সে জীবনের প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ মমতা তাই তাঁর হাস্য-পরিহাস ও রসিকতা একেবারে অকৃত্রিম এবং অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে। কেদারনাথের চিঠিতে তাঁর নিজের কালের কথা শুনতে পাওয়া যায়। সে কথা যেমন কৌতুকোদ্দীপক তাঁর বাচনভংগীও তেমনি আকর্ষণীয়।

আশুতোষ

পুরুষসিংহ আশুতোষ ছিলেন শ্রেষ্ঠ কর্মী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি তাঁর নিজের বলে মনে করতেন। শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় (২৪ মার্চ, ১৯৫৬) 'মনে এলো'র মধ্যে লিখেছেন—"জীবনে কত ভাইসচান্সলার দেখলাম। আমার কাছে আশুবাবুই দেশের প্রথম ভাইসচান্সলার ও শেষ। ··যেমন হৃদয়, তেমনি তেজ, তেমনি বুদ্ধি, তেমনি কর্মদক্ষতা—এমন সমবেশ দুর্লভ।" চির-নির্ভীক আশুতোষের তেজস্বিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে লর্ড লিটন্‌কে লেখা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত চিঠিতে। সেই দীর্ঘ চিঠিখানি সে সময়ে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ডকে লেখা যে চিঠিখানির অনুবাদ এখানে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেও আশুতোষের তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া ইংরেজ সরকার সে সময় বাঙালীদের কোন চোখে দেখতেন এ চিঠিতে তারও ইঙ্গিত আছে।

রামানন্দ

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশের শতকের গোড়ার দিকে বাঙালীর সাধনা এবং সিদ্ধির সত্য পরিচয় 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রভৃতি পত্রিকার মধ্যে দিয়ে প্রচার করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন আদর্শ সৃষ্টি করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকেও রামানন্দ নানাভাবে পুষ্ট করে তুলেছেন। রামানন্দ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে, ধর্ম্মবন্ধুর সম্পাদক হন। এই মাসিক পত্রে 'চিঠি পত্রের' মধ্যে দিয়ে ধর্মাভিমান, প্রার্থনা, স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি আলোচনা করতেন। সেগুলি স্ত্রীর কাছে লেখা পত্রের ভংগীতে রচিত এবং বেশ চিত্তাকর্ষক।

পাঁচকড়ি

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক হিসাবে যতটা খ্যাতি অর্জন করেছেন সাহিত্যিক হিসাবে সে রকম স্বীকৃতি লাভ করেননি। তার কারণ তাঁর অধিকাংশ রচনাই সাময়িক পত্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। বাংলার সামাজিক ইতিহাস তথা বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করে তিনি সে যুগের বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন কিন্তু আজ তাঁর কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি!

প্রমথ চৌধুরী

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ শুধু সাময়িক পত্রের ইতিহাসেই নয়, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসেও একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরেই 'সবুজপত্রের' আবির্ভাব এবং সাহিত্যে কথ্য ভাষা নিয়ে আন্দোলন শুরু। প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল সাহসে ভর করে কথ্যভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করে তুললেন। পণ্ডিতসমাজ তাঁর বিরোধিতা করতে এগিয়ে এলেন কিন্তু অর্জুনের সখা শ্রীকৃষ্ণের মত প্রমথ চৌধুরীর সহায় হলেন রবীন্দ্রনাথ। চৌধুরী মশায় শুধু ভংগী দিয়েই শিক্ষিত বাঙালীকে ভোলাননি, তাঁর নিজস্ব বক্তব্যও ছিল, সে বক্তব্য মননসমৃদ্ধ। বাঙালীকে তিনি ভাবতে অনুরোধ জানিয়েছেন, নিজের আত্মার সঙ্গে পরিচয় করতে বলেছেন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ করতে বলেছেন। এই সঙ্কলনে তাঁর যে চিঠিখানি আছে তাতেও চৌধুরী মহাশয় আমাদের নিজেদের স্বভাবের পরিচয় নিতে বলেছেন।

চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনেরও মূলমন্ত্র ধর্মাচরণ। রাজনীতি এবং জাতীয়তাকে তিনি এই ধর্মাচরণের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। তাই বৈরাগ্য সাধন নয়, স্বধর্মে থেকে কর্মানুশীলনই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এই ব্রতের উদযাপন হয়েছে জীবন বিসর্জনে। মৃত্যুর কিছুকাল আগে লেখা চিঠিতেও তাঁর এই দেশহিতৈষণার অতুলনীয় পরিচয় আছে।

অবনীন্দ্রনাথ

ভারতের শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত সৃষ্টি-

দাক্ষিণ্যে পত্র-সাহিত্যেরও কলেবর পুষ্ট করেছেন তাঁর অননুকরণীয় রচনারীতির মধ্যে দিয়ে। অবনীন্দ্রনাথের গগুরীতির সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং আকর্ষণ তাঁর চিঠিতেও উপভোগ করা যায়। বাংলা পত্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে আছে অবনীন্দ্রনাথের চিঠি।

অরবিন্দ

বাঙালীর আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রসারের মূলমন্ত্র যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি, অমর আত্মার স্বরূপ চিন্তন, স্বামী বিবেকানন্দের পর শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় তা আর একবার নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। বিশের শতকের গোড়ার দিকে *অরবিন্দ যখন গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তখনও তিনি শত্রুবধেনিযুক্তা দেবী বগলামুখীর সাধনা* করেছেন বরোদার নিভৃত কুটিরে। তাঁর সে সময়ের মানস-চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে স্ত্রীকে লেখা পত্রাবলীতে। তারপর অন্তরের নিগুঢ় প্রেরণায় দেশের কল্যাণেচ্ছা নিয়েই রাজনীতি পরিত্যাগ করে যোগসাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষকে লেখা চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি পরিত্যাগ করে যোগসাধনার তাৎপর্য এবং ভারতের মর্মবাণী ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর পত্রাবলী বাংলা সাহিত্যের মহা মূল্যবান সম্পদ।

শরৎচন্দ্র

সার্থক কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী বাংলা-সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারাকে পুষ্ট করে তুলেছে। তাঁর রচনার সব বৈশিষ্ট্যই এতে বর্তমান। তাছাড়াও এতে আছে ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের মনের কথা। সমসাময়িক সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্পর্কে নানা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তিনি পত্রাবলীর মধ্যে। বাংলায় এজাতীয় চিঠি খুব বেশী নেই। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব আকস্মিক মনে হলেও তা রবীন্দ্রযুগেরই অন্যতম বিশেষ ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই পত্র-সাহিত্যের এক বৃহত্তর অধ্যায় শেষ হয়েছে বলে ধরা যায়। তাঁর পত্রাবলী সমসাময়িক এবং আরও পরবর্তীকালের লেখকদের কাছে এক বিরাট আদর্শ হয়ে আছে। তাঁরা সকলেই মূলত কবির রচনাদর্শ থেকেই সাহিত্যগুণান্বিত পত্র রচনার প্রেরণা লাভ করেছেন।

বর্তমান আলোচনার প্রারম্ভে এই সঙ্কলনের উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে।

পরিশেষে আরও দু'একটি কথা নিবেদন ক'রে এই আলোচনা শেষ করা দরকার। বাংলায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন যুগনায়কের পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের জীবন ও সাধনা উপলব্ধির পক্ষে সেগুলি একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাংলায় এ যাবৎ যুগ হিসাবে কোন পত্র সঙ্কলনের কাজ হয়নি। বর্তমান গ্রন্থ কিছু পরিমাণেও সে অভাব পূরণ করলে এই শ্রম সার্থক হবে।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পত্রগুলি নানা সাময়িক পত্রিকা এবং গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে পত্র প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের এবং যে সব পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে সেই সব পত্রিকার সম্পাদক ও গ্রন্থকারদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের চিঠি মুদ্রিত করবার অনুমতি দানের জন্যে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই সঙ্কলন প্রকাশের কাজে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন এবং ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত না করলে এ গ্রন্থ কোনদিনই প্রকাশিত হত না। তাদের স্নেহদাক্ষিণ্যের ঋণ অপরিশোধ্য। শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীমনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত), শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক, শ্রীশক্তিপদ ভাদুড়ী, শ্রীপ্রীতিভূষণ বসু, শ্রীমনোরঞ্জন ভাস্কর প্রভৃতি শুভানুধ্যায়ী, শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিক ও বন্ধুজনের নানা পরামর্শে এই সঙ্কলন প্রকাশিত হ'ল। এঁদের সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

পত্রাবলী

(রামমোহন রায়ের চিঠি)

মহামহিমান্বিত শ্রীযুক্ত লর্ড 'আমহার্ষ্ট' গভর্ণর জেনারেল
মহোদয় সমীপেষু—

মাই লর্ড,

ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের মতামত প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এরূপ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ পূর্ব্বক নীরব থাকাও অত্যন্ত দূষণীয়। ভারতের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তৃগণ বহু সহস্র মাইল দূর হইতে এমন একটি জাতিকে শাসন করিতে আসিয়াছেন, যাঁহাদের ভাষা, সাহিত্য, আচার, ব্যবহার ও মনোগত ভাব তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের প্রকৃত অবস্থা তাঁহারা দেশীয়দিগের ন্যায় সহজে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন না। অতএব যদি আমরা এই বর্ত্তমান প্রয়োজনীয় ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের শাসনকর্ত্তৃগণকে বাস্তবিক কথা না বলি যদ্দ্বারা তাঁহারা এদেশের মঙ্গলজনক উপায় উদ্ভাবন ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, এবং যদি আমাদের স্থানীয় জ্ঞান এবং বহুদর্শিতা দ্বারা তাহাদিগের এই উন্নতি সাধন জন্য সদিচ্ছার অনুমোদন না করি তাহা হইলে আমরা নিজেদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্মুখ বলিয়া অপরাধী হইব এবং আমরা শাসনকর্ত্তৃগণকে আমাদের বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতে উপযুক্ত সুযোগ প্রদান করিব।

গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে যে শিক্ষা দ্বারা উন্নত করিতে সমুৎসুক, কলিকাতায় একটি নূতন সংস্কৃত স্কুল স্থাপনই সেই মহদিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছে। এই মঙ্গলজনক কার্য্যের জন্য ভারতবাসী চিরকাল তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। মানবজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তিই ইচ্ছা করিবেন যে, এই শুভকার্য্যের উন্নতিকল্পে প্রত্যেক চেষ্টা সংস্কৃত জ্ঞান দ্বারা এরূপভাবে পরিচালিত হয় যেন তদ্দ্বারা ভারতবাসীর জনস্রোত উত্তরোত্তর উন্নতির অভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে।

যখন এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়, তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য বৎসর বৎসর প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে আদেশ করিয়াছেন।, তখন আমাদের নিশ্চয় আশা জন্মিয়াছিল যে এই অর্থ দ্বারা ভারতবাসীকে গণিত, প্রাকৃতিক, বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বিজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইবেন। কারণ এই সকল বিজ্ঞান শাস্ত্র য়ুরোপে অনেক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তদ্দ্বারা উহার অধিবাসিগণ পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অধিবাসিগণ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

আমাদের ভাবী বংশধরদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা উন্নত করা হইবে, এই আশান্বিত প্রতিশ্রুতি শ্রবণে আমাদের হৃদয় আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতাতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট আমরা এই বলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছি যে এশিয়াতে আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের বীজ রোপণ করিবার জন্য এই উদার ও উন্নত জাতিকে তিনি এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমরা দেখিতেছি, যে জ্ঞান ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশীয় অধ্যাপকদিগের তত্ত্বাবধানে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিতেছেন। লর্ড বেকনের পূর্ব্বে য়ুরোপে যেরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই বিদ্যালয় তদনুরূপ হইবে। ইহাতে যুবকগণ কেবল ন্যায়ের ফাঁকি ও ব্যাকরণের কুট তর্ক শিক্ষা করিবে। তাহাতে সমাজের ও শিক্ষার্থীর কাহারও কোন উপকার হইবে না। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে শাস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হইত, এখনও যুবকদিগকে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইবে। তৎসঙ্গে তাহারা জল্পনাশীল মনুষ্যগণের কল্পনাপ্রসূত কতকগুলি শূন্যগর্ভ বাকচাতুর্য্য শিক্ষা করিবে, যাহা বর্ত্তমানে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে সচারাচর শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষা এত কঠিন যে, উহা শিক্ষা করিতে একটি জীবন অতিবাহিত হয়। ইহা সকলেই অবগত আছেন, বহুকাল হইতে এই ভাষা দ্বারা জ্ঞান বিস্তারের পথ প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে জ্ঞান নিবিষ্ট রহিয়াছে তাহা শিক্ষা করিলে পরিশ্রমানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার মধ্যে যে মূল্যবান জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যদি এই ভাষা বিস্তারের প্রয়োজন হয় তবে সংস্কৃত বিদ্যালয়

স্থাপন ব্যতীতও অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে ইহা বিস্তার করা যাইতে পারে। কারণ এই নূতন বিদ্যালয় যে উদ্দেশ্যে স্থাপন করার প্রস্তাব হইতেছে, বর্তমানে দেশের নানাস্থানে যে সকল সংস্কৃতাধ্যাপক এই ভাষা ইহার ন্যায়-দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে। সুতরাং যদি এই সমুদায় শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন বাঞ্ছনীয় হয়, তবে যে সকল সংস্কৃত চতুষ্পাঠির বিজ্ঞতম অধ্যাপকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই ভাষা শিক্ষা দিতেছেন তাঁহাদিগকে মাসিক অথবা বার্ষিক কিছু কিছু বৃত্তি প্রদান করিলেই তাঁহারা অধিকতর উৎসাহিত হইবেন। তাহা হইলেই উল্লিখিত উদ্দেশ্য ফলপ্রদ হইবে।

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি মহাশয়ের নিকট বিহিত সম্মান পুরঃসর এই প্রার্থনা করিতেছি, যে অর্থ এদেশীয় লোকের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইংলণ্ডস্থ রাজপুরুষগণ প্রদান করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা যদি নূতন প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তবে উহা দ্বারা ইহার উদ্দেশ্য কখন সংসাধিত হইবে না! কারণ যদি যুবকেরা বার বৎসর কাল—যাহা তাহাদের জীবনের উৎকৃষ্টতম অংশ—কেবল ব্যাকরণের কূটতর্ক শিক্ষা করিতে ব্যয় করে, তবে তাহাদের দ্বারা কোন উন্নতির আশাই করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতেছে "খাদ" ধাতুর অর্থ খাওয়া কিন্তু "খাদতি" এই শব্দ দ্বারা পুং, স্ত্রী ও ক্লীব এই ত্রিবিধ লিঙ্গবাচক এক বচনান্ত পদার্থের খাওয়া বুঝা যাইতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে "খাদতি" অর্থাৎ "খাদ" এবং তি এই অংশসমষ্টিই উল্লিখিত ত্রিবিধ লিঙ্গবোধক পদার্থের খাওয়া বুঝাইতেছে। কিংবা শব্দের রূপ ভেদ দ্বারা উল্লিখিত ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। যেমন ইংরেজী ভাষাতে প্রশ্ন হইতে পারে 'Eat' শব্দের কি পরিমাণ অর্থ এবং S এর দ্বারাই বা কি পরিমাণ অর্থ হয়। ঐ শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ তাহার উক্ত দুই অংশ পৃথকরূপে কিম্বা একত্র প্রকাশ করে কিনা?

আত্মা ঈশ্বরেতে কি প্রকারে বিলীন হয়, পরমাত্মার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ প্রভৃতি বেদান্ত-প্রদর্শিত জল্পনার আলোচনা দ্বারাও অধিক উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না; যে বেদান্তে দৃশ্যমান কোন পদার্থেরই প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি কাহারও সত্ত্বা নাই, সুতরাং তাঁহারা যথার্থ আদরের যোগ্য নহে। যত শীঘ্র পৃথিবী এবং তাহাদিগকে

পরিত্যাগ করা যায়, ততই মঙ্গল প্রভৃতি শিক্ষা দেয়; সেই বেদান্ত শাস্ত্রের মত শিক্ষা দ্বারা যুবকগণ সমাজের অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সভ্য হইতে পারেনা। বেদান্তের কোন কোন শ্লোক উচ্চারণ দ্বারা ছাগ হত্যার পাতক নিরাকৃত হয়; এবং বেদের কোন কোন শ্লোকের কি প্রকার প্রকৃতি এবং বল তাহা মীমাংসা শাস্ত্র হইতে শিক্ষা করিয়াও কোন প্রকৃত উপকার সাধিত হয়না।

ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ কত প্রকার কাল্পনিক শ্রেণীতে বিভক্ত আত্মার সহিত শরীরের, শরীরের সহিত আত্মার এবং চক্ষুর সহিত কর্ণের কি প্রকার সম্বন্ধ, ন্যায়শাস্ত্র হইতে এই সমস্ত শিক্ষা করিযাই বা মনের কি উন্নতি সাধিত হইতে পারে?

লর্ড বেকনের পূর্ব্বে য়ুরোপে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অবস্থা যেরূপ ছিল তৎপ্রণীত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হওযার পর জ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যদি পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়ের তুলনা করেন তাহা হইলেই আপনি ঐরূপ কাল্পনিক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার উপযোগিতা বুঝিতে পারিবেন।

যদি ইংরেজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞানে অজ্ঞ রাখাই অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে অজ্ঞানতা বিস্তার করিতে সমধিক উপযোগী প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র-কর্ত্তাদিগের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অতিক্রম করিযা লর্ড বেকনের দর্শন অনুমোদিত এবং গৃহীত হইত না। সেইরূপ যদি এ দেশীয়গণকে অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত রাখাই ইংলণ্ডীয় আইনকর্ত্তাদিগের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত শিক্ষা তদ্বিষয়ে যথেষ্ট উপযোগী হইবে। কিন্তু এদেশীয়গণকে উন্নত করাই যখন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য, তখন গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব, উদার ও কুসংস্কার বিনাশক অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য এবং সেই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য প্রস্তাবিত টাকা দ্বারা আবশ্যকীয় পুস্তক ও নানাবিধ যন্ত্র সম্বলিত একটি কলেজ স্থাপন করা উচিত, ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য য়ুরোপ হইতে পণ্ডিত আনয়ন করা কর্ত্তব্য।

মহাশয়ের নিকট এই বিষয় নিবেদন করিয়া আমি আমার স্বদেশীয়দিগের প্রতি এবং আমার স্বদেশীয়দিগের উন্নতি সম্পাদনেচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে উদারমনা ভূপতি এবং আইনকর্ত্তাগণ এই সুদূর ভূভাগে তাঁহাদের মঙ্গলজনক যত্ন প্রসারিত করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি এক অতি গভীর কর্তব্য সম্পাদন করিলাম বলিয়া অনুভব করিতেছি।

আমি বিনীতভাবে বিশ্বাস করি যে, মহাশয়ের নিকট আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতে আমি যে স্বাধীনতা পাইয়াছি তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

একান্ত বশংবদ ভৃত্য

শ্রীরামমোহন রায়

রাজা রামমোহনের সময় সাধারণ লোকে সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতো না। মুষ্টিমেয় বামুন-পণ্ডিত সংস্কৃতের চর্চা করতেন। আদালতের ভাষা ছিল ফারসি তাই যারা চাকরির উমেদার তারাই সেই ভাষা শিখতো। এই অবস্থায় বিলাতের শাসনকর্তৃপক্ষ দেশের লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে ১লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেন। গবর্ণমেণ্ট এই টাকায় এদেশে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখানো সাব্যস্ত করেন। সেই উদ্দেশ্যে কাশীতে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় আর কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা খোলা হয়। কলিকাতাতে আর একটি সংস্কৃত বিদ্যালয স্থাপনের জল্পনাও চলতে থাকে। কিন্তু স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট, ডেভিড হেয়ার এবং রাজা রামমোহন রায় এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। তাঁরা এদেশের লোকেদের সংস্কৃত ফারসির বদলে ইংরেজী শিক্ষ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টীয় শতকে রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত শিক্ষার বদলে এদেশের লোকেদের ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে এই চিঠি লেখেন। তিনি পরিষ্কার যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে, বহু শতাব্দীর কুসংস্কার কথনে ইংরেজী শিক্ষা আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসার ছাড়া দূর করা যাবে না।

এই চিঠিটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগের কমিটির কাছে ইহা পাঠান। অবশ্য এর ফলে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব একেবারে রহিত হয়নি, তবু ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ১৮২৪ খ্রীষ্টীয় শতকের ফেব্রুয়ারি মাসে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়।

(চিঠিটি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করা হযেছে।)

(দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি)

১

"সমালিঙ্গনপূর্ব্বক নিবেদনমিদং—

গত বৎসরের এই আশ্বিন মাসের এই প্রথম দিবসে আপনাদের পুষ্প-কাননে অশোক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া মনোহর প্রাতঃকালে আপনার উদার হস্ত হইতে যে কৃপা ও প্রেম আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম আজি কয়েক দিবসাবধি হইল তাহা মনে আন্দোলিত হইযা এই পর্ব্বতের অরণ্য মধ্যে অন্তশ্চক্ষুতে আপনাকে দেখিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছিলাম, এমন সময়ে আপনার চিরপরিচিত বর্ণাবলীবিন্যস্ত পত্র আমার হস্তগত হইল। তাহা এমন সময়ে আমার হস্তগত হইবামাত্র আমি একেবারে আশ্চর্য্য ও চমকিত হইলাম এবং যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আত্মার সহিত আত্মার কি প্রেমযোগ—সে শরীর-ব্যবধান জানেনা। আমি আপনাকে স্মরণ করিবামাত্র আপনার পত্র যেন আমার হস্তে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। এই পত্রে আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন এই সংবাদ লাভ করিয়া আমার মনের হর্ষ আরো দ্বিগুণিত হইল। এমনি শুভ সংবাদ যেন সর্ব্বদা পাই।

মধ্যে আপনি কৃপা করিয়া আমাদের বাটিতে যাইয়া দ্বিজেন্দ্র ও হেমেন্দ্রকে যে উৎসাহ ও আনন্দ প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহা শ্রবণে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। এই পর্ব্বতের চূড়ার উপরে এই প্রাতঃকালে সূর্য্যকিরণ অতি মধুর বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে যে এই সময়ে আপনার মুখ হইতে এই গানটি শুনিতে পাইলে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতাম। 'নয়ন খুলিয়া দেখ নয়নাভিরামে! হৃদয়-কমল বিকাশে যাঁর নামে। গগনে ভানু সহস্রকর বিস্তারি জগৎ-মন্দিরে বিরাজেন স্বপ্রকাশ—দেখ দেখ প্রেমাকরে দিবাকর জানিয়া সুন্দর উজ্জ্বল অনুপমে॥" কোথায় গত বৎসরের এই আশ্বিন মাসের এই প্রথম দিবসে আপনার সহিত আপনাদের পুষ্প-কাননে—আর কোথায় অদ্য প্রাতঃকালে এই বনে বসিয়া আপনাকে ভাবিতে ভাবিতে এই পত্র লিখিতেছি। আবার আগামী বৎসরে এই সময়ে যে কোথায় থাকি, তাহার কিছুই বলা যায় না। আপনি মধুর স্বরে আমায় ডাকিতেছেন, 'তু আওরে।' কিছুই বলা যায়না—হয়ত 'আগল ফাগুন মেঁ তুমসে মেলৌঙ্গি'। আওর 'মন কি কমলদল

খোলিয়া' শুনৌঙ্গি। সম্প্রতি এখান হইতে আমি সমুদয় হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, মনের মত আপনার সাধুসঙ্গ লাভ হউক এবং আপনি পুণ্য পুঞ্জেতে পবিত্র হইয়া ভগবৎ প্রেমধন অধিকাধিক সর্ব্বদা সঞ্চিত করিতে থাকুন। আপনার স্নেহময়ী দুহিতা ও প্রাণতুল্য জামাতা সপরিবারে চিরঞ্জীবী হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কুশলে থাকুন এবং আপনার হৃদয়কে আনন্দিত করুন। আর আর সমস্ত মঙ্গল। ইতি।

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ ও
সতত কৃপাপ্রার্থিনঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

এই চিঠিখানি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মশালা পাহাড় থেকে তাঁর শেষ বয়সের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ শ্রীকণ্ঠ সিংহকে লেখেন। শ্রীকণ্ঠবাবুর বাড়ী ছিল রায়পুরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে পিতার এই ভক্ত-বন্ধুটির অতি সুন্দর ছবি এঁকেছেন। কবির ভাষায়—"বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মত অম্লরসের আভাসবর্জিত—তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশ ছিলনা। মাথাভরা টাক, গোঁফদাড়ি কামানো, স্নিগ্ধমধুর মুখবিবরের মধ্যে দাঁতের কোন বালাই ছিলনা, বড় বড় দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারি গলায় যখন কথা কহিতেন, তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের পার্সি পড়া রসিক মানুষ। ইংরেজির কোন ধার ধারিতেন না! তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার এবং কণ্ঠে গানের আর বিরাম ছিল না।"

দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গেলেই শ্রীকণ্ঠবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে 'শান্তিনিকেতনের বুলবুল' বলে ডাকতেন। শ্রীকণ্ঠবাবুর গান আর সেতারের ঝঙ্কার তাঁর শান্তিনিকেতনের নির্জন মুহূর্তগুলি ভরপুর করে রাখতো। শ্রীকণ্ঠবাবুকে লেখা তাঁর সব চিঠিই এম্‌নি অনুরাগে ভরা এবং রসোচ্ছল।

বাক্রোটা শিখর

৮ বৈশাখ, ১৭৯৮ শক

প্রেমাস্পদেষু

নববর্ষের প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক নমস্কার—

দ্বিজেন্দ্রের কন্যা সরোজার শুভ বিবাহ উপস্থিত। তুমি জ্ঞানচন্দ্র ও গড়গড়িকে লইয়া বেদিতে আসন গ্রহণ করিবে এবং আচার্য্যের কার্য্য সমাধা করিয়া এই শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন করিয়া দিবে। স্ত্রীআচার হইয়া বরকন্যা দালানে আইলে তবে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্ব্বে তাহাতে বসিবে না। দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গে বরযাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া দালানে বসাইবে। পরে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে বরযাত্রদিগকে দালানের বেদীর পশ্চিমভাগে আদরপূর্ব্বক বসাইবে। এবং বরকে গদি হইতে উঠাইয়া আনিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দিবে। গদি খালি হইলে সেই গদি বরের জন্য বাটির ভিতরে পাঠাইয়া দিবে। এবং তাহার দুই পার্শ্বের বৈঠকীসেজ বেদীর দুই পার্শ্বে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে বেদীতে আলো কম হইবে না। এবং তুমি পুঁথি বেশ দেখিতে পাইবে। সময় আছে বলিয়া এই-সকল তোমাকে বলিয়া দিলাম, নতুবা বাহুল্যমাত্র। তোমার বেহালার বাটিতে সকলে কেমন আছেন এবং তোমার নিজের শরীর বা কেমন আছে, জানাইয়া আপ্যায়িত করিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

পুঃ—যদি গড়গড়ি আসিতে না পারেন, তাঁহার কোন ব্যাঘাত হয় তবে তাঁহার স্থানে কোন্নগরের দযালচাঁদ ভট্টাচার্য্যকে বসাইয়া দিবে। *

[* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিঠিগুলি অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত
'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

মহর্ষি ধ্যানে নিমগ্ন থাকলেও বিষয়কর্মে যে উদাসীন এবং পরাঙ্মুখ ছিলেন না এই চিঠি তার সুন্দর নিদর্শন। কোন ক্রিয়াকর্মে কোন্ জিনিষ

কোথায় থাকবে, কোন্ অনুষ্ঠান কখন্ করতে হবে, কে কোন্ দিকে বস্‌বে এ সমস্তই তিনি ভাল করে ভেবে তারপর লিখে পাঠিয়েছেন। তাঁর সমস্ত কল্পনা এবং কাজের মধ্যে এই রকম নিখুঁত শৃঙ্খলা থাকতো, কোথাও এতটুকু ফাঁক বা শৈথিল্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এ সমস্ত সাংসারিক খুঁটিনাটি কাজও যেন তাঁর ধ্যানের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছিল।

(বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি

অশেষ গুণাশ্রয়

শ্রীযুক্তবাবু দুর্গামোহন দাশ মহাশয়

পরম কল্যাণভাজনেষু

সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্ —

* * আপনি অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত আন্তরিক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং অবশেষে সঙ্কল্পিত বিষয়ে যেরূপ ব্যাঘাত ঘটিযাছে তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে। এ বিষয়ে আপনি যে কিরূপ ক্ষোভ ও মনস্তাপ পাইয়াছেন তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এই ক্ষোভ ও মনস্তাপ সহসা আপনকার অন্তঃকরণ হইতে দূর হইবার নহে। কিন্তু সাংসারিক বিষয়ের এইরূপই নিয়ম। সদভিপ্রায়সকল, সকল সময়ে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। “শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি” শুভ কার্য্যের নানা বিঘ্ন। আমি যে অবধি এই বিষয়ে জানিতে পারিয়াছিলাম সর্ব্বদা এই আশঙ্কা করিতাম, আপনকার অগ্রজের কর্ণগোচর হইলে সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবেক। অবশেষে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। যাহা হউক এই চেষ্টা বিফল হইয়াছে বলিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইবেন না। কত বিষয়ে কত চেষ্টা, কত উদ্যোগ করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সফল হইয়া উঠিবেনা। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর

বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র। এমত অবস্থায় চেষ্টা করিয়া যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে হয়। এ বিষয় সম্পন্ন হইলে আমি আপনাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করিতাম এইরূপে ব্যাঘাত ঘটাতেও সেইরূপ করিব। কারণ কর্ম্ম সম্পন্ন হউক আর নাই হউক, আপনকার সাহস, মানসিক মহত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান গুণের স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং ইহাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সকল বিষয়ে আপনকার সম্পূর্ণ হস্ত থাকিলে অবশ্যই অভিপ্রেত কর্ম্ম সম্পন্ন হইত। আপনি যেরূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আমার বোধ হয় আর কেহই সাহস করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ফলতঃ আপনি একজন প্রকৃত পুরুষ বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘজীবি হউন, আপনি দীর্ঘজীবি হইলে অনেক লোক অনেক প্রকারে আপনকার নিকট অনেকবিধ উপকার লাভ করিতে পারিবেক। * *

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতামহ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল দুর্গামোহন দাশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় তাঁহার বালিকা বিমাতার বিবাহ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁহার বড় ভাই কালীমোহন দাশ এই বিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁর আপত্তির ফলেই দুর্গামোহনবাবু ব্যর্থ হয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আক্ষেপপূর্ণ একটি চিঠি লেখেন। তার উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের নানা বিপদ ও অসুবিধার মধ্যেও দুর্গামোহনবাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে এই চিঠি পাঠান। এই সময়ে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করতে করতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিরন্তর বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে কিন্তু তবুও তিনি হতাশ হননি।

২

আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা দেখিলাম কিন্তু তোমার কাগজ খোলসা করিয়া দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। সুতরাং সত্বর তোমার কাগজ তোমাকে দিতে পারি এমন পথ দেখিতেছি না। তুমি বিলক্ষণ

অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে, অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এসকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহপক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছেন তদ্দ্বারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এবিষয়ের ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি ; সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে, আমাকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না, কেহ মাসিক, কেহ এককালীন, কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া, কেহ বা তাহা না করিয়াও দিতেছে না। অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্য দান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্দ্ধমাত্র দিয়াছ, অবশিষ্টার্দ্ধ এ পর্য্যন্ত দাও নাই এবং কিছুদিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ। এইরূপে আয়ের অনেক খর্ব্বতা হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে ঋণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমি এই ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময় তোমাকে তোমার কাগজ দিতে পারিলাম না, এজন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে আশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়া এ বিষয়ের সংবাদ লয়েন না। * *

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

এই চিঠিটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশিষ্ট বন্ধু, এবং বাগ্মীপ্রবর স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা। বিধবাবিবাহের খরচ পূরণের উদ্দেশ্যে দুর্গাচরণবাবুর কাছ থেকে তিনি কিছু টাকা গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে দুর্গাচরণবাবু আর্থিক কষ্টে পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে সেই টাকার জন্যে চিঠি দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তার উত্তরে এই চিঠি লেখেন।

৩

শ্রীশ্রীহরি শরণং

শুভাশিষঃ সন্তু—

২৭ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্বমহাশয়েরা আহারব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম সে বিবাহ স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা আমার পক্ষে কোন মতে উচিত কার্য্য হইত না। আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্র সমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই, এবিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি; সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্বমহাশয়েরা আহারব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে

বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহই হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আহারব্যবহার করিতে যাহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সেজন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরূপ বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায়, এরূপ বিষয়ে সকলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ, অস্মদীয় ইচ্ছার অনুবর্ত্তী বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে। ইতি ৩১শে শ্রাবণ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

এই পত্রটি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর তৃতীয় সহোদর শম্ভুচরণ বিদ্যারত্নকে লেখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন: "তিনি বিধবা বিবাহ কিরূপ চক্ষে দেখিতেন এবং তাহার সিদ্ধিকল্পে কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং আরও কতটা করিতে পারিতেন তাহার নিখুঁত ছবি ঐ পত্রের বর্ণে বর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে।"

৪

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পিতৃদেব শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানিং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে, সাংসারিক বিষয়ে সংস্পৃষ্ট থাকিলে অধিক

দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া শ্রীমতী মাতৃদেবী প্রভৃতিকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহার প্রতিলিপি শ্রীচরণসমীপে প্রেরিত হইতেছে, যদি ইচ্ছা হয় দৃষ্টি করিবেন।

সাংসারিক বিষয়ে আমার ন্যায় হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায়না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিযাছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি, সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। 'যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারেনা।' এই প্রাচীন কথা কোনক্রমেই অযথা নহে। সংসারী লোকে যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের একজনেরও অন্তঃকরণে যে, আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই, সে বিষয়ে আমার অনুমাত্র সংশয় নাই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া ক্লেশভোগ করা নিরবছিন্ন মূর্খতার কর্ম্ম। যে সমস্ত কারণে আমার মনে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে আর তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে আমার বক্তব্য এই যে, পিতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বচনে শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

কার্য্যগতিকে ঋণে বিলক্ষণ আবদ্ধ হইয়াছি। ঋণ পরিশোধ না হইলে লোকালয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যাহাতে সত্বর ঋণমুক্ত হই তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি। ঋণে নিষ্কৃতি পাইলেই কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিব। * * আপনকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যাহা প্রেরিত হইয়া থাকে, যতদিন আপনি শরীর ধারণ করিবেন কোন কারণে তাহার ব্যতিরেক ঘটিবেনা।

ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।*

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

[* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠিগুলি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

এই চিঠির মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দারুণ মনস্তাপ এবং ক্ষোভের যে প্রকাশ ঘটেছে তাহার কারণ ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র। তিনি দেশের মঙ্গলের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাই সে কাজে পদে পদে বাধা পেয়ে এবং অনেকের কাছে প্রতারিত হয়েও তিনি নিরুৎসাহ হ'ননি। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কারণ হ'ল তিনি সংসারেও এতটুকু শান্তি পাননি। সংসারের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে কোনদিন তাঁর ত্রুটি হয়নি কিন্তু প্রতিদানে পেয়েছেন ঔদাসিন্য আর পর্বতপ্রমাণ বাধা। তাই ভগ্নমনে, শূন্যপ্রাণে পিতামাতা, সহধর্মিণী, সহোদরদের কাছে বিনীত ভাবে বিদায় চেয়েছেন। এই বিদায় নেওয়ার সময়ও তিনি কর্তব্যবোধের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন।

(অক্ষয়কুমার দত্তের চিঠি)

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—

সবিনয় নিবেদনমিদং—

আমি ৬ই পৌষে এলাহাবাদে পহুঁছিয়া ৯ই পৌষে কীটগঞ্জে লালা বংশীধরের দরুন শ্রীযুক্ত রামচাঁদ মিশ্রের বাগানে বাসা করিয়াছি। আমার মস্তকের পীড়ার অল্পে অল্পে উপশম বোধ হইতেছে, কিন্তু উদরের দোষ কিছুতেই যাইতেছেনা। অম্লরোগ (acidity) অতিশয় প্রবল, সুতরাং সুচারুরূপ আহারাদি করিতে পারিনা। এখানেও অগ্নিমান্দ্য ও অম্লরোগ প্রবল থাকিবে ইহা আমি কখনও মনে করি নাই।

আমি এখানে পদার্পণ করিয়াই বিধবাবিবাহের শুভসমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে এ বিষয়ের নিমিত্ত আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে চিরকাল বদ্ধ রহিল। আমি যে এ সময়ে তথায় থাকিয়া আপনাদিগের সহিত একত্র মনের উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখ কস্মিন্‌কালেও যাইবেক না। মাঘ মাসে কয়েকটি বিধবাবিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল শুনিয়াছিলাম, তাহার কি

হইয়াছে লিখিয়া বাধিত করিবেন। গ্রাট সাহেব অবিলম্বে বিলাত যাত্রা করিবেন ও আপনি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন এই শুভ সংবাদ সমূলক কিনা অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিবেন। শ্রীযুক্তবাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও প্রফুল্লকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়দিগকে আমার সসম্প্রীত সাদর নমস্কার অবগত করিবেন।

ইতি—

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত

[চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

অক্ষয়কুমার দত্ত যে বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবাবিবাহের বিশেষ সমর্থক ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লেখা সেই সময়ের এই চিঠি থেকে তা জানা যায়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ জুলাই বিধবাবিবাহ-বিধি প্রচারিত হয় এবং তার তিন মাস পরে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ঐ বিবাহের তারিখ হ'ল ১২৬৩ সালের ২৩এ অগ্রহায়ণ। নানা স্থানের পণ্ডিত এবং ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ঐ বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দ্বারকনাথ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯১৩ সম্বতের ৯ই পৌষের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় এই বিবাহের এক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা স্পষ্টভাবায় এই বিবাহ সমর্থন করেন। পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত সে সময় কলিকাতায় ছিলেন না ; তিনি কয়েকদিন পরে এলাহাবাদ থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উক্ত চিঠি লেখেন। পণ্ডিত রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের সঙ্গে পলাশডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যার এভাবে বিবাহ দেওয়া হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দ্বারকানাথ মিত্র, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যানিধি, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজনারায়ণ বসু, প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী, কালীকুমার মল্লিকরায়, হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিত ও সুধীবৃন্দ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা বিবাহের বৈধতা সিদ্ধির অনুকূলে প্রেরিত আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হলে রাজনারায়ণ বসু দেওঘর থেকে সাধুবাদ জানিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিঠি দেন।

(প্যারীচরণ সরকারের চিঠি)

এডুকেশন গেজেট অফিস
১৬ই জুন, ১৮৬৫

মান্যবর এচ্., এল্, হ্যারিসন,

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের জুনিয়ার সেক্রেটারী মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আপনার ২৭০০ নং ২রা তারিখের (১৩ই তারিখে প্রাপ্ত) পত্রপাঠে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে দুর্ঘটনা বিষয়ক, এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধটি মাননীয় ছোটলাট বাহাদুরের অপ্রীতিকর হইয়াছে অবগত হইয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম।

২। যদিও কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় নাই, তথাপি আমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্যানুবোধে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহাশয়ের গোচরার্থে আমি নিম্নলিখিত বিষয় নিবেদন করা আবশ্যক বিবেচনা করি।

৩। যখন আমি সেই প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করি তখন আমার মনে ধারণা ছিল যে, হিন্দু পেট্রিয়ট, ন্যাশন্যাল পেপার, ইণ্ডিয়ান মিরর, সোমপ্রকাশ প্রভাকর ও চন্দ্রিকা পত্রসমূহে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যে বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া ঐ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল তাহা প্রধানতঃ নির্ভুল এবং নিজের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য সূত্র অনুসন্ধানে আমার মনে ঐ ধারণা সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

৪। আমি মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই যে আমি দেশীয় জনসাধারণের মনে ভীতি বা ভ্রম উৎপাদন করিতেছি। কারণ এডুকেশন গেজেটে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিকতর ভীতিপ্রদ সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই লোকমুখে ও সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত সংবাদ-পত্রসমূহে দেশময় প্রচারিত হইতেছিল।

৫। যে নিয়মে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এডুকেশন গেজেট প্রতিপালিত হইয়া থাকে আমি সেই নিয়মাবলী পাঠ করিয়া সেগুলির মধ্যে আমার বুদ্ধিতে এমন কিছুই দেখিতে পাই নাই, যাহা সাময়িক ঘটনা সমূহের উপর আমার নিজের ধারণা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিবার প্রতিবন্ধকস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। এবং যে নিয়মটিকে সেই নিয়মাবলীর প্রধান বলিয়া আপনার

পত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই নিয়মটিও মদীয় প্রবন্ধে ভঙ্গ করা হয় নাই কারণ উহা বিনা অনুসন্ধানে পত্রস্থ করি নাই।

৬। যৎকালে এই প্রবন্ধটি লিখিত হয়, তখন অনেকেই অবগত হইয়াছিলেন যে ঐ দুর্ঘটনা সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য একটি 'কমিশন' অচিরে নিযুক্ত হইবে। সেই কারণে আমার মনে স্বতঃই এই ধারণা জন্মে যে গবর্ণমেণ্ট, কর্তৃপক্ষগণের সরকারী রিপোর্টকে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ বা সর্ব্বপ্রকারে সন্তোষকর বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

৭। গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশ্যে এডুকেশন গেজেট পত্রকে সাহায্য করেন তাহার প্রতিকূলগামী হইতে পারে, এরূপ কোন প্রবন্ধ আমি ঐ পত্রে স্থান দিব এরূপ অভিপ্রায় কখনই আমার ছিল না, এবং আমি ওরূপ প্রবন্ধ কখনও পত্রস্থ করি নাই। কিন্তু সেই বিষয়েই বর্ত্তমান স্থলে আমার কার্য্য দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, জ্ঞাত হইয়া আমি সন্তপ্ত হইয়াছি। আমার প্রতীতি জন্মিযাছে যে, কোন প্রকাশ্য পত্র পরিচালন কার্য্যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইরূপ কোন না কোন অসন্তোষকর কারণ উপস্থিত হইতে পারে এবং সকল সময়েই উহা অতিক্রম করা আমার পক্ষে দুরূহ হইবে। সেইজন্য আমি বিহিত সম্মান পুরঃসর প্রার্থনা করিতেছি যে মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এডুকেশন গেজেটের পরিচালন কার্য্য হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন।

ভবদীয় একান্ত আজ্ঞাবহ্ সেবক
শ্রীপ্যারীচরণ সরকার

[নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত 'প্যারীচরণ সরকার' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

প্যারীচরণ সরকার ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ এডুকেশন গেজেট পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হ'ন এবং প্রায় দু'বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই হজ্‌সন্ প্র্যাট্ সাহেবের প্রস্তাবে সরকারী ব্যয়ে এডুকেশন গেজেট প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রথমে কোন প্রবন্ধ বা অভিমত প্রকাশিত হ'ত না। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার এই পত্রিকাটিকে সরকারী মুখপত্ররূপে পুনগঠিত করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু স্থির হয় যে, সম্পাদকের ওপরেই প্রবন্ধ নির্বাচন ও অন্যান্য বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

সেই অনুযায়ী ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া থেকে এডুকেশন গেজেট পরিবর্ধিত আকারে ও নতুন নিয়মে পরিচালিত হ'তে থাকে। প্যারীচরণ সরকার এই পত্রিকার প্রথম বাঙ্গালী সম্পাদক হ'ন এবং তাঁর সুষ্ঠু পরিচালনা গুণে পত্রিকার বিশেষ উন্নতি হয় ও গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে যায়।

প্রায় দু'বছর পরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের (Eastern Bengal Railways) শ্যামনগর ষ্টেশনের কাছে এক দুর্ঘটনার ফলে অনেক লোক মারা যায়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মৃত ও আহতদের যে সংখ্যা প্রকাশ করেন, তা অনেকের মনে সংশয়ের উদ্রেক করে এবং সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় যে কর্তৃপক্ষের বিবরণ সত্য নয়। প্যারীবাবু এই সংবাদের সত্যতা নির্ধারণের জন্যে ঘটনাস্থলে গিয়ে সরজমিনে অনুসন্ধান করেন। তাঁহারও এই বিশ্বাস জন্মে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শুধু যে হতাহতের সংখ্যা গোপন করেছেন তা নয়, স্থানীয় কর্মচারীরাও আহতদের সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এই অনুসন্ধানের এক বিবরণ ১২৭৫ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন। সেই সংবাদ প্রকাশিত হ'লে তৎকালীন ছোটলাট স্যার উইলিয়াম গ্রে অসন্তুষ্ট হয়ে প্যারীবাবুকে এক চিঠি পাঠান। তার উত্তরে প্যারীবাবু উপরিউক্ত চিঠি দেন।

প্যারীবাবুর আত্মসম্মান জ্ঞান কত প্রখর ছিল এবং তিনি কতদূর স্বাধীনচেতা ছিলেন এই চিঠিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পর শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর অ্যাটকিন্‌সন্ সাহেব তাঁকে পদত্যাগ না করার জন্যে বিশেষ অনুরোধ জানান কিন্তু প্যারীবাবু আর তাতে স্বীকৃত হন নি। অতঃপর ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঐ কার্যভার গ্রহণ করেন।

(রাধাকান্ত দেব প্রমুখের চিঠি)

রেভারেণ্ড জে, লং সমীপেষু ;—

মহাশয়, দেশের এই অংশে নীল চাষ সম্পর্কে দেশবাসীর মনোভাবের পরিচায়ক 'নীলদর্পণ' নাটকের সহিত আপনার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করিয়া সম্প্রতি যে বিবৃতি আপনি দিয়াছেন, আমরা (নিম্নস্বাক্ষরকারিগণ) তাহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি।

এদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি এবং শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে দেশীয় লোকদিগের মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য আপনি যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেশীয় সংবাদপত্র মারফৎ আপনার যে মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আপনি ধর্ম্ম ও শ্রেণীনির্ব্বিশেষে এদেশের সকল মানুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মনোভাব শাসন-কর্ত্তাদিগের এবং স্থানীয় ইউরোপীযদিগের নিকট পৌছাইয়া দিবার যে আপ্রাণ চেষ্টা আপনি করিয়াছেন, তাহাতে সুশাসনের কাজ কম প্রশস্ত হয় নাই।

বর্ত্তমানে ভারত গভর্ণমেণ্ট যে ভাবে গঠিত রহিয়াছে তাহাতে শাসনব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কে যে ভাবেই দেশবাসীর মনোভাব এবং মতামত প্রকাশিত হউক না কেন, সে সম্বন্ধে অবহিত হইবার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জোর দেওয়া আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একথা জানাইতে আমরা বাধ্য হইতেছি যে, ভারতের মঙ্গলের জন্য দেশের জনসাধারণের সন্তোষের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তি একান্ত প্রয়োজন এবং দেশী সংবাদপত্রগুলি যে সকল সতর্কবাণী উচ্চারণ করে, তাহার প্রতি চক্ষু মুদিত করিয়া থাকা নিতান্ত মূর্খতা বলিয়া আপনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

মহাশয়, 'নীলদর্পণে'র অনুবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিবার ব্যাপারে আপনি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের সুদৃঢ় ধারণার সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে। দেশীয় সংবাদপত্রগুলির প্রকাশিত মতামত সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগকে অবহিত করিবার গুরুত্বের প্রতি আমরা বরাবর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সেইজন্যই এই প্রশংসনীয় উদ্যমের ফলে সংবাদপত্রে যে তিক্ত ব্যক্তিগত বাদপ্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে তাহা আমরা অত্যন্ত দুঃখ এবং বেদনার সহিত লক্ষ্য করিয়াছি।

আমরা দৃঢ়তার সহিত একথা জানাইতে পারি যে, নীল চাষ সম্বন্ধে দেশবাসীর মনোভাব নীলদর্পণে সঠিক ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা ইহা জানি যে, আসল নাটকে স্ত্রীলোকদিগের এবং অন্যান্য চরিত্রের মুখ দিয়া এমন অনেক কথা বলানো হইয়াছে যাহা মার্জ্জিত রুচির লোকদিগের কর্ণে পীড়াদায়ক হইতে পারে। কিন্তু যে সমাজের চিত্র এই নাটকে অঙ্কিত করা হইয়াছে, সেই সমাজের প্রচলিত চিন্তাধারা এবং ভাবাদর্শ এই অংশগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের অতি প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলিকে দুনিয়ার সকলেই অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে অতি মূল্যবান মনে করেন। কথাসাহিত্যের অংশবিশেষের মধ্যে মধ্যে অমার্জ্জিত কথাবার্ত্তা থাকার জন্য তাহা যদি দমন করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের আশঙ্কা আছে যে, সেই সুপ্রাচীন গ্রন্থগুলিও জনসাধারণের দৃষ্টি হইতে চিরকালের জন্য দূরে রাখিতে হইবে। এই একই মানদণ্ডে বিচার করিলে ইউরোপের আধুনিক ও প্রাচীন প্রতিভাশালী লেখকদিগের রচনারও সেই দশা হইবে। আমাদিগের কিন্তু আশঙ্কা হয় যে, আপনার এই প্রযাসের যে প্রকাশ্য নিন্দাবাদ হইতেছে তাহা শুধু স্বার্থান্বেষী এবং কুচক্রীদিগের অপচেষ্টার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"এ দেশের লোকদিগের মনোভাব নীলদর্পণের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নাই" এবং "যে উদ্দেশ্য লইয়া এই বইয়ের বক্তব্য ইউরোপীয়দিগের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা এদেশের লোক তারিফ করেনা" ইত্যাদি যে সকল ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইযাছে, আমরা তজ্জন্য দুঃখিত। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্বন্ধে আমরা আমাদিগের মতামত আপনার নিকট উপস্থাপিত করা প্রযোজন মনে করিতেছি। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্তি আর কিছু হইতে পারেনা এবং আমরা একান্তভাবে আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, এই চিঠি সেই মর্ম্মান্তিক ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবে।

ইতি—

আপনার একান্ত বশংবদ ভৃত্যগণ
রাজা বাহাদুর রাধাকান্ত
রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর
রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ
বাবু রমানাথ ঠাকুর এবং কলিকাতার আরও ৪৩ জন ভারতীয়।

[রেভারেণ্ড জেমস্ লং-কে লেখা ইংরেজী পত্রের অনুবাদ]

শিবনাথ শাস্ত্রী "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" নামক গ্রন্থে 'নীলদর্পণ' সম্বন্ধে লিখেছেন—"একদিকে যখন ইণ্ডিগো কমিশন ও পেট্রিয়টের সহিত বিবাদ প্রভৃতির উপক্রম, তখন অপরদিকে ১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের সুবিখ্যাত নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কোন গ্রন্থ বিশেষে যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। "নীলদর্পণ" কে লিখিল, তাহা জানিতে পারা গেল না। কিন্তু বাসাতে বাসাতে "ময়রাণী লো সই নীল গেঁজেছ কই?" ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল।"

মধুসূদন এক রাত্তিরের মধ্যে এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেন এবং রেভারেণ্ড জেমস্ লং নিজের নামে ইহা প্রকাশ করেন। তখন সে আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে ইংলণ্ডেও পৌছয়। 'হরকরা' ও অন্যান্য কয়েকটি জাতীয়তাবাদী দেশী সংবাদপত্র এই গ্রন্থটির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে থাকে। নীলকরগণ 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদককে মুখপাত্র দাঁড় করিয়ে ১৮৬১ সালের ১৯ জুলাই লং সাহেবের নামে নালিশ করেন। লং সাহেব তাঁর জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি বিদ্বেষবশে একাজ করেননি। তিনি বহুকাল থেকে যেমন দেশীয় সংবাদপত্র আর দেশীয় ভাষায় লেখা গ্রন্থের মর্মার্থ গভর্ণমেণ্টকে জানিয়ে আসছেন, নীলদর্পণের অনুবাদও সেই ভাবে করেছেন। কিন্তু রেভারেণ্ড লং বিচারে 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা'র সম্পাদক ও নীলকরগণের মানহানি করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন এবং এক হাজার টাকা জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ ঐ টাকা জমা দেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ ৪৩ জন কলিকাতাবাসীর লং সাহেবকে লেখা চিঠিখানিতে নীলদর্পণ সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ আছে।

(রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিঠি)

১

মহাশয়েষু —

আপনার পত্র পাইয়া পরম উপকৃত হইলাম। পত্রের লিখিত বিষয়গুলি পরম উপকারজনক। আপনি শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া আমার জন্য যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এতন্নিবন্ধন বিশেষ বাধিত হইয়াছি। জগন্নাথের মস্তকের কথা মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই প্রকৃত, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি আপনার লিখিতানুসারে সমস্ত বর্ণন করিব। গুণ্ডিচা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী তবে আপনি অনুমান করিয়াছেন যে গুণ্ডিচা গুঁড়িকাঠ, ইহা হইলেও হইতে পারে।

নীলাদ্রি মহোদয়ে ভদ্রার হস্তের পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু দর্শন-কালে ভদ্রার হস্ত নাই বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব যাহারা ভদ্রাকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন ভদ্রার হস্ত আছে কিনা ?

কোণারকের মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। আমার বোধ হয় তদ্দৃষ্টান্তেই পূর্ব্বে জগন্নাথের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। পরে কোন কারণ বশতঃ ঐ অশ্বমূর্ত্তি উত্তরপূর্ব্ব দ্বারে লইয়া থাকিবে। অধুনা সেখানেও সে মূর্ত্তি নাই। আপনি লিখিয়াছেন, জগমোহন ও নাটমন্দিরের মধ্যে দ্বার আছে, এক্ষণে উহাকেই জয়াবিজয়া দ্বার বলে, কিন্তু উহাতে অধুনা কোন মূর্ত্তি নাই, ইহাতে এইরূপ বোধহয় যে পূর্ব্বে উক্ত দ্বারেই জয়াবিজয়ার মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। আমার অনুভবানুসারে ভোগমন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী দ্বারে যে দুইটি মূর্ত্তি আছে, উহাই এক্ষণে জয়াবিজয়ার মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিতে হইবে। মাধবীকুঞ্জে প্রতি দ্বাদশ বৎসরেই কি জগন্নাথের মূর্ত্তি সমাহিত হইয়া থাকে ? কিন্তু আমি শুনিয়াছি উক্ত কার্য্য ৫০।৬০ বৎসর অন্তর সম্পাদিত হয়। আপনি এই বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া লিখিবেন। আপনার ব্যবহারের জন্য পুরী ও শ্রীমন্দিরের মানচিত্র প্রেরণ করিলাম। জগন্নাথের মূর্ত্তির বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে, তাহা এই যে জগন্নাথের কর যুগল ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত অথবা সম্মুখ দেশে প্রসারিত। আপনি এই সংশয়টির অপনোদন করিবেন। প্রেরিত চিত্রে হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত দেখিতেছি।

ইতি—

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

মদাত্মীয়েষু—

তিন দিবস হইল আমি বোম্বাই হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গতকল্য আপনার ৯ই দিবসের পত্র প্রাপ্ত হই। উক্ত পত্র পুরীর ডাকে ১৭ই প্রেরিত হইয়াছিল। আমার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত উড়িষ্যার মুদ্রণ কার্য্য স্থগিত ছিল। অদ্য কোণার্কের প্রথম শোধনীয় আদর্শ পাইয়াছি।

বোধহয় এক মাস মধ্যে মুদ্রাকার্য্য সমাধা হইবে। ইতিমধ্যে আপনি কোণার্কের বিষয়ে যে কোন সংবাদ দিতে পারেন তাহা বিশেষ উপকারজনক হইবে।

মন্দির সমাপ্ত হয় নাই বলিয়া যে আমার প্রথম অনুমান হইয়াছিল তাহা বহুদিন পরিত্যক্ত হইয়াছে। মন্দির সমাপ্ত হইযাছিল ও দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু পরে জমি বসিযা তাহা পড়িয়া যায; এই এক্ষণে আমার মত। এ মতের বিশিষ্ট কারণ আবুল ফজল এবং জগমোহনের অন্তঃস্থিত স্তম্ভের পতন। শেষোক্ত ঘটনাটি জমি না বসিলে ঘটিতে পারিত না। ইংরাজী প্রবাদে বলে To build on sand, সেটি মিথ্যা নহে। পুরীর মন্দির বালুকার উপর নির্ম্মিত নহে। নীলাদ্রি নামে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বালুকা হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অট্টালিকার ভারে ভূমি দৃঢ় হইলে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয, সুতরাং বসিবার কারণ ছিল না।

আমার মতে লাঙ্গুলীয় নরসিংহই বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাতা। এবং তাঁহার সময় হাণ্টার সাহেব নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ঐ নির্দ্দেশের মূল মাদলা পাঞ্জী এবং তৎকালে মাদলা পাঁজী অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। আপনি মাদলা পাঁজীতে কি আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া অথবা সেই অংশটির প্রতিলিপি করিয়া পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। ঐ অংশে দেখিবেন, আপনি জানিতে পারিবেন যে, নরসিংহ দেবের পূর্ব্বে তথায় প্রাচীন মন্দির ছিল। নরসিংহ ঐ প্রাচীন ও ভগ্ন মন্দিরের পরিবর্ত্তে নূতন প্রস্তুত করেন।

বহিঃপ্রাচীরের ভিত্তি আমি দেখিয়াছিলাম কিন্তু তাহার বিস্তার নিরূপিত করিতে পারি নাই, স্থানে স্থানে চিহ্ন নাই, অপর স্থানে কর্ষিত হইয়াছে সুতরাং সমস্ত প্রাচীরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নিরূপিত হয় নাই। বোধহয় আপনিও এবিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই

মানিকতলা শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

২২শে নবেম্বর

[* রাজেন্দ্রলালের চিঠি দু'টি 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র ৩য় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত]

মহাকবিগণের সমস্ত রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শোভা সম্বর্দ্ধনপূর্ব্বক বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে? সেই সময়ে তুমি যে সকল সুন্দর ইংরাজী পদ্য রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত। আমি তখন হইতে জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু সেই কাব্য মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা অথবা হেক্টর বধ হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে কোন উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া ইংরাজ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ম্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। তাই তোমার এই বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।

কোন বাঙ্গালার পক্ষে ইংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা যদি সঙ্গত হইতে পারে তাহা তোমার পক্ষেই সঙ্গত হয়। তুমি অল্প বয়সেই ইংরাজী ভাষার মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছিলে, যৌবনাবধি ইংরাজদিগের সহবাস করিতেছ, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষার মূল ভাষা সমস্তের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছে। ফলতঃ তোমার প্রণীত যে কয়খানি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ আছে, তত্তুল্য ইংরাজী গ্রন্থ বোধ হয় কোন বাঙ্গালী কর্তৃক বিরচিত হয় নাই। কিন্তু তোমার সেই গ্রন্থ আর তোমার মেঘনাদবধ প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থে কত অন্তর! তোমার বাঙ্গালা কাব্যগুলি তোমাকে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত দলের মুখস্বরূপ, তাহাদিগের গৌরবস্বরূপ, এবং তাহাদিগের প্রথপ্রদর্শক-স্বরূপ করিয়া স্থাপন করিয়াছে।

অধিক কি লিখিব? তোমার শরীর নিরাময়, তোমার মন সচ্ছন্দ, তোমার সাংসারিক শ্রী বর্দ্ধনশীল এবং তোমার কবিত্বশক্তি চির-প্রভাবশালিনী থাকুক এই আমার প্রার্থনা।

তদীয় শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়

[নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধু-স্মৃতি' থেকে উদ্ধৃত]

মধুসূদন তাঁর হেক্টর-বধ কাব্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। সেই উৎসর্গ-পত্র পড়ে ভূদেব এই চিঠিখানি লেখেন।

(রাজনারায়ণ বসুর চিঠি)

১

দেওঘর, ৪ আষাঢ়, ১২৯০

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারস্বত-সমাজ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত 'ভৌগোলিক-পরিভাষা' বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব পাইয়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ ; তাহা অঙ্কুশ মানেনা, ব্যাকরণ ও শব্দ শাস্ত্র বসিয়া বসিয়া নিয়ম করেন ; সে তাহা না মানিয়া হাস্যকরত প্রচণ্ড বেগে চলিয়া যায়। বিদ্যারূপ দেশের লোক সাধারণতন্ত্রের লোক ; কেহ কাহারও কথা শুনেনা। তাহাদিগকে বশে আনা মুস্কিল। "Irritabile vates trition" আমার অনুরোধ এই আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট অপমানিত না হইতে হয়। যে সকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা উচিৎ নহে, যথা উপদ্বীপ, প্রণালী, যোজক, অম্লজান, উদজান প্রভৃতি, যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। যে সকল অপপ্রয়োগ ভাষায় সবে ঢুকিতেছে অর্থাৎ দু'ই-তিনখানি বহিতে সবে মুখ বাহির করিয়াছে তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্তু পরে ঢুকিবার সম্ভাবনা তাহার প্রতিশব্দের অভিধান এই বেলা করিয়া রাখিলে ভাল হয়, তদ্দ্বারা ভাবী গ্রন্থ-কর্ত্তাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আপনার প্রেরিত প্রস্তাবটিতে যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কোন সুবোধ ব্যক্তি কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারেন না—সেগুলি এত পরিপাটী হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়া অন্যপ্রকার শব্দের প্রতি খাটাইলে ভাল হয়। যখন ব্যবহার দাঁড়াইয়াছে তখন আমরা কি করিব ? এ বিষয়ে আমাদিগের হাত-পা বাঁধা। কোন কোন শব্দ উপযুক্ত নহে তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কি করা যাইবে ? English Channel একটি উপসাগরের নাম ; Channel শব্দে কেবলমাত্র জল যাইবার রাস্তা বুঝায়, তাহা এরূপ উপসাগরের প্রতি কখন খাটিতে পারেনা। কিন্তু কি করা যায় ? তাহা ইংরাজীতে পারিভাষিক হইয়া

পড়িয়াছে। এখন আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব্দ জানিবেন। যোজক শব্দের পরিবর্ত্তে এখন "স্থলসঙ্কট" ব্যবহার করিতে গেলে লোক বিদ্যাড়ম্বরসূচক (pedantic) মনে করিবে। ইতি—

বশংবদ

রাজনারায়ণ বসু

পুনশ্চ—উপরে যে নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের উল্লেখ আছে তাহাতে ইংরাজী Grammar, Rhetoric, Philosophy, Painting, Architecture, Logic প্রভৃতি শব্দও থাকিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। Passion, Emotion শব্দের বাঙ্গালায় অদ্যাপি উপযুক্ত প্রতিশব্দ হয় নাই। উহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ হইলে ভাল হয়।

২

মান্যশ্রেষ্ঠ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

অদ্য Bengal Academy of Literature পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে দেখিলাম লিওটার্ড সাহেব পরিষদের কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য আমার এই মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত রূপ উন্নতি সাধন করিতে চাহেন এবং তাহাই পরিষদের উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সেই মত ঘোষণা করা কর্ত্তব্য যে, কোন গবর্ণমেণ্ট ও কোন বিশেষ ইংরাজের সহিত কথোপকথন অথবা পত্র লিখিবার সময় ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা উচিত আর অন্য কোন উপলক্ষে ইংরাজী ভাষায় কথা কহা অথবা লেখা উচিত নহে। আমি ইহা দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা অথবা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের, ইংরাজীতে সম্বাদপত্র সম্পাদনের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি না, তাহা আপনারা অনায়াসে প্রতীতি করিবেন। কেবল বাঙ্গালা ভাষায় পরিষদের কার্য্য সম্পাদিত হইবে এই নিয়ম করিলে আপাততঃ কতকগুলি

সভ্য ছাড়িয়া যাইবে বটে কিন্তু ক্রমে ক্ষতিপূরণ হইবে, এবং এক্ষণে যাঁহারা কেবল ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে পারেন, বাঙ্গালায় পারেন না তাঁহারা বাঙ্গালায় লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। বঙ্গ পরিষদের কার্য্য বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন দেশ সম্বন্ধীয় নহে, অতএব উহার কার্য্য কেবল বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হইবেনা কেন বুঝিতে পারি না। যদি সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিবার কাহারও ইচ্ছা থাকে, তবে মাতৃভাষা অনুশীলন না করিলে সে খ্যাতি লোভনীয় নহে। অধিক লেখা বাহুল্য। *

বশংবদ

রাজনারায়ণ বসু

[* ঋষি রাজনারায়ণের চিঠি দু'টি 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র চতুর্থ খণ্ড থেকে উদ্ধৃত]

উনিশ শতকের অষ্টম দশকে কলিকাতা "সারস্বত সম্মিলন বা সমাজ" বাংলা পরিভাষা রচনার কাজে হস্তক্ষেপ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার সভাপতি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। ভৌগোলিক নামের পরিভাষা রচনা করে সমাজ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বসু সেই পুস্তিকাটি দেখে এই পত্রটি লেখেন।

দ্বিতীয় পত্রখানি "বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার" এর সভাপতির উদ্দেশে লেখা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রথমে এই নামে অভিহিত হ'ত। এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (২৩শে জুলাই ১৮৯৩)। সভার কার্য বিবরণ ও প্রবন্ধ প্রভৃতি ইংরেজীতে লেখা হ'ত। রাজনারায়ণ বসু সভার কাজ বাংলায় সম্পাদন করার অনুরোধ জানিয়ে এই পত্র পাঠান।

(গৌরদাস বসাকের চিঠি

কলিকাতা, খিদিরপুর
১লা ডিসেম্বর, ১৮৫৫

প্রিয় মধু,

অনেক বৎসর পর তোমায় চিঠি লিখিতেছি। দুইজনের মধ্যে এই সুদীর্ঘ নীরবতা আমাদের উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুতর এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বলিয়া মনে করি। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, কতবার আমি তোমার কথা ভাবিয়াছি। আমার সেই চিন্তা নীরবতায় সমাধিস্থ হইয়াছে, মুক্তির পথ পায় নাই। কারণ আমি তোমার ঠিকানা জানিতাম না এবং তুমি কোথায় ও কি ভাবে আছ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। প্রত্যেকের নিকট তোমার সংবাদ লইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছি। তুমি কোথায় থাক এবং কি কর কেহই বলিতে পারে নাই। অবশেষে এই ভদ্রলোক আমার এই ক্ষুদ্র পত্রটি তোমার নিকট পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব লইয়া আমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। কিভাবে ব্যাপারটি ঘটিয়াছে তাহা ইঁহার নিকট শুনিও এবং ইনি যে তোমার জন্য কষ্ট স্বীকার করিলেন সেজন্য ইঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইও।

চিঠির ঠিকানা ও তারিখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিবে যেস্থান হইতে আমি চিঠি লিখিতেছি, সেই স্থানেই তোমার শৈশব এবং বাল্য—না বরং বলা উচিত তোমার যৌবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ অতিবাহিত হইয়াছে। আমি কোথা হইতে এবং কি জন্য এখানে আসিয়াছি তাহা এই চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তোমায় জানাইতে চাহিনা। ইহার পূর্বে এইভাবেই তোমায় চিঠি লিখিতে পারিতাম কিন্তু আমার উদাসীনতা এবং নিষ্ক্রিয়তার জন্য আমিই দায়ী। তুমি হয়ত মনে করিবে বিস্মৃতির জন্য কিন্তু তাহা নহে, তোমার ঠিকানা না জানিবার জন্যই এইরূপ হইয়াছিল। কোন দিনই আমি তোমায় ভুলিতে পারি না কারণ তোমার প্রতি চিরদিনই আমার গভীর ভালবাসা রহিয়াছে। সেই ভালবাসা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার ঔজ্জ্বল্য নাই বটে কিন্তু অগ্নি এখনও জাজ্বল্যমান। আবার সেই অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া তোল, তাহা হইলে দেখিবে সময় ও দূরত্ব তোমাকে তোমার ঘরবাড়ি, পরিবার, বন্ধুবান্ধব,

আত্মীয়স্বজন এবং আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেও প্রীতির উত্তাপে সেই অগ্নি শিখা দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিবে। আমার অজুহাত ক্ষীণ হইলেও যুক্তিযুক্ত, কিন্তু তুমিও নিজেকে দোষমুক্ত বলিতে পার না। নিজেকে তুমি যতখানি জান, ঠিক ততখানি আমাকে এবং আমার ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন সব কিছুকে। ইচ্ছা করিলেই যে কোন মুহূর্তে তুমি আমায় চিঠি লিখিতে পারিতে কিন্তু তাহা তুমি কর নাই ; আমি মৃত না জীবিত তাহাও কখন জানিবার চেষ্টাও কর নাই। কিন্তু এখন আর দোষারোপের সময় নাই, অতীত অতীতই। এবং আজ যখন আমরা পরস্পরকে কল্পনার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে যাইতেছি তখন ঝগড়া বিবাদ করিয়া লাভ নাই। আজ আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ এবং মন ভাবাবেগে অভিভূত। আশা করি এই পৃথিবীতেই আবার আমরা মিলিতে পারিব। এখনও সব শেষ হয় নাই। তাহাই যেন হয়! ঈশ্বর করুন যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

তোমার মুখের কথা শুনিবার প্রত্যাশায় আমি যে তীব্র উদ্বেগ এবং যন্ত্রণাদায়ক অস্থিরতা ভোগ করিতেছি তাহা আমি তোমার নিকট ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। তোমার স্বাস্থ্য এবং সুখের আনন্দদায়ক সংবাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিবে না বলিয়াই বিশ্বাস করি। আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বর্গগতা হইয়াছেন। তাঁহার আত্মার শান্তি হউক!

বড়ই দুঃখিত যে, তোমার অর্থাৎ তোমার পিতার পরিবারের কোন সুসংবাদই তোমাকে দিতে পারিলাম না। তুমি বহু পূর্বেই হয়ত শুনিয়াছ যে তোমার পিতা-মাতা উভয়েই মারা গিয়াছেন এবং তোমার খুল্লতাতের পুত্রগণ তাঁহাদের সম্পত্তি লইয়া মারামারি করিতেছে। তোমার দুই বিমাতা এখনো জীবিত কিন্তু তোমার লোভী ও স্বার্থপর আত্মীয়েরা তোমার পিতার সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের প্রায় বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছে। সময় থাকিতে ফিরিয়া আসিলে সকল বেআইনী দাবীদারদের ব্যর্থ করিয়া তুমিই তোমাদের জমিদারীর মালিক হইতে পার এবং সর্বনাশা মামলা হইতে পরিবারকে রক্ষা করিতে পার। তুমি কি আসিবে? বর্তমানে তুমি কি কর? আশাকরি তোমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার আমার আছে এবং তুমিও উত্তর দিতে দেরী করিবে না। তোমার নিকটেই

শুনিয়াছিলাম, তুমি বিবাহ করিয়াছ। ক্রমবর্ধমান এবং আনন্দপূর্ণ সাংসারিক পরিবেশে সুখেই আছ, আশাকরি !

তোমারই একান্ত—
গৌরদাস বসাক

[নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি'তে উদ্ধৃত ইংরেজী চিঠির অনুবাদ]

গৌরদাস বসাকের এই চিঠির প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ সোম "মধুস্মৃতি"তে লিখেছেন—"১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী মধুসূদনের পিতা স্বর্গারোহণ করেন। কিন্তু পিতার মৃত্যু সংবাদ কেহই তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন নাই। মধুসূদনের পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল। মধুসূদনও ইহলোকে নাই, এই অলীক ধারণায় আত্মীয়েরা তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি হস্তগত করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, গৌরদাস তাঁহাকে সকল কথা জ্ঞাত করিবার একটি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রেভারেণ্ড কে, এম ব্যানার্জী ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ ভ্রমণে যান ; গৌরদাস সেই সুযোগে মধুসূদনের পিতার মৃত্যু, বৈষয়িক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি বিবৃত করিয়া, ...পত্রখানি 'কৃষ্ণবন্দ্যো'-র হস্তে প্রদান করিয়া মধুসূদন যেখানেই থাকুন, তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণমোহনও তাঁহার কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া প্রবাসী মধুসূদনকে দেশে ফিরাইয়া আনিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।"

(গিরিশচন্দ্র ঘোষের চিঠি)

কলিকাতা, ২রা আগষ্ট, ১৮৫৭

প্রিয়বরেষু,

ক্রমেই গোলমাল পেকে উঠছে। আমাদের পথে পথে সৈন্য টহল দেবে, ভলান্টিয়ারদেরও খবর্দ্দারির শেষ থাকবেনা। আসচে মহরমকে ওরা বোমা বা শেল মনে করেছে। এই বোমা বা শেল যদি ফাটে, তাই ওদের দুশ্চিন্তার শেষ নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, বারাকপুরের সৈন্যদলের যখন হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তখন এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন। বডি গার্ডরা একটু চঞ্চল হলেও সংখ্যায় মাত্র দু'শ। আমাদের কর্ণেল গোল্ডী ছুটিতে ফতেপুর গিয়েছিলেন, সেখানে বেচারাকে মেরে ফেলেছে শুনতে পেলাম। সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহ'লে এক অমূল্য মিত্র হারালাম। শয়তান বিদ্রোহীদের উপর দশ হাজার বজ্রপাত হোক্। একথা সত্যি কেউ বলতে পারে না, যারা প্রকৃত বিশ্বাসী সৈন্য তারাও কত শীগগির তাদের উপরিওয়ালা অফিসারদের গুলী করবে এবং নির্দয় পাষণ্ডদের দলে ভিড়ে যাবে। আশাকরি তোমার ও ছোট্ট ষ্টেশানে কোন ভয়ের কারণ নেই।

অনেক আয়োজন ও পাল্টা আয়োজনের পর আমাদের ঝুলন হচ্ছে। মনে হচ্ছে; বাবা এখানে কাকাকে লিখেছেন যে, উৎসবের সব খরচটা (আমাদের অংশ বাদে) তিনি গোপনে কাকার হাতে দেবেন। কাকার অবশ্য এতে কোন আপত্তি নেই। দেখ, তাহ'লে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমাদের সব মতলব ফাঁসিয়ে দিলেন।...কাজেই বুঝতে পারছ. আইরিশ ক্যাপ্টেনের পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়ে—"Night thoughts" এর লেখক যেমন নাচ নেচেছিলেন, আমাদের আনন্দ প্রায় তেমনি দাঁড়াবে। কিন্তু আমি ও গ্রাহ্যই করিনে। আমার চণ্ডীর খুব জ্বর—মনে হচ্ছে, কার্ত্তিক ঘোষের যাত্রা আর শুনতে পেলাম না।

তোমার গিরিশচন্দ্র ঘোষ

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'The life of Girish Chandra Ghosh' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত ইংরেজী চিঠির অনুবাদ]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর ভাই শ্রীনাথ ঘোষকে এই চিঠি লেখেন। শ্রীনাথ ঘোষ সে সময় বালেশ্বর এবং ভদ্রকের ডেপুটি কালেক্টর। গিরিশচন্দ্র তাঁর ভাইকে যখন এই চিঠি লেখেন সে সময় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক।

এই চিঠিতে গিরিশচন্দ্র কর্ণেল গোল্ডীর মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন। কর্ণেল গোল্ডী সে সময় অডিটার জেনারেল। তিনি দেশীয় কর্মচারীদের ঘৃণা করতেন না বরং তাদের শুভার্থী ছিলেন। কর্মদক্ষতাই ছিল তাঁর প্রশংসার মাপকাঠি। এই উদারস্বভাব রাজপুরুষ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কানপুর বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদেরর হাতে নিহত হ'ন।

সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদে কলিকাতার বিদেশী অধিবাসীরা যে কতদূর সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্রের এই চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। বিদ্রোহীদের ভয়ে ইংরেজরা দেশীয় লোকেদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার জন্যে গভর্ণমেন্টকে চাপ দিতে থাকেন। মুসলমানদের মহরম এসে পড়ায় তাঁরা আরও শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরী তাঁর 'Power of Presentation' বলে গভর্ণর জেনারেল কাছে এই মর্মে এক প্রস্তাব করেন যে, মহরমের আগেই যেন দেশীয় লোকেদের নিরস্ত্র করা হয়। গিরিশচন্দ্র এবং হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র এর বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করেন। তদানান্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংও সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। বিদ্রোহের সময় গিরিশচন্দ্র "হিন্দু পেট্রিয়টে" ভলান্টিয়ারদের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন।

(যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চিঠি)

প্রিয় মহাশয়,

কবির স্বহস্তলিখিত তিলোত্তমা কাব্যের পাণ্ডুলিপিখানি উপহার পাইবার পর কি ভাবে ধন্যবাদ দিলে যথাযথ হইবে জানি না! আমি পরম যত্নে এটিকে আমার গ্রন্থাগারে রক্ষা করিব। কারণ ইহা আমাদের সাহিত্যে এক মহান যুগের স্মারক। এই পাণ্ডুলিপি খানিতেই সেই পরম ক্ষণটি বন্দী হইয়া আছে, যখন সর্বপ্রথম মিত্রাক্ষরের বন্দীদশা কাটাইয়া বাংলা কবিতা ঊর্ধ্বলোকে তাহার আপন মহান রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। একদা এই কাব্য তাহার যথাযথ মর্যাদা পাইবে এবং স্বমহিমাতেই আগামী যুগের রসিক-চিত্তে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিবে। আমার স্থির বিশ্বাস যে, যদি আমার বংশধারা অব্যাহত থাকে তাহা হইলে একদা আমার বংশধরগণ এই কথা ভাবিয়া গর্ববোধ করিবে যে, তাহাদের মাতৃভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সর্বপ্রথম কাব্যগ্রহণের যে পাণ্ডুলিপিখানি সর্বাঙ্গে কবির আপন হস্তাক্ষর বহন করিতেছে—তাহা তাহাদেরই অধিকারে রহিয়াছে। সেই সঙ্গে তাহারাও তাহাদের এই পূর্বপুরুষকে এই কথা ভাবিয়া আরও সম্মান করিবে যে, এই ব্যক্তি এমনই ভাগ্যবান ছিলেন যে কবি স্বয়ং তাঁহাকে এমন অমূল্য একটি উপহার প্রদানের যোগ্য পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া অপরিমেয় রচনা সম্পদে আমাদের মাতৃভূমির সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিতে থাকুন।

ইতি—

বশংবদ

২২ মে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ জে এম ঠাকুর

মধুসূদন 'তিলোত্তমা' কাব্যের পাণ্ডুলিপি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উপহার দেন। এই পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ মধুসূদনের স্বহস্তে লেখা। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম গ্রন্থের সেই পাণ্ডুলিপি পেয়ে যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে যে চিঠি লেখেন তার কিছু অংশ নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি'তে উদ্ধৃত হয়েছে। তার অনুবাদ এখানে দেওয়া হ'ল।

(বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর চিঠি)

১২৭১ সাল। ৬ জ্যৈষ্ঠ

প্রিয় সখা

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"প্রযুক্ত সংকার বিশেষমাত্মনা
ন মাং পরং সম্প্রতি পত্তুমর্হসি।
যতঃ সতাং * * সঙ্গতা°
মনীবিভিঃ সাপ্তপদীনমুচ্যতে ॥

এিক এ নূতন আলো অন্তরে উজলে !
অরুণ কিরণ যেন প্রফুল্ল কমলে।
বহুদিন যে রস করিনি আস্বাদন,
আজি সে মধুর রসে রসিয়াছে মন !
মৈত্রী কিম্বা প্রেমে ইহা ঠিক নাহি পাই ;
যারে ভালবাসা বলে বুঝি হবে তাই।
ছেলেবেলা ছেলেখেলা ফুরায়ে গিয়াছে.
মানুষের মনে মন পশিতে শিখেছে.
তা না হোলে একটুও ছাড়াছাড়ি নাই।
আজ কেন পশিতে প্রবৃত্তি নাহি হয় ?
ছেঁড়াখোঁড়া ভাবিতেও জন্মে যেন ভয় ?
যেন ইহা প্রভাতের পবিত্র কুসুম
ছেঁড়ে কোন্ সহৃদয়, অহৃদয় সম ?
নির্ম্মল বাতাসে বেশ হেলিবে দুলিবে,
মধুর আনন্দে আত্মা উথলে উঠিবে।
হায কেন মন ফের দোলে গো দোলায় !
ঢাকে বা উষার ছটা মেঘের ছায়ায়।
বটে এই মনোহর কুসুম রতন
সৌরভে গৌরবে মোরে করে আকর্ষণ ;

কে জানে ইহার নাই কেহ অধিকারী ?
কে জানে যে নহে নিজস্ব তাহারি ?
পাছে আমি নাহি পাই সম্ভোগের পথ,
হই পাছে মাঝ পথে ভগ্ন মনোরথ,
অথবা চরমে মম মরমের মাজে ?
আচম্বিতে চোরা বাণ বেগে এসে বাজে ?
কি আছে অদৃষ্টে, তাহা বলা নাহি যায়,
'সুখেতে থাকিতে পাছে ভূতেতে কিলায ?'
দূর হোক এ দোলায় কেন দুলি আর,
সন্দেহে প্রণয সুখ হয ছারখার্ !
উদার অন্তরে দিযে হৃদয ঢালিযে
চুপ করে বসে থাকি নিশ্চিন্ত হইযে।
হযত আমার মন মজেছে যেমন
সে তাহায় বিন্দুমাত্র করেনি গ্রহণ।
আপনার তেজঃ গর্ভ নম্র ব্যবহার,
কতদূর শক্তি ধরে মন মোহিবার ;
সরল মধুর ভাব, খোলা আলাপন,
কতদূর করেছে আমারে আকর্ষণ,
হযতো সে নিজে তাহা জ্ঞাতমাত্র নয়,
চন্দ্রমা জানেনা তার কবে কত হয !
শশি হে চকোর করে তোমার ধেযান্,
থেকোনা মেঘের আড়ে, বোধোনা পরাণ।
গায়ে পড়া হোলে তার গুমোর থাকেনা,
জেনেও আমার মন প্রবোধ মানেনা ;
মানিনী ভামিনী নই গুমোর জানিনে,
তা বলে কি প্রেমপাত্র হইতে পারিনে ?
প্রিয় হে আমার মনে অন্য কিছু নাই,
হেরিয়ে তোমায় সুদু হৃদয় জুড়াই।

কে জানে ভাই ! কি ছেলেমানুষী করে বস্‌লেম, কিছুই বলতে পারিনে। কালকের কথায়বার্তায় আর আজকের লেখায় যদি চাপল্য প্রকাশ হয়ে থাকে

বোধ কর, তা ভাই, বড্ড বেশি অভিমান করোনা। আমার এই পত্রিখানি কাহাকেও দেখিও না।

তোমার অনুরক্ত
শ্রীবেহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

[মাসিক বসুমতী, ১৩৬১ শ্রাবণ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের পরিচায়ক এই পত্রটি। বিহারীলালের 'সদ্ভাবশতক' পাঠ করেই দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'ন। বিহারীলাল এই পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের মধুর স্বভাবের উল্লেখ করেছেন।

(কেশবচন্দ্র সেনের চিঠি)

সুয়েজ,
১০ই মার্চ, ১৮৭০ খ্রী

প্রিয় জগন্মোহিনী,

গত শুক্রবার এডেন ছাড়িয়া, লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া, অদ্য সুয়েজে উপস্থিত হইলাম। এশিয়া ও আফ্রিকা যেখানে যোগ হইয়াছে, তাহার নাম সুযেজ। এখানে জাহাজ ছাড়িয়া রেলরোডে যাইতে হইবে। কেবল একরাত্রি রেলরোড গাড়িতে চলিতে হইবে। পরে আবার অন্য একখানি জাহাজে চড়িয়া আলেকজান্দ্রিয়া হইয়া ভূমধ্যসাগর পার হইয়া, ইউরোপে যাইতে হইবে। আমাদের গাড়িতে আর বোধ করি, দশদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। যে পথ দিয়া আমরা যাইতেছি, তাহা 'সুলভে' ভাল করিয়া দেখিবে, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। গত কল্য রজনীতে সাহেবেরা একরকম তামাসা করিয়াছিল। তাহার নাম 'মুরগীর লড়াই।' অর্থাৎ কতগুলি লোক মুরগী হয় ও তাদের হাত

পা বদ্ধ করিয়া দেয়, দুইজন পরস্পরের সম্মুখে বসিয়া পা বাড়াইয়া ঠেলাঠেলি করে; যে ব্যক্তি ঠেলিয়া ফেলিতে পারে তাহার জয় হয়। যাহারা জয়ী হয়, তাহারা আবার এইরূপ লড়াই করে। অবশেষে একজনের জয় হয়। এক সাহেব বিবির কাপড় পরিয়া, বিবি সাজিয়া উপস্থিত হইলেন। খেলা শেষ হইলে তিনি দাঁড়াইয়া কিছু পাঠ করিলেন এবং একখানি ভাঙ্গা প্লেট ঐ জয়ী ব্যক্তিকে দান করিলেন। জাহাজে অনেক দিন থাকিবার যে কষ্ট তাহা সাহেবেরা এইরূপে দূর করেন। এরূপ আমোদপ্রমোদ না করিলে দিন কাটানো ভার। আমাদের জাহাজে অনেকগুলি ছেলে আছে, তাহারা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে, তাহা দেখিলে অনেক তৃপ্তি লাভ হয়, কিন্তু এক একটা ছেলে বড় কাঁদে। এ সময়ে সমুদ্র অত্যন্ত স্থির, তুফানের ভয় নাই। আর ২।৩ দিন পরে বোধ করি শীত পড়িবে। আমরা উত্তাপের সীমা অর্থাৎ গ্রীষ্মপ্রবণ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়াছি এবং ক্রমে শীতপ্রবণ দেশে অগ্রসর হইতেছি। এখন যত উত্তরে যাইব, ততই শীত। * * *

কেশব

২

লণ্ডন

২৫শে মার্চ, ১৮৭০ খ্রীঃ

প্রিয়……

ঈশ্বর প্রসাদে গত সোমবার সন্ধ্যার সময় আমরা নিরাপদে ইংলণ্ডে পঁহুছিয়াছি। তিনি কৃপা করি পথে রক্ষা করিলেন, তিনিই এখানে আনিলেন। তাঁহার প্রতি যেন আমরা কৃতজ্ঞ হইতে পারি। রেলগাড়ি হইতে নামিবামাত্র আলুর (স্বর্গীয় বিহারীলাল গুপ্ত) সঙ্গে দেখা হইল, তাহার সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা ঢাকাস্থ একজন ছাত্র কৃষ্ণগোবিন্দের (স্বর্গীত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত) বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে আসিয়া তোমার হাতের একখানি লেখা পত্র বহুকালের পর পাইয়া যে কি আনন্দিত হইলাম তাহা বলিতে পারিনা। * * *

এখানে আসিয়া অবধি, নূতন নূতন ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইতেছি। লণ্ডন সহর খুবই প্রকাণ্ড। দিবারাত্রি গোলমাল। গাড়িঘোড়াতে রাস্তা সকল পরিপূর্ণ। দোকানের সংখ্যা নাই। এক এক স্থানে পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর গাড়ি চলিতেছে; মনে কর, তাহা হইলে সমস্ত দিনের মধ্যে কতবার ঐ গাড়ী চলে। অনেকগুলি রেলগাড়ি মাটির নীচে চলে, উপর হইতে কিছুই দেখা যায় না। গত কল্য সন্ধ্যার সময় মিস্ কবের বাটি হইতে আসিবার সময় ঐ গাড়িতে চড়িয়াছিলাম। উহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। যিনি ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে বড় সাহেব ছিলেন এবং যাহার সঙ্গে আমার খুব ভাব, সেই লর্ড লরেন্স সাহেবের বাটিতে সেদিন দেখা করিতে গিযাছিলাম; তিনি এবং তাহার স্ত্রী অনেক স্নেহ প্রকাশ করিলেন। তাহার পরদিন তিনি আমাদের বাসায় আসিযা উপস্থিত; কি আশ্চর্য্য! এত বড় লোক হইয়া তিনি আমাদের সামান্য বাসগৃহে উপস্থিত! এখানে বড় লোকদের চাল আমাদের দেশের ন্যায় নহে, তাহাদের সমধিক বিনয় আছে। লরেন্স সাহেবের কন্যা আমাদের কলিকাতার বাটিতে সেদিন (মিস্ পিগটের সঙ্গে) আসিয়াছিলেন, এবং তোমার সঙ্গে আলাপ করিযাছিলেন, তাহা তিনি আমাদিগকে বলিলেন।

এখানে দোকানগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এক এক দোকানে কেবল ফল আর তরিতরকারি বিক্রয় হইতেছে, কমলালেবু কপি আঙ্গুর কেমন সাজান রহিয়াছে। চারিদিকে কেবলই সাহেব। সাহেব রাস্তা ঝাঁট দিতেছে, সাহেব জুতা বুরুস করিতেছে সাহেব দুগ্ধওয়ালা প্রাতঃকালে Milk-উঃ (দুগ্ধ চাই) বলিযা আমাদের বাসার নিকট দুগ্ধ বিক্রয় করে; গতকল্য সাহেব নাপিতের কাছে দাঁড়ি কামাইলাম, সাহেব কোচম্যান আমাদের গাড়ি হাঁকায়, সাহেব দরজি আমাদের কাপড় সেলাই করে। আমাদের বাসার প্রায় সকল কার্য্য একজন বিবি চাকরাণী সম্পন্ন করে। এখনকার চাকরাণীরা দেশের সুকোর ঝির ন্যায নহে, ইহারা এত পরিশ্রম করে যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বিবি ব্রাহ্মণী আমাদের ভাত রাঁধে। মনে করিয়াছিলাম এখানে আহারের অত্যন্ত কষ্ট হইবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। প্রতিদিন দুই বেলা ডাল ভাত ভাজা ও অপরাপর সামগ্রী আহার করিতেছি। আমরা ভেতো বাঙ্গালী, ডাল ভাত প্রতিদিন হাপুশহুপুশ করিয়া খাইতেছি। * *

কেশব।

[পত্র দু'টি মাসিক বসুমতী ১৩৬০ অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে-ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং বছরের শেষে ফিরে আসেন। স্ত্রী জগন্মোহিনী দেবীকে লেখা এই চিঠি দু'টিতে তাঁর যাত্রা পথ এবং ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতার কথা জানা-যায়। প্রথম চিঠিতে সে সময় জাহাজে আমোদপ্রমোদের যে বর্ণনা আছে তা বেশ কৌতুকজনক।

৩

দার্জিলিঙ,
৭ জুলাই ১৮৮২

ভক্তিভাজন মহর্ষি,

হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে কৃতার্থ করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ন 'ব্রহ্মানন্দ' নাম। যদি ব্রহ্মেতে আনন্দ হয় তদপেক্ষা অধিক ধন মানুষের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? ঐ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আপনার আশীর্ব্বাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক সুখ এ জীবনে সম্ভোগ করিলাম। আরো আশীর্ব্বাদ করুন যেন আরও অধিক শান্তি ও আনন্দ তাহাতে লাভ করিতে পরি। ব্রহ্ম কি আনন্দময; হরি কি সুধাময পদার্থ! সে মুখ দেখিলে কি দুঃখ থাকে? প্রাণ যে আনন্দে প্লাবিত হয় এবং পৃথিবীতে স্বর্গসুখ ভোগ করে। ভারতবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন সকলেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আপনার মন তো ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন। * *

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

[অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও কাজ নিয়ে দু'জনের মধ্যে একসময় খানিকটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বরাবর কেশবন্দ্রকে স্নেহ ও সম্মান করতেন। কেশবচন্দ্রর অন্তরেও তাঁর পবিত্র মর্যাদা রক্ষিত ছিল। এই চিঠির মধ্যে সেই শ্রদ্ধার ভাব ব্যক্ত হয়েছে।

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি)

১

বহরমপুর

১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭২

মহাশয়,

আপনার এগারোই তারিখের পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমাকে অপরিচিত চিন্তা করিয়া আপনি ভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়াছেন। আপনার সহিত পূর্ব্বপরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে একাধিক বার আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে।

আমার সম্বন্ধে আপনি অনুগ্রহ করিয়া যত প্রীতিপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে কিভাবে ধন্যবাদ জানাইব ভাবিয়া পাইতেছি না। কিন্তু এই সম্বন্ধে আপনার নিকট আমার ঋণ এত দীর্ঘদিনের যে, শুষ্ক ধন্যবাদ প্রদান দ্বারা আমি তাহার গুরুত্ব লাঘব করিতে চাহি না।

আপনার পরিকল্পনার সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। দেশের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনসমাজের মধ্যে চিন্তা ও সহানুভূতির আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে আমিও একখানি মাসিক পত্রিকা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিব মনস্থ করিয়াছি। আপনি যথার্থই লিখিয়াছেন যে, মঙ্গলের জন্যই হউক অথবা অমঙ্গলের জন্যই হউক ইংরেজী ভাষাই এখন আমাদের বাহন হইয়াছে। এবং ইহার ফলে বঙ্গ সমাজের উচ্চ এবং নীচ স্তরের মধ্যে বিচ্ছেদ প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমার ধারণায় এমন হওয়া উচিত নয়। আমাদের কর্ত্তব্য, নিজেদের সাহেবীয়ানা কিছু পরিমাণ ত্যাগ করিয়া দেশের জনসাধারণের নিকট তাহাদের বোধগম্য ভাষায় বক্তব্য পেশ করা। বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকার পরিকল্পনা আমার সেই উদ্দেশ্যেই। কিন্তু তাহাও আমাদের কর্ম্মসূচির অর্দ্ধাংশ মাত্র। শুদ্ধ বঙ্গভাষায় প্রচারিত কোন পত্রিকার দ্বারাই বঙ্গদেশের অধুনাতন সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত করা যায় না। বাঙ্গলা দেশের বৃহৎ জনসমাজের নিকট আমাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করাও যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ভারতের অন্যান্য জাতি এবং আমাদের শাসক জাতির নিকটে তাহা গোচরীভূত করা। বাঙ্গালী এবং পাঞ্জাবী এই দুই জাতি যতদিন না পরস্পরকে জানে এবং পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে ও ইংরেজ জাতির উপর

তাহাদের যৌথ প্রভাব বিস্তার করে ততদিন ভারতবর্ষের কোন আশা নাই। কেবলমাত্র ইংরাজীর মাধ্যমেই তাহা সম্ভব এবং সেই কারণেই আপনার পরিকল্পিত পত্রিকাখানিকে আমি স্বাগত করিতেছি। ইংরাজী বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে আপনাকে আমার ধারণা বিস্তৃত ভাবে জানাইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছি এই কারণে যে, অন্য সময়ে হয়ত আমাকে অনুধরণের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে শুনিবেন। মূলতঃ যখন আমরা প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে নিযুক্ত, তখন প্রশ্নটির দুইদিকেই প্রখর আলোক-সম্পাত করা প্রয়োজন।

আমার পক্ষে একথা জানানো হয়ত নিষ্প্রয়োজন যে, আপনার সহিত সহযোগিতা করায় আমার উৎসাহের অভাব ঘটিবেনা এবং আপনি যদি মনে করেন যে, আমার সাহিত্যিক শক্তি আপনার কোন প্রয়োজনে লাগিবে তাহা আপনি যদৃচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন। যদিও বর্ত্তমানে আমি কিছুটা ব্যস্ত, অবশ্য সাহিত্য সংক্রান্ত কাজে নয়, আমার কর্ম্মস্থলে অফিসার-দের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার ফলে—তথাপি আপনার ও আমার পত্রিকার জন্য আমি কিছু সময় করিয়া লইব। আপনার পত্রিকার সদস্য তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করা যদি আপনি উত্তম বিবেচনা করেন তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই জানিবেন। আশাকরি, কুশলে আছেন।

ইতি ভবদীয়
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৩৫৪ সালের মাসিক বসুমতী, আষাঢ় সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

“মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন” পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা এই চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শন” (১৮৭২ খৃঃ) প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। উনিশ শতকের সাহেবী মনোবৃত্তির অন্তরালে জাতীয় চেতনার নতুন উন্মেষ সাধনের জন্যে বঙ্কিম কতখানি চিন্তা করতেন তার পরিচয় পাওয়া যায় এই চিঠিতে। ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশের সমর্থনে তিনি যে কথা বলেছেন তাহাও লক্ষণীয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন—“১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুলেখক ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় “মুখার্জীস্ ম্যাগাজিন” নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করেন

তখন কালীপ্রসন্ন বহুমূল্য মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া উহা বিনামূল্যে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।" পাঁচ সংখ্যা প্রকাশের পর ঐ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে উহা আবার প্রকাশিত হয়।

২

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার পত্রগুলির যে উত্তর দিতে পারি না, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে তাহার উত্তর অদেয়। আপনি যাহা লেখেন তাহা এত মধুর যে, উত্তর যাহাই দিই না কেন, তাহা কর্কশ হইবে। আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া আর অমৃত পান করিয়া ধন্বন্তরিকে মূল্য দেওয়া সমান বলিয়া বোধ হয়। আপনার উত্তর না দেওয়াই ভাল—কোকিলকে thanks দিয়া কি হইবে? আপনার নববর্ষ প্রভৃতি দিবসের সম্ভাষণ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ খাটে। আপনি নিজে পীড়িত; চক্ষের যন্ত্রণায় লিখিতে অসমর্থ, তথাপি আমাদিগের মঙ্গল আন্তরিক কামনা করিয়া, পত্র লিখিয়াছেন। আপনার তুল্য মনুষ্য অতি দুর্লভ। আপনাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনি অচিরাৎ আরোগ্য লাভ করিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে থাকুন।

স্যর অ্যাস্‌লি ইডেনের স্বদেশ গমন উপলক্ষে কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলে ভেড়া মার, গোবরজল ছড়া দাও। কেহ বলে "অরে নিদারুণ প্রাণ! কোন্ পথে ** যান্, আগে যারে পথ দে·.হয়া" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের লাভের মধ্যে দুই একটা সমারোহ দেখিতে যাইব।

আমার দৌহিত্রটি এ পর্য্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই—তবে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম কুবের প্রভৃতি দিক্‌পালগণ পূর্ব্বমত দিক্ পালন করিতেছেন—চন্দ্রের মধ্যে মধ্যে পূর্ণোদয় হয়—মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা। এখন কালী প্রসন্ন হইলেই আনন্দমঠ বজায় হয়। ইতি তাং ৪ঠা বৈশাখ (সনের উল্লেখ নাই)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[চিঠিটি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লেখা মাসিক বসুমতী, ১৩৬০ কার্তিক সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

স্যর অ্যাসলি ইডেন নীলবিদ্রোহের সময় বারাসত জেলার (এখন মহকুমা) জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক 'রোবকারী' জারী করে বলেন যে, প্রজার জমিতে জোর করে নীল চাষ করতে এলে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রজাকে রক্ষা করবেন। নীল চাষীদের সমর্থন করবার জন্যে ইডেন সাহেব তখন খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এরপর তিনি ব্রহ্মদেশে চিফ কমিশনার হয়ে যান। স্যর রিচার্ড টেম্পেলের পর আবার ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি তিনি বাংলার লাট নিযুক্ত হন। তখন বাঙালী তাঁকে মহাত্মা বলে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু পরে ইনিই ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপের আয়োজন করেন। স্যার ইডেনের স্বদেশ গমন উপলক্ষে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ এপ্রিল কলিকাতা টাউন হলে এক বিদায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ তারিখে তাঁর কলিকাতা থেকে বিদায় গ্রহণের দিনও বিরাট সমারোহের আয়োজন হয়।

(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি)

১

মহাত্মন্,—

ঘণ্টা ঠন্‌ঠনায়মান। গঙ্গাতীরে, ধীর সমীরে, বসতি সুখং দ্বিজনাথঃ। আপনার শরীরাদির ভাবগতি কিরূপ? একটু নিভৃত হইবার ইচ্ছা হয় কি? গাছগাছালির স্নিগ্ধ ছায়ায় ঠাণ্ডা হইবার ইচ্ছা হয় কি? বিস্তৃত এবং বক্রায়মান গঙ্গা দর্শনের ইচ্ছা হয় কি? যে গঙ্গায় নৌকা কখন কখন এমনিভাবে অবস্থিতি করে যে, যেন এক প্রসারিত কুঞ্চিত রূপার পাতে কোন কারিকর নৌকাটিকে বসাইয়া রাখিয়াছে। যে গঙ্গা প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে দ্বিপ্রহর কালে, রাত্রিকালে, অপরাহ্ন কালে, সকল কালেই রমণীয়। যে গঙ্গার সমীরণে শরীর গতজ্বর হয়। যে গঙ্গার দর্শনে শরীরের পাপ ও নয়নের তাপ দূরীভূত হয়। যে গঙ্গা প্রশস্ত। যে গঙ্গা বিশালা। যে গঙ্গার তীর-তরু অস্তগামী তপনদেবকে ঢাকিয়া রাখিতে গিয়া উজ্জ্বল হয়। এবম্ভূতা যে গঙ্গা,

ইহা 'ব্রহ্মসাধন'কারীর মনকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে, ইহা যেন আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কিন্তু এই মানস প্রত্যক্ষ কবে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে পরিণত হইবে, ইহাই এক্ষণে জিজ্ঞাস্য।

—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

২

দীন দ্বিজের রাজ-দর্শন না ঘটিবার কারণ।

টঙ্কাদেবী কর যদি কৃপা
না রহে কোন জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না
খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥
ইচ্ছা সম্যক্ তব দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু
একি দৈবের শাস্তি॥

শান্তিনিকেতন ১৭ ফাল্গুন

৩

প্রীতিভাজনেষু,—

আপনার দ্বিতীয় পত্র এইমাত্র পাইলাম। আপনাকে ইহা বলা বাহুল্য যে, বিবাহের পাত্রনির্ব্বাচনের কষ্টিপাথর—প্রেম, জহুরী-জ্ঞান। দুয়ের যোগ মণিকাঞ্চনের যোগ। যে বিবাহ প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং জ্ঞান দ্বারা অনুমোদিত তাহা সর্ব্বথা অনুষ্ঠাতব্য। আইন রক্ষার্থে যাহা আবশ্যক তাহা দেশকালপাত্র-বিবেচনা-মতে অনুষ্ঠাতব্য। কিন্তু এটাও দেখা উচিৎ যে, আইন যদি বর'কে জোর করিয়া বলাইতে চায় "আমি হিন্দু নহি", তবে

আইনের সেই বলগর্ব্বিত কথার জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দেওয়া অধম নীচত্বের চিহ্ন। বিবাহের ন্যায় অত বড় একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অমন ধারা একটা কাপুরুষোচিত নীচত্ব স্বীকার করা বরের পক্ষে কোন ক্রমেই শোভা পায়না— ব্যথার ব্যথী শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এই পত্রগুলি 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' ষষ্ঠ খণ্ড থেকে উদ্ধৃত]

(কালীপ্রসন্ন সিংহের চিঠি)

মহামহিম ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু—

নিম্ন স্বাক্ষরিত বঙ্গদেশবাসীদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে, বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত করায় বঙ্গদেশবাসীগণের যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত, কারণ দেশের শান্তিরক্ষা ও কু-রীতি নিরাকরণ করাই ছত্রধরদিগের উচিত কার্য্য ও তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। এক্ষণে পুলিস কর্তৃক যেরূপ শান্তি রক্ষা হইতেছে বর্ণন বাহুল্য, অতি সুচারুরূপেই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, নগরীর যাবতীয় শান্তিরক্ষার মধ্যে বেশ্যাকুল দ্বারা তাহার অনেক অংশের ক্রটি হয়, কারণ বারযোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগকরণে বাধ্য হন, চৌর্য্য কার্য্যদ্বারা যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় তাহা কেবল ঐ বারললনাগণের ব্যবহার কারণ। রাত্রিকালে মদ্য বিক্রয়, যাহা ভয়ানক শান্তিভঙ্গ, তাহা কেবল বারযোষাগণের নিমিত্তে হয়। কলহ, মদ্যপান দ্বারা জীবন সংহার, ব্যসন, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচারকরণ এই বারস্ত্রীগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়, আরো বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের ইহা স্বভাব সংশোধন বলিলেও বলা যাইতে পারে; কারণ তাহারা কি প্রাতঃকালে কি

সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। বেশ্যা সংখ্যায় ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য কি, তাহাদিগের প্রতি কোন উক্ত নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যথেচ্ছা তাহাই করিতেছে। কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার জন্য এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবান্‌গণ স্বীয়-স্বীয় বসত-বাটিতেও অধিক ভট্টালোভী* হইয়া ভদ্রপল্লীমধ্যে বেশ্যাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন; যদ্দ্বারা একঘর বেশ্যাবৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে। অতি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ধন্‌বান মান্য বংশের প্রাসাদের নিকটেই বেশ্যা নিকেতনে কেবলই ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন, নতুবা কোন প্রকারেরই ভদ্র ধন্‌বানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্র নগর বাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না। যদ্যপি রাজা হইয়া প্রজাদিগের শুভ চীৎকারের সময়ে কালার ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে সেই রাজার রাজত্বের কীর্ত্তি কোন কালেই পতাকা রূপে উড্ডীন হতে পারেনা।

অতি পূর্ব্বে সোণাগাজি নামক স্থানে বেশ্যাদিগের বাসস্থল ছিল, অদ্যাপিও তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্ব সময়ে যেরূপ শান্তিরক্ষার নিয়ম ছিল মধ্যে তাহার উল্লেখ না হইবায় একেবারে তাহা মিলিত হইয়া গিয়াছে। অযোধ্যা, কাশী, দিল্লী ইত্যাদি নগরে এবং ইউরোপীয় নানা নগরে এই প্রকার রীতি প্রচলিত আছে, তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে এই নিবেদন করি যে দেশীয় স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ও শান্তিকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ জন্য সভ্য মহোদয়েরা মনোযোগী হইযা বেশ্যাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট করুন যদ্দ্বারা আমাদের ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

মহোদয়গণ

আমরা আপনাদিগের নিতান্ত অনুগত-ভৃত্য

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক

ভাড়া

[মাসিকবসুমতী, ১৩৬১ শ্রাবণ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

(কালীপ্রসন্ন ঘোষের চিঠি)

"বাঙ্গালা ভাষা যেমন আপনার, তেমন আমার এবং সেইরূপ আমাদিগের প্রত্যেকেরই মাতৃস্বরূপা। বিখ্যাত দার্শনিক অগস্ত কোম্ সমগ্র মানবজাতিকে একটি মনঃকল্পিত দেবতা জ্ঞানে ধ্যান ও আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমার মনঃকল্পিত দেবতা মাতৃরূপিনী বঙ্গভাষা। আমি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল বঙ্গভাষাকে মনে মনে মা বলিয়া ডাকিয়াছি—মা বলিয়া ভালবাসিয়াছি এবং মাতৃজ্ঞানে আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিমাণে পূজা করিয়াছি। আর, যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত বাংলা ভাষার সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও মায়ের সুসন্তান বলিয়া ভ্রাতৃসম্ভাষণে সম্মান করিয়াছি।…

৯ই ফাল্গুন, ১৩০৬।"

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

[অনুসন্ধান, ১৩০৭ বৈশাখ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

"সাহিত্য সম্মিলন" সম্পাদক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র থেকে এই অংশ উদ্ধৃত। এই পত্রে বাংলা ভাষার প্রতি কালীপ্রসন্নের ঐকান্তিক অনুরাগ এবং সাহিত্যকারগণের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় সুপরিস্ফুট। কালীপ্রসন্নের রচনা-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখর কর যা লিখেছেন তার খানিকটা এখানে উদ্ধৃত হল: "সকল সাধনারই একটি সঙ্কল্প এবং একটি মূলমন্ত্র থাকে। কালীপ্রসন্নের সঙ্কল্প ছিল—মাতৃভাষার সেবা, আর মূলমন্ত্র ছিল—শুদ্ধি এবং সৌন্দর্যের সমাবেশ।"

(চন্দ্রনাথ বসুর চিঠি)

কলিকাতা
১ কার্তিক, ১২৯১

সবিনয় নিবেদন,

আনন্দমঠ সম্বন্ধে আপনি যে মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহারি একটু আলোচনা করিব। বোধ হয় তাহাতেই অনেকটা গোল মিটিয়া যাইতে পারে। তবে একটা কথা এই যে, বোধহয় আনন্দমঠ আপনি যে চক্ষে দেখিয়াছেন, আমি ঠিক সেই চক্ষে দেখি নাই—বোধহয় কোন গ্রন্থই দুইজন একচক্ষে দেখে না। অতএব আপনি যে spirit-এ আনন্দমঠ পড়িয়াছেন, আমি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি কিনা বলিতে পারি না। অতএব বুঝিবার দোষে যদি কোন গোল থাকিয়া যায় তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পরে করিব।

আনন্দমঠেব কার্য্য সচরাচর সংসার ধর্ম্মের কার্য্য নয়—আনন্দমঠের ছবি সংসার ধর্ম্মের ছবি নয়। আনন্দমঠের কার্য্য, সচারাচর বা everyday lifeএ মানুষ যে কার্য্য করে না সেই কার্য্য। অর্থাৎ প্রবল স্বদেশানুরাগে প্রধাবিত হইয়া স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা—এই কার্য্য। আনন্দমঠের পাত্রগণের আর কোন কার্য্য নাই—তাহারা যতক্ষণ আমাদের সামনে আছে, ততক্ষণ তাহাদের সেই একমাত্র কার্য্য—সেই কার্য্যই তাহাদের ধ্যান, জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা, আরাধনা, চেষ্টা, চরিত্র, চিন্তা ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই একমাত্র কার্য্য তাহাদের সমস্ত জীবনের পরিধি পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে—সে কার্য্যও যা, তাহাদের জীবনও তাই। সেই একমাত্র কার্য্য তাহাদের একমাত্র জীবন, একমাত্র ব্রত। যদি অনেক গুলি ব্যক্তির এই রকম একমাত্র জীবন একমাত্র ব্রত হয়, তাহা হইলে সেই অনেকগুলি ব্যক্তি কি একটি মাত্র ব্যক্তিস্বরূপ হইয়া উঠে না? ইতিহাসে তো তাহাই দেখিতে পাই। স্পার্টাবাসীরা এই উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করিত। তাই স্পার্টাবাসিকে একটি মাত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে হইত। তাহাদের ব্যক্তিগত প্রভেদ সব সেই এক উদ্দেশ্যের কাছে বলি দেওয়া হইয়াছিল। রোমের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সামরিক প্রাধান্য। অতএব প্রত্যেক রোমানকে সেই এক উদ্দেশ্যের প্রতিকৃতি বলিয়া মনে হইত—যেন সকল রোম একই ছাঁচে ঢালা। কার্থেজ যখন রোমের সহিত সাংঘাতিক সমরে নিযুক্ত, তখন সমস্ত

কার্য্যেক্ষেত্রবাসী একটি ব্যক্তিস্বরূপ—এক মন, এক প্রাণ, এক নিঃশ্বাস, এক উদ্দেশ্য। যেন সকলেই এক ছাঁচে ঢালা। ইংরাজের প্রধান উদ্দেশ্য বাণিজ্য —অতএব সকল ইংরাজই যেন একমাত্র বাণিজ্যের প্রতিমূর্ত্তি—সকলেই এক ছাঁচে ঢালা। হিন্দুর জীবন ধর্ম্মময়—সকল হিন্দুই যেন এক ছাঁচে ঢালা। ইউরোপের নানা দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক সব এক দেশের লোক—এক মনা লোক—এক ছাঁচের লোক। ক্রমওয়েলের অসংখ্য Ironsides সবই এক-ছাঁচে ঢালা যেন তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভেদ কিছুমাত্র নাই। এক-ব্রতীরা যখন এক-ব্রত হইতে থাকে তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভেদ ততই লোপ পাইতে থাকে। শেষে যখন সমস্ত এক-ব্রতীরা এক-ব্রতী হইয়া পড়ে তখন তাহারা একটি regimentএর সৈন্যদের ন্যায় একটি ব্যক্তিস্বরূপ হইয়া পড়ে —তখন নাম ও নম্বর ভিন্ন তাহাদিগকে চিনিবার অন্য উপায় নাই। অতএব আমি এইরূপ বুঝি যে, আনন্দমঠের পাত্রগণকে যদি আপনার কেবলমাত্র নাম ও নম্বর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে তবে এক-ব্রতীরা যথার্থই এক-ব্রতী হইয়াছে—বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য যথার্থই সিদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয় কথা—এক উদ্দেশ্য বিশিষ্ট অথবা এক-ব্রতী লোকদিগের কার্য্যের একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। তাহারা যে সকল কার্য্য করে তাহা তাহারা নিজে করে না—কে যেন তাহাদিগকে সেই সব কার্য্য করায়। যে করায় সে হয় একটি idea, নয় একটি ব্যক্তি। স্পার্টাবাসীরা যে সব কার্য্য করিত তাহা তাহারা নিজে করিত না, Lycurgus নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইত। ক্রমওয়েল Ironside সৈন্যগণ যাহা করিত, তাহা তাহারা নিজে করিত না, ক্রমওয়েলের নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইত। নেপোলিয়নের সৈন্য যাহা করিত তাহা নেপোলিয়ন নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইত। হিন্দুরা যেরূপে সংসার ধর্ম্ম করে, তাহা তাহারা নিজে করে না, মনু নামক জাদুকর তাহাদিগকে করান। আজিকালি জার্ম্মাণেরা যাহা করিতেছে তাহা তাহারা নিজে করিতেছেনা, বিসমার্ক নামক জাদুকর তাহাদিগকে করাইতেছে। সকল মহৎ কর্ম্মই জাদুকেরা করে, মানুষ নিজে করে না। বিশেষ যখন এক-ব্রতীরা একত্র হইয়া কোন মহৎ কর্ম্ম করে তখন তাহারা নিজে তাহা করে না, কোন জাদুকর তাহাদিগকে করায়। অতএব আপনাকে যে বোধ হইয়াছে যে, আনন্দমঠের পাত্রগণ নিজে কিছু করিতেছে না, কোন জাদুকর তাহাদিকে করাইতেছে, ইহাই আমার মতে আনন্দমঠের successএর

উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সত্যানন্দ যথার্থই ভেল্কী। হানিবল, আলেক্‌জন্দার, ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ান, মায়রাবো, পেরিক্লিস, লাইকরগস্, খৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, মনু—সকলেই তাই। আমারও সত্যানন্দকে ভেল্কী বলিয়া মনে হইয়াছে এবং সেই জন্যই আমি বলি যে আনন্দমঠ অতি চমৎকার success.

তবে একটি কথা আছে। আনন্দমঠ এত successful বলিয়া আমার মনে হইলেও, আমার এমনটা বোধ হয় যে, আনন্দমঠের ব্যাপারটা যেন কিছু সুদূরস্থাপিত ব্যাপার। এরূপ বোধ হইবার কারণ এই যে, সে ব্যাপার মানুষের নিত্য সাংসারিক জীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। যে কার্য্য মানুষ সর্ব্বদা করে না, বিশেষ বাঙ্গালী যাহা স্বপ্নেও মনে করে না, তাহা বাঙ্গালীকে কিছু ফাঁকা ফাঁকা রকম ঠেকিবারই কথা। কিন্তু আনন্দমঠের কবি ভয়ানক স্বদেশভক্ত এবং স্বদেশের উদ্ধার তাঁহার বড় সাধের চিরসঞ্চিত সুখ-স্বপ্ন। অতএব আনন্দমঠের ব্যাপার তাঁহার কাছে সুদূর স্থাপিত বা Devoid of human interest নয়। এবং আমরাও যখন তাঁহার ন্যায় প্রকৃত স্বদেশানুরাগ অনুভব করিব তখত আনন্দমঠের ব্যাপার আমাদিগকেও সুদূর স্থাপিত বা devoid of human interest বলিয়া বোধ হইবে না। এখনও আমি যখন বঙ্কিমবাবুর মনের ভাব কল্পনা করিয়া আনন্দমঠ পড়ি তখন আনন্দমঠে প্রভূত human interest দেখিতে পাই। তখন আনন্দমঠের কবি এবং আনন্দমঠ উভয়কেই বঙ্গের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ideal জিনিষ বলিয়া মনে হয়। অথচ human interest-এ পরিপূর্ণ। স্বদেশ কি human interest-এর জিনিষ নয়?

শান্তি ব্যতীত আনন্দমঠ হয় না। স্ত্রী patriot এবং বীর না হইলে পুরুষ বীর এবং patriot হয় না। তাই শান্তির সৃষ্টি। অতএব শান্তি স্ত্রী —প্রকৃত স্ত্রী—যেমন দুর্গাবতী, জয়াবতী, মীরাবাঈ ইত্যাদি। তবে আনন্দ-মঠের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট। সে নির্দ্দিষ্টরূপে শান্তি, শান্তিরূপে বই অন্যরূপে দেখা দিতে পারে না। তাই বলিয়া কি তাহাকে সে রূপে দেখিব না? সকলের সকল রূপই দেখিতে হয়, নইলে দেখাই হয় না, সংসারও বুঝা হয় না। পারিবারিক জীবন আনন্দমঠের উদ্দেশ্য হইলে, আনন্দমঠে শান্তিকেও নিমাইমণির মতন ঘরের জিনিষ দেখিতাম এবং সন্ন্যাসিনী শান্তিতে যেরূপ অগাধ প্রেম, পতিভক্তি, আত্মোৎসর্গ প্রবৃত্তি এবং চপলতা, হাস্যময়ভাব, রসাধিক্য, sprightliness প্রভৃতি গুণ মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে

নিশ্চয়ই বোধ হয় যে আনন্দমঠ পারিবারিক উপন্যাস হইলে তাহাতে শান্তিকে বঙ্কিমবাবুর সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, মৃণালিনী, কমলমণি প্রভৃতি সকল শ্রেণীর রমণীর এক অদ্ভুত অনুপম ঐন্দ্রজালিক সংযোগরূপে দেখিতাম। তবে আপনি যেমন বলিয়াছেন আমারও তেমনি বোধ হয় যে, বঙ্কিমবাবু শান্তিকে লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু যখন হস্তলিপি হইতে আমাকে আনন্দমঠ পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন তখন আমিও তাঁহাকে একথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি শুনেন নাই। বোধ হয় তাঁহার মত আমার মতের সহিত মিলে নাই।...

ইতি

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

চিঠিখানি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালার' ৮ম খণ্ড থেকে সংগৃহীত।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধক চরিত মালা'য় (৮ম খণ্ড) চন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে লিখেছেন; "বাংলা সাহিত্যে চিন্তাশীল সাহিত্য-রসোত্তীর্ণ প্রবন্ধ লেখকের সংখ্যা অল্প; বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল ভূদেব, বঙ্কিম এবং পরবর্তীকালে রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ—ইহাদের মধ্যে ভূদেব-শিষ্য চন্দ্রনাথ বসুও একজন। তাঁহার 'শকুন্তলাতত্ত্ব' ও 'সাবিত্রীতত্ত্ব' একদা বাঙালী সমাজকে আনন্দ দিয়াছিল এবং ইঁহার সংযম-শিক্ষা তরুণ বাঙ্গালীদের নৈতিক আদর্শ দৃঢ় করিয়াছিল।" রবীন্দ্রনাথকে লেখা এই দীর্ঘ চিঠি থেকেই চন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম সমালোচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাবিত্রী লাইব্রেরীতে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন তার মধ্যেও তিনি চন্দ্রনাথকে য়ুরোপীয় সমালোচকদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠি

কলিকাতা, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮

সবিনয় নিবেদন,—

আপনার অনুগ্রহ-পত্র পাইয়া বিশেষ বাধিত হইলাম। কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে আমি এমন কিছু কাজ করি নাই, যাহা আপনার ইতিহাসে উল্লেখের যোগ্য। আমি 'বীরনারী' ও 'সুরুচির কুটির' নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছিলাম এবং 'নববার্ষিকী' বলিয়া আর একখানি বিবিধ বিষয় সম্বলিত গ্রন্থ প্রতি বৎসর প্রকাশ করিবার সূচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু যদিও প্রথম দুইখানি গ্রন্থ ভাষান্তরিত হইয়া ভারতের অন্যস্থানে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, উহার কোনও একখানি বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে আদৃত হইযাছে বলিতে পারি না। সুতরাং এই অবস্থায় আমার নাম প্রতিষ্ঠা ভাজন গ্রন্থকারদিগের সহিত সংযুক্ত না করাই শ্রেয়ঃ। উহাতে আপনার প্রবন্ধের গৌরব লাঘব হইবারই সম্ভাবনা। এই কারণে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইতেছি। আশা করি আমার এই অনিবার্য্য ত্রুটি ক্ষমা করিবেন, আর এক কথা এই, আমার জীবনে স্মরণ যোগ্য এমন কোন কাজ হয় নাই, যাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন বহুকাল পূর্ব্বে আমাকে লিখিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর জীবনে তিনটি স্মরণীয় কার্য্য আছে। প্রথম জন্ম, দ্বিতীয় বিবাহ, তৃতীয় মৃত্যু। [illegible]ার জীবনে প্রথম দুইটি ঘটিয়াছে। তৃতীয়টি এখনও ঘটে নাই। তবে যাঁহারা জগতের হিতে রত না থাকিয়া কেবল আপনার চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা জীবিতাবস্থায়ও মৃত। সেই হিসাবে মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমিও মৃত-সংখ্যার মধ্যে গণ্য।

নিবেদক

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[জন্মভূমি, ১৩০৪ পৌষ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

"জন্মভূমি" পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত "বাঙ্গালা ভাষার

লেখক” প্রবন্ধের জন্যে দ্বারকানাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী চেয়ে পাঠান। তার উত্তরে দ্বারকানাথ এই চিঠিটি লেখেন।

দ্বারকানাথ ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মবীর। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন্ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে সে যুগে তিনি ছিলেন অগ্রণী। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও তিনি সাহিত্য সাধনায় ক্ষান্ত ছিলেন না। উপন্যাস নাটক, কবিতা লেখা ছাড়াও তিনি বহু সংগীত রচনা করেছেন। স্বদেশী সংগীতের একটি সংকলনও তিনি করে গেছেন। কিন্তু তিনি কোনদিন সাহিত্য-যশোপ্রার্থী ছিলেন না। অধিকাংশ গ্রন্থেই তাঁর নাম থাকতো না। উদ্ধৃত চিঠি থেকেও প্রমাণ হয় যে, লেখক হিসাবে তিনি একেবারে নিরভিমানী ও বিনয়ী ছিলেন।

(নবীনচন্দ্র সেনের চিঠি)

“একদিন মাত্র নাসিকে থাকিয়া, ছাব্বিশ ঘণ্টা রেলে কাটাইয়া, আমরা অবষন্ন প্রাণে জব্বলপুর পঁহুছি। সেই রাত্রিতেই তারাচরণ চলিয়া আইসেন। পরদিন প্রাতে আমি নর্ম্মদা দর্শন করিতে যাই। জব্বলপুর হইতে এ স্থান এগার মাইল ব্যবধান; পথ অতি সুন্দর এবং ছায়াসমাচ্ছন্ন। প্রথমেই নর্ম্মদার জলপ্রপাত দেখিতে যাই। স্থানীর লোকেরা ইহাকে “ধূমধারা” বলে। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে, প্রস্তরগর্ভে বেগে জলধারা পড়িয়া যে জলকণা উৎকীর্ণ করে, তাহা দূর হইতে ঠিক ধূমের মত বোধ হয়। সেইজন্য এই জলপ্রপাতের নাম ধূমধারা হইয়াছে। উভয় পার্শ্বে শ্বেত শৈলশ্রেণী। তাহাদের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া প্রস্তরগর্ভা নর্ম্মদা প্রবাহিতা। দেখিলেই মেঘদূতের সেই কবিত্বপূর্ণ চরণটি মনে পড়ে।

“রেবাং দ্রক্ষস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপদে বিশীর্ণাম্।”

অর্থ,— “বিষম উপল মাঝে—
বিন্ধ্যপদে শীর্ণরেবা করিও দর্শন।”

নর্ম্মদার অন্য নাম রেবা তাহা তুমি জান। অনুমান পঞ্চাশ হস্ত ঊর্দ্ধ হইতে বহু ধারায় গর্জন করিয়া, নর্ম্মদা ভীষণ বেগে পতিত হইয়া, এই অপূর্ব্ব জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছেন। নর্ম্মদা যেন অবিরাম সংখ্যাতীত শ্বেতকুন্দকুসুম-রাশি বর্ষণ করিয়া বিন্ধপাদ পূজা করিতেছেন। জল তুষারবৎ শীতল। তথাপি এই প্রাকৃতিক কবিত্বস্রোতে অবগাহন না করিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। প্রপাতের নীচে নামিবার সাধ্য নাই। উপরিভাগে বসিয়াও স্নান করিবার সময় আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। স্রোতের বেগ এত প্রখর কিন্তু চারি অঙ্গুলের অধিক জলের গভীরতা নাই।

ফিরিবার সময় গৌরীশঙ্কর দর্শন করি। জলপ্রপাত হইতে এই মন্দির পর্য্যন্ত, গিরিমূল অসংখ্য আমলকী, বেল এবং নানাবিধ বনজাত ফলবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। দেখিলে, ঋষিদিগের পুরাতন আশ্রমের চিত্র মনে পড়ে। মন্দিরটি একটি শৃঙ্গে অবস্থিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—কেশবচন্দ্রের নববিধান! মধ্যস্থলে বৃষারূঢ়া হরপার্ব্বতী। তাহার উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে গণপতির সঙ্গে বুদ্ধদেব নীরবে শোভা পাইতেছেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রাচীরের মত শ্রেণীবদ্ধ কক্ষমালা। প্রত্যেক কক্ষে এক একটি মূর্ত্তি বিরাজিত। অল্প বেশী সকলেরই ভগ্নাবস্থা। পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, চৌষট্টি যোগিনী। কিন্তু আমি তাহাতে যোগিনীর গন্ধও দেখিলাম না, অধিকাংশই মাহেশ্বরী প্রভৃতি রক্তবীজ বধের মহাবিদ্যা দুরবস্থাপন্না হইয়া পড়িয়া আছেন। মন্দিরটি একসময়ে গৌরবাপন্ন ছিল, সন্দেহ নাই। এ পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে নর্ম্মদার উভয়তীরস্থ শৈলমালা ও উপত্যকার শো.. মনোমুগ্ধকর।

পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া আমি ভারতখ্যাত 'মার্বেল রক' বা মর্ম্মর পর্ব্বত দেখিতে যাই। এখানে নর্ম্মদার উভয়-তীরস্থ পর্ব্বতই মর্ম্মর, কিন্তু উপরিভাগ তৃণ-গুল্ম সমাচ্ছন্ন এবং বৃষ্টির দ্বারা বিবর্ণ হইয়াছে। সেরূপ অমল শ্বেতবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। জলপ্রপাত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে জলপতন-বেগে গর্ভস্থ প্রস্তর কাটিয়া একটি দীর্ঘকায় বিচিত্র সরোবর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে স্বয়ং প্রকৃতিই শিল্পী, সেখানে তাহার বিচিত্রতা এবং শোভার কথা কি বলিব? গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এখানে দুটি বাঙ্গালা এবং দুখানি 'প্লেজার বোট' বা আমোদ-তরণী রক্ষিত হইয়াছে। তীরস্থিত গৃহ দুখানি যেন দুখানি ছবি। ডিষ্ট্রীক্ট বাঙ্গালাটি এত সুন্দর এবং স্থানটি এতই হৃদয়মুগ্ধকর যে, আমার ইচ্ছা হইল, এখানে তোমাকে লইয়া যদি

কিছুদিন থাকিতে পারি! আমি একখানা জালিবোটে নর্ম্মদার গর্ভে বেড়াইতে লাগিলাম। আমি ইহার কি বর্ণনা করিব? অমল-ধবল হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং উভয়বর্ণের সংমিশ্রিত নানা বর্ণের, মর্ম্মরশৈলশ্রেণী উভয় পার্শ্বে সরলভাবে মধ্যাহ্ন রবিকরে কি মহিমাপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পদতলে ঘুরিয়া ফিরিয়া নীলতরল অমৃতখণ্ডের মত নর্ম্মদার গর্ভস্থ সরসী শোভা পাইতেছে। তাহার উভয় পার্শ্বে নানা-বর্ণের মর্ম্মর প্রাচীরের ছায়া সেই নীল দর্পণে প্রতিভাত হইয়া নানা বর্ণের মেঘমালায় খচিত একখণ্ড আকাশের মত শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে মর্ম্মর গর্ভে কি সুন্দর সুন্দর কক্ষই নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। কক্ষপ্রাচীরের শ্বেত মর্ম্মরের কক্ষতল নর্ম্মদা সলিলে নীল-মণিময়। স্থানে স্থানে মর্ম্মরখণ্ড নর্ম্মদার স্রোত অবরোধ করিতে চাহিতেছে, যেন গিরি হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। আবার স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড বিচ্ছিন্ন মর্ম্মর নদীগর্ভে ভাসমান। ঠিক যেন বিচিত্র প্রকৃতি বিচিত্র বেদী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই সলিলখণ্ডে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়াছিলাম। আমার বোধ হইল, আমি যেন একটি অপ্সরাপুরীর স্বপ্ন দেখিতেছি। সেখানে সকলই যেন সুন্দর, কোমল, তরল। সেখানে সকলই প্রেম, সহৃদয়তা এবং মহাপ্রাণতা। আমার মনে হইল, এই সলিলখণ্ড বিন্ধ্যাচলের হৃদয়। বিন্ধ্যসুতা নর্ম্মদা দুহিতা-প্রেমামৃতে ইহা পূর্ণ করিয়া, কুলুকুলু রবে কাঁদিতে কাঁদিতে পতিগৃহে চলিয়াছেন। অদূরে জলপ্রপাতের শব্দ এখান হইতে শুনিতে কি মধুর, কি করুণ! অথবা যেন কোন সতী-সাধ্বী আকুল হৃদয়ে পতিহৃদয়ে হৃদয় ঢালিতে চলিয়াছেন। সতী যে পথে যাইতেছেন, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ সংসার-প্রস্তর রাশিও যেন নির্ম্মল, পবিত্র ও সুশীতল করিয়া যাইতেছেন। বোম্বাই নগরের পার্শ্বস্থ আরব সমুদ্রে নৌকাবিহার, সে এক দৃশ্য—তাহা মহিমাপূর্ণ, অনন্ত প্রেমের আভাসপূর্ণ। নর্ম্মদার নৌকাবিহার, সে অন্য দৃশ্য—তাহা মাধুর্য্যময়, ক্ষুদ্র বালিকার পিতৃপ্রেমের ক্ষুদ্র অথচ গভীর উচ্ছ্বাস। একটি বীর পতির বিরাট হৃদয়, অন্যটি বালিকা নবোঢ়া বধূর ক্ষুদ্র বুক!

প্রাণ ভরিয়া নর্ম্মদার এই মোহিনী শোভা সন্দর্শন করিয়া, আসিবার সময়ে পথে দুর্গাবতীর রাজধানী 'গড়া' এবং শৈলশেখরস্থিত তাঁহার আবাসস্থান 'মদন মহল' দেখিয়া আসি। দুর্গাবতীর নাম তুমি 'পলাশি'তেও পড়িয়াছ।

'তথাপি সমরে যেন রাণী দুর্গাবতী।'

ইনি পরম রূপসী গোণ্ডজাতীয়া 'বীরাঙ্গনা ছিলেন। স্বয়ং মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। স্বয়ং অশ্বারোহিণী হইয়া সম্মুখ সমরে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া ভারতবর্ষ তাঁহার কীর্ত্তিতে পূর্ণিত করিয়াছিলেন। এই দানব-দলনীর দুর্গটির একটিমাত্র অট্টালিকা এখনও বর্তমান আছে। উচ্চ শৈলশৃঙ্গের উপরে একখানি প্রকাণ্ড গোলাকৃতি পাথর। তাহার পার্শ্ব হইতে সরলভাবে প্রাচীর তুলিয়া একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পাথরের এক পার্শ্বেও একটি কক্ষ আছে। ইহা সুদ্ধ ধরিলে গৃহটি ত্রিতল। এই গৃহের দ্বিতীয় তল হইতে 'গড়া' নগরের দৃশ্য চিত্রিৎবৎ সুন্দর দেখায়। পর্ব্বতটির চতুস্পার্শ্বে স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক গড় বা ঝিল স্ফটিকখণ্ডের মত শোভা পাইতেছে। এই সকল হইতে স্থানটির নাম গড় হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গৃহটি পর্য্যন্ত এতদিন কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু সেই নিরুপমা সুন্দরী, সেই দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী বীরনারী আজ কোথায়! বিংশতি কোটি নরাধমে আজ ভারতমাতার বক্ষ গুরুতরভারে পীড়িত না করিয়া, যদি এরূপ একটি বীরনারী, একঠি দুর্গাবতী থাকিত, জননীর কি দুর্গোৎসবই হইত! হায়! হায়! দুর্গাবতীর কি চির দিনের জন্য বিজয়া হইল! আবার কি তাহার বোধন হইবে না?

জব্বলপুরে ফিরিয়া শিল্পবিদ্যালয় দেখিতে যাই। যে সকল 'ঠগেরা' ইংরাজ সাম্রাজ্যের আরম্ভে, গামছা মোড়া দিয়া সহস্র সহস্র পথিকের প্রাণ হত্যা করিয়া ডাকাতি করিত, বৃটিশ শাসনের প্রভাবে, আজ তাহারা ও তাহাদের সন্তানেরা এই জব্বলপুরে আবদ্ধ থাকিয়া, অপূর্ব্ব শিল্পকার্য্য সকল করিতেছে। এই বিদ্যালয় হইতে আমাদের তাঁবু শতরঞ্চি ইত্যাদি যাইয়া থাকে। যে হস্ত ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণসংহারক গামছা মুড়িত, আজ তাহা তাঁত বুনিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইংরাজ রাজ্যের অধিক গৌরবের কথা কি হইতে পারে? ইহার যতই দোষ থাকুক না কেন, আজ ভারতবর্ষে যে সার্দ্ধ শতবৎসরব্যাপী অভিন্ন শান্তি আসমুদ্রগিরি বিরাজ করিতেছে, ভারতমাতা ইহা কখনও উপভোগ করেন নাই। ইংরাজ সাম্রাজ্যের এই শান্তি অক্ষয় হউক!

সেই রাত্রিত্রেই এলাহাবাদ রওনা হই। পরদিন প্রাতে এখানে পঁহুছিয়া ঈশ্বরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলাম। আমার ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্ত শেষ হইল। কাল প্রাতে কলিকাতা যাইতেছি। যদি সময় পাই, তোমার স্বজাতীয়াদের সম্বন্ধে একখানি পত্র কলিকাতা হইতে লিখিব। স্থানবর্ণনায় সে সকল কথা কিছু বলিবার অবসর পাই নাই।"

কবি নবীনচন্দ্র সেনের "প্রবাসের পত্র" (ভারতের ভ্রমণ বৃত্তান্ত) ১২৯৯ সালে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কবি স্ত্রীকে লেখা এই প্রবাসের পত্রগুলিতে ভারতের তীর্থস্থান ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের কিংবদন্তী মেশানো অতীত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। উদ্ধৃত পত্রটিতে নর্মদা ভ্রমণের বর্ণনা আছে।

(শিবনাথ শাস্ত্রীর চিঠি)

সবিনয় প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন,

মহাশয়! একাদিক্রমে বাবার দুইখানি পত্র পাইয়া সমুদয় অবগত হইলাম। আপনি যে কথা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ। বাবা ও মাকে যে স্নেহান্ধ হইতে হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। আবার অপর দিকে আমি তাঁহাদের এত কষ্ট বুঝিয়াও যে তাঁহাদের অভিলাষ মত চলিতে পারিতেছি না, তাহাতে বোধ হয় আপনার ও তাঁহাদের মন হইতে অন্তরিত হইতেছি। কিন্তু আপনি তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বোঝেন, সুতরাং আমার ধর্ম্মালোচনা কেবলমাত্র কুমন্ত্রণার কিংবা বাহাদুরীর ফল না ভাবিয়া আমার সরল বিশ্বাস অথবা ধর্ম্মান্ধতার ফল বিবেচনা করিয়া আমাকে দয়া করিতে পারেন। আপনাকেও আপনার মত গুরুজনদিগকেও বিরক্ত করায় আমার বাহাদুরী অথবা স্বার্থ নাই, অথচ কার্য্যে তাহা না করিয়া পারিতেছি না। আপনার অনুরোধে ও মাতাপিতার অনুরোধে উপবীত লইযাছিলাম। কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। উপবীত লওয়ার পর উপাসনা করিতে গেলেই যেন অন্তর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল * * * উপাসনা না করিতে পারিলে বাঁচিব না অথচ উপাসনা করিতেও পারিনা। আপনি আমাকে ধর্ম্মান্ধ বলিবেন, কিন্তু আমি যাহা ঘটিয়া ছিল, তাহাই সরল হৃদয়ে নিবেদন করিলাম। এইমাত্র প্রার্থনা যে কপট কাল্পনিক কথামাত্র বলিয়া লইবেন না। * *

আমি দেখিলাম যে, জগদীশ্বর আমাকে দুইদিকে থাকিতে দিলেন না, অতএব আমি বিনয়ে বলিতেছি, ঈশ্বরের মুখ চাহিয়াই ভাসিলাম। * *

আপনার মত মাতুলের হৃদয় হইতে যাওয়া, পিতামাতার অসহ্য কষ্ট দেখা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতগণের ঘৃণার আস্পদ হওয়া এসকল ক্ষতি যে অন্তরের কোন গুরু অনুরোধে স্বীকার করিতেছি এইমাত্র বিবেচনা করিবেন। * * *

যদি চিরজীবনের মত আমাকে হৃদয় হইতে দূর করা উপযুক্ত দণ্ড বিবেচনা করেন করুন। যদি দয়া করা স্থির হয় করুন। কেবল আমার পিতামাতাকে বলিয়া পাঠান যেন তাঁহারা আবার আসিয়া উপস্থিত না হন। আর আমি অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। যাহা হউক আমি জানিয়া শুনিয়া আপনাদের সকলের কথার অবাধ্য হইলাম সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; এবং অনুগ্রহ করিয়া আর আমাকে কোন মৌখিক তর্কে লইয়া যাইবেন না * *

ইতি—

শিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

[হেমলতা দেবী প্রণীত "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত" থেকে উদ্ধৃত]

শিবনাথ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে এই চিঠি লেখেন। এই সময়েই তিনি তাঁর ভাইকেও একখানি দীর্ঘপত্র লেখেন। এই সময়েই তিনি তাঁর পিসতুতো ভাইকেও এই পত্র দু'টিতে শিবনাথের ধর্মান্তর গ্রহণের মূল প্রেরণা এবং নবধর্মে সুদৃঢ় আস্থা স্থাপনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এরপর তাঁর মন থেকে ধর্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি)

১ অক্টোবর ১৯০১

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত "ভারতমিত্র" পত্রিকায় 'অশ্রুমতী'র যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহা আমি পাঠ করিলাম এবং তদ্বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা নিম্নে লিখিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া ইহার অনুবাদ কিম্বা মর্ম্মার্থ "ভারত মিত্রে" প্রকাশ করিলে পরম বাধিত হইব।

মহারাণা প্রতাপসিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকি। তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার মহত্ব, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার কুলনিষ্ঠা, তাঁহার দেশভক্তি আমাদের আদর্শস্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাসীর সম্মুখে অর্পণ করাই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি স্বীকার করি, অশ্রুমতী বলিয়া প্রতাপসিংহের কোন কন্যা ছিল না। ইহা আমার কল্পনা মাত্র। আমার এই মাত্র বক্তব্য, এই নাটকে যে কল্পিত ঘটনাবলী যোজিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতাপসিংহের চরিত্র গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।

যখন প্রতাপসিংহ আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়া শক্তসিংহের নিকট শুনিলেন যে, সেলিম পাপহস্তে অশ্রুমতীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই তখন তিনি তাহার প্রাণনাশ করিতে ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু অশ্রুমতীর মনেও পাছে কোন কলঙ্ক স্পর্শ হইয়া থাকে—এই আশঙ্কায় তিনি তাকে চিরকুমারী ব্রত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ইহা অপেক্ষা অটল কর্ত্তব্য নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

আর এক কথা। যদি বলেন, রাজপুত মহিলা হইয়া অশ্রুমতী কি করিয়া একজন বিধর্ম্মী মুসলমানকে ভালবাসিল, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই ;—অশ্রুমতি অতি শিশুকালেই নিরুদ্দেশ হয় এবং বহুকাল ভীলদের নিকট থাকায় এবং তাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায় নিজের কুলধর্ম্মজ্ঞান তাহার মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, সে জানিত না, কে রাজপুত? কে মুসলমান। সেলিম তাহাকে দস্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রতি প্রথম কৃতজ্ঞ হয়, পরে সেই কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হয়। ইহা তাহার পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক নহে। এবং কিঅবস্থায় পড়িয়া অশ্রুমতী রাজপুত মহিলার অযোগ্য কাজ করিয়াছিল, তাহা যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে

অশ্রুমতীকেও দোষ দেওয়া যায় না। আর এক কথা, অশ্রুমতী সেলিমকে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল—শুধু ইহাতেই প্রতাপসিংহের কুলে কলঙ্ক আসিতে পারে না। এবং মনে মনে ভালবাসাতেও যদি কিছু কলঙ্ক হইয়া থাকে, অশ্রুমতী চিরকুমারী ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করায় প্রতাপসিংহ সে কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

এই নাটকের প্রতি লেখকের যেরূপ আন্তরিক বিদ্বেষ ও বিরাগ তাহাতে বলিতে সাহস হয় না, আর একবার যেন তিনি এই নাটকখানি ধীরভাবে পড়েন—আমার বিশ্বাস আর একবার ভাল করিয়া পড়িলে, তিনি আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন। এই নাটকে ঐতিহাসিক ভুল ও অসংলগ্ন থাকিতে পারে, কি একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা প্রতাপসিংহের উপর আমার যে শ্রদ্ধাভক্তি তাহা কাহারও অপেক্ষা কম নহে।

ভবদীয়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

[মানসী ও মর্মবাণী, ১৩৩২ অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৃতীয় মৌলিক নাটক "অশ্রুমতী" ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। দৈনিক হিন্দী পত্রিকা "ভারতমিত্রে"র সম্পাদক 'অশ্রুমতী'র বিরূপ সমালোচনা করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। তার উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই চিঠি লেখেন। 'অশ্রুমতী' নাটক নিয়ে অবাঙ্গালী বিশেষ করে রাজপুতদের মধ্যে যে কতখানি বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল তার উল্লেখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা চিঠিতে পাওয়া যায়।

(সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর চিঠি)

ব্যারাকপুর, ১৭ মার্চ
১৯২৫

প্রিয় তারকবাবু,

আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আপনি যে কারণ জানিয়েছেন, তজ্জন্য আমি আনন্দিত; যদিও সেগুলি অচল। আপনি বলেছেন যে, আপনি আপনার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নির্দ্দেশ দ্বারা পরিচালিত হবেন এবং আপনি নির্ব্বাচক মণ্ডলীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। আপনি একটি পুরাতন ও অচল নীতির পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছেন। আধুনিক কালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন বার্ক। আমি আশা করি, আপনি তাঁর বই পড়েছেন। বৃষ্টলের নির্ব্বাচকদের প্রতি এক পত্রে এই নির্দ্দেশের নীতি সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন তার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করলাম—

"নিজের যুক্তিও বিবেক অনুযায়ী সুস্পষ্ট ধারণার পরিপন্থী হলেও সদস্যকে দলের আদেশ ও নির্দ্দেশ অন্ধের ন্যায় মেনে চলতে হবে—ইহা দেশের আইনে নাই, এবং আমাদের শাসনতন্ত্রের সমগ্র পদ্ধতি ও তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটা মূলগত ভ্রান্ত ধারণা থেকেই এর উৎপত্তি।"

বহু বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আবগারী বিল সম্বন্ধে ভারত সরকারের মনোভাব থেকে এই প্রশ্নটি উঠেছিলো। তাঁরা উক্ত নির্দ্দেশের নীতি দ্বারা তাঁদের আচরণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। আপনার স্বনামধন্য পিতামহ সহ আমরা সকলে তার বিরোধিতা করেছিলাম এবং নৈতিক জয় আমাদেরই হয়েছিলো। মন্ত্রীদের বেতনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে তার ফল কি হবে, তা একবার ভেবে দেখবেন। হস্তান্তরিত বিভাগগুলি স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়ে এবং সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের উপর বাঙ্গালার যে সামান্য কর্তৃত্ব আছে, তা নষ্ট হবে। মুহূর্তের জন্যও একথা মনে করবেননা যে, ভাঙ্গার কৌশল স্বরাজের আবির্ভাবকে তরান্বিত করবে। নিশ্চিত জানবেন যে,

বৃটিশ গণতন্ত্র কেবল ধাপ্পা দ্বারা সন্ত্রস্ত হবে না, পরন্তু বর্ত্তমানে বাধাদানের পন্থা দ্বারা তাদের বিরোধিতা অধিকতর তীব্র হবে।

আশা করি, ভাল আছেন। ইতি—

আপনার

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী

[মাসিক বসুমতীর ১৩৫৮ বৈশাখ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

স্যর সুরেন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে উত্তরপাড়ার রাজা ৺পিয়ারী-মোহন মুখোপাধ্যায়, এম. এ. বি. এল. সি. এম. আই মহাশয়ের পৌত্র ও কুমার ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীতারক-নাথ মুখোপাধ্যায়, সি. আই. ই, এম. বি. ই মহাশয়ের কাছে প্রেরিত একটি চিঠিতে মন্ত্রীদের বেতনের পক্ষে ভোট দিতে অনুরোধ জানান। তারকবাবু জানান যে, এ বিষয়ে তিনি নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ করছেন। সুরেন্দ্রনাথের চিঠিটি তার উত্তরে লেখা।

(রমেশচন্দ্র দত্তের চিঠি)

বর্দ্ধমান, ১৮ জুন

বহুল সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন,

কলা পরিষদের যে সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে আপনাকে মাননীয় সভ্য বলিয়া নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব আমি করি। সকলেই আনন্দের সহিত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। আরও কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালীকে (কবি হেমবাবু, কবি নবীনবাবু, দ্বিজেন্দ্রবাবু প্রভৃতি) "মাননীয় সভ্য" করা হইয়াছে। সর্ব্বসুদ্ধ ছয়জন বাঙ্গালীকে এ সম্মানসূচক উপাধি দেওয়া

হইয়াছে। এর পূর্ব্বে চারিজন বি * * কে উহা দেওয়া হইয়াছিল—মোট দশজন।

আমাদের পরিষদের কার্য্যকলাপ বাঙ্গালাতেই করা স্থির হইয়াছে। কতকগুলি নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা আপনি যথাসময়ে পাইবেন। ত্রৈমাসিক একখানি কাগজ বাহির হইবে বাঙ্গালাতে—তাহাতে আমাদের সভার কার্য্যবিবরণী, পুস্তকের সমালোচনা এবং নূতন প্রবন্ধ আদি প্রকাশিত হইবে। বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ মাসে ঐ কাগজ প্রকাশিত হইবে।

আপনার একান্ত বশংবদ

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত

[মাসিক বসুমতী, ১৩৬১ কার্তিক সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

রমেশচন্দ্র এই চিঠিটি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন।

(রজনীকান্ত গুপ্তের চিঠি)

২ ভাদ্র, ১৩০১ সাল

সবিনয় নিবেদন,

এখন বাঙ্গালাভাষার ক্রমে উন্নতি হইতেছে, অনেক ভাল গ্রন্থাদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুল ও কলেজে যাহাতে বাঙ্গালার আলোচনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু করা এখন আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাঙ্গালার আলোচনা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। আমিও কলেজে বাঙ্গালার আলোচনা বিষয়ে একটি প্রস্তাবের উত্থাপনে সাহসী হইতেছি।

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, এ পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষার পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত হউক, অথবা উক্ত পরীক্ষায় অন্ততঃ একবেলা সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক হইতে প্রশ্ন হউক, আর একবেলা বাঙ্গালা রচনা ও অনুবাদের নিয়ম হউক।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় পাস্‌কোর্সে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হউক।

অনরকোর্সে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সহিত বাঙ্গালা রচনার নিয়ম হউক।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদ হইতে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবশ্যক হইলে, পরিষদ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনপত্র প্রেরিত হইতে পারে কিনা, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করাও কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে ও প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হইয়াছেন। যে কোন বিষয়ের সহিত বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির সম্বন্ধ আছে, তদ্বিষযক প্রস্তাব বোধ হয়, পরিষদে উপেক্ষিত হইবেনা।

অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রখানি সভ্যমহোদয়গণের বিবেচনার্থ পরিষদের আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিলে বাধিত হইব।

ইতি—বশংবদ
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত

['সাহিত্য সাধক চরিতমালা', ষষ্ঠ খণ্ড থেকে উদ্ধৃত]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সূত্রপাত থেকেই রজনীকান্ত গুপ্ত এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুলাই মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাসভবনে 'বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ এপ্রিল এই সভা পুনর্গঠিত হয় এবং এর নামকরণ হয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'। রজনীকান্ত সে সময় কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হ'ন। এবং পরের বছর (শ্রাবণ ১৩০১) যখন ত্রৈমাসিক সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশিত হয় তখন থেকে তিন বছর তিনি ঐ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন—"সাহিত্য পরিষৎ যে যে প্রধান কার্য্যে এ-পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্য্যেই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদের

পরিভাষা-সমিতি ও ব্যাকরণ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদে গ্রন্থরচনা-সমিতি স্থাপনার প্রস্তাব করেন।" পরিষদের জন্যে রজনীকান্ত কত চিন্তা করতেন এই চিঠিই তার নিদর্শন।

(উমেশচন্দ্র বটব্যালের চিঠি)

"Bengal Academy of Literature প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু এপর্য্যন্ত বাঙ্গালাতে ইহার নামকরণ হয় নাই। পদার্থটি যদি স্থায়ী হয় তাহা হইলে সভ্যগণ অবশ্য অঙ্গীকার করিবেন যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় ইহার নামকরণ করা আবশ্যক।

অস্মদেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ষষ্ঠ মাসে তাহার নামকরণ বিধেয়। আমাদের একাডেমি (কি লিখিব?—এ্যাকাডেমি—না আকাডেমি না একাডেমি না আক্কাডেমি না আক্যাডেমি—কি?) আমাদের এই সঙ্গাহীন জীবটি বিগত জুলাই মাসের ২৩এ তারিখে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ষষ্ঠ মাস বিগত প্রায়; কিন্তু আজও ইহার নামকরণের কোন উদ্যোগ লক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে যে মহোদয়গণ এই পদার্থটির জন্মদাতা তাঁহারা বঙ্গভূমিতে কি নামে ইহাকে পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন?

অতি প্রাচীনকালে, যাহাকে বৈদিক যুগ বলা যায় তখন এক এক আচার্য্যের চতুষ্পার্শে শিষ্যেরা বসিয়া শাস্ত্রানুশীলন করিতেন; চতুষ্পার্শে বসা হইত বলিয়া তাহার নামকরণ হইয়াছিল "পরিষদ"। কালে এই শব্দের অর্থ "ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিতমণ্ডলী" এইরূপ দাঁড়ায়। অবশেষে গুণ দোষ বিচারক পণ্ডিত-সভা মাত্রকেই এমন কি সভা মাত্রকেই পরিষদ বলা হইত।...গ্রীস দেশে Academy বলিলে যে অর্থ প্রকাশ পাইত অস্মদেশে পরিষদ বলিলেও একদা অনেকটা তাদৃশ্য অর্থ অভিব্যক্ত হইত। প্রস্তাবিত পদার্থটিকে কি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" বলা যাইবে?...সভ্যগণকে অনুরোধ করি তাঁহারা সমবেত-বদ্ধি বলে শ্রুতিকোমল

বিশুদ্ধ আর্য্য ভাষায় আপনাদের মিলিত অস্তিত্বের নামকরণ করিবেন ;—অপর ভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া বেড়াইতে লজ্জা বোধ হয়, কিম্বহুনা।

মালদহ শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল

['সাহিত্য সাধক চরিতমালার' অষ্টম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত]

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুলাই শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়িতে 'দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার' নামক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার কার্যবিবরণ ইংরেজিতে হ'ত বলে অনেক সভ্য তাতে আপত্তি করেন। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত রাজনারায়ণ বসুর চিঠিতে তার উল্লেখ আছে এবং রাজনারায়ণবাবু সভার কাজ বাংলায় সম্পাদন করার জন্যে সভাপতি মহাশয়কে যে পত্রটি লেখেন তাও উদ্ধৃত হয়েছে। উমেশচন্দ্র সভার ১৭শ অধিবেশনে অন্যতম সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। 'একাডেমি অব লিটারেচার'—এই নাম সম্বন্ধেও যে উমেশচন্দ্র আপত্তি জানিয়েছিলেন তার উল্লেখ উমেশচন্দ্রের চিঠিতে আছে। তাঁরই প্রস্তাবানুসারে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী একাডেমি অব লিটারেচারের প্রতিশব্দ স্বরূপ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নাম গৃহীত হয়।

(হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চিঠি)

নৈহাটী

১৯শে জুন ১৮৯৪

বিহিত বিনয়ানুয় পুরঃসরনিবেদনমেতৎ

মহাশয়, অনেকের ধারণা এই যে মহাত্মা ৺রাজা রামমোহন রায়ই বাঙ্গালা গদ্যের জন্মদাতা। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বহুতর গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, একথা সত্য হইলেও গদ্য লেখার প্রণালী যে ইহার পূর্ব্বে ছিল না,

একথা বলা যায়না। গদ্য লেখায় রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী ৺গৌরীশঙ্করও বাঙ্গালা বহুতর গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রামমোহন জন্মদাতা হইলে গৌরীশঙ্কর গদ্য লিখিতে শিখিলেন কোথায়? এই কথার উত্তর করিতে গেলেই গদ্য রচনা প্রণালী যে রামমোহনের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকেনা। গদ্য রচনার প্রাচীনত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গেলে বৈষ্ণব গ্রন্থের সহায়তা পাওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া চৈতন্য সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ পাঠ করি, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীচৈতন্যের সময় পত্রাদি প্রায়ই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইত; আমি একখানিও বাঙ্গালা পত্র খুঁজিয়া পাই নাই। মহারাজ নন্দকুমারের কারাবাস কালে লিখিত পত্রই বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীনতম গদ্য রচনা, অন্ততঃ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও গদ্য রচনা এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। নন্দকুমারের বাঙ্গালাও উর্দ্দু বহুল এবং এখনকার দলিলের ভাষার ন্যায়। নন্দকুমারের বহু পূর্ব্ব হইতেই দলিলাদি গদ্যে লিখিত হইত। বোধহয় তাহা হইতে বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা করায় নন্দকুমারের ভাষা ঐরূপ হইয়াছিল।

কিন্তু দলিল ও পত্রাদি গদ্যে লিখিত হইলেও যতক্ষণ গদ্যে লিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া না যায়, ততক্ষণ বাঙ্গালা গদ্য যে প্রাচীন ইহা কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না; এইজন্য সংস্কৃত পুস্তক অনুসন্ধানের সময় আমি বাংলা গদ্য গ্রন্থেরও অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। নিজ বাটিতে আমার পৈতৃক হস্তলিখিত পুস্তকাবলী অনুসন্ধান করিতে করিতে স্মৃতিকল্পদ্রুম নামে একখানি বাঙ্গালা লিখিত স্মৃতিগ্রন্থ প্রাপ্ত হই। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নহে, উহাতে কয়েকটি মাত্র মঞ্জরী আছে, যথা তিথিমঞ্জরী, প্রায়শ্চিত্তমঞ্জরী, শুদ্ধিমঞ্জরী ইত্যাদি। বর্ষীয়ান খুল্লতাত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম উহা তাঁহার পিসামহাশয়ের হস্তলিখিত এবং তিনি যশোহর জিলা হইতে আনীত আদর্শ দেখিয়া গ্রন্থখানির প্রতিলিপি করেন। খুল্লতাত মহাশয়ের সংস্কার, খানাকুলের বাড়ুয্যে ঠাকুরের বংশীয়গণের রচনা। একথা কতক সত্য বলিযাও বোধ হয়; কারণ বাড়ুয্যে ঠাকুর ও তাঁহার বংশীয়েরা স্মৃতির ব্যবস্থা দেওয়া যাহাতে সহজ হয়, তজ্জন্য বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া দিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীর কোন সন্তান সংস্কৃত না জানিলেও ব্যবস্থা দিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়েই বাঙ্গালা স্মৃতি-কল্পদ্রুম লেখা হয়।

খুল্লতাত মহাশয় যে সময়ের কথা উল্লেখ করিলেন সে সময়ে খানাকুলের ভট্টাচার্য্যগণ অনেকেই আমাদের বাটিতে পড়েন এবং তাঁহাদের মুখে অবগত

হইয়া একজন সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ খুড়া মহাশয়ের পিসামহাশয় যে ঐ গ্রন্থ নকল করিয়া পাণ্ডিত্য খ্যাতি লাভ করিতে চেষ্টা পাইবেন, তাহাও বিচিত্র নহে। ঐ সময়ে গৌরীশঙ্করও আমাদের বাটিতে অধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং তিনি যে এই গ্রন্থের বিষয় অবগত হইবেন, এবং এরূপ লিখিতে চেষ্টা করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? আর একখানি বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত স্মৃতিগ্রন্থ সেরপুর নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটিতে পাওয়া গিয়াছে, উহাও নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় নাই।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাটিতে স্মৃতিকল্পদ্রুম গ্রন্থ নকল হইয়াছিল, তখন আদর্শ গ্রন্থ প্রাচীন, সুতরাং উহা যে ১০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। বরং তাহারও পূর্ব্বে হওয়াই সম্ভব; কারণ নারায়ণ বাঁড়ুয্যে ঠাকুর ও তাঁহার পুত্র ইহাঁরাই গ্রন্থকার। ইহাঁরা প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী এই শতাব্দীর ১৪।১৫ বৎসর অতীত হইয়া গেলে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং বাঙ্গালা স্মৃতিকল্পদ্রুম তাহা অপেক্ষা প্রাচীন।

একান্ত বশংবদ
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

এই পত্রটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের বেদান্তের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার আগে বাংলা দেশের নানাস্থানে বাংলা গদ্য রচনার প্রয়াস সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার জন্যে বেঙ্গল লাইব্রেরীর তদানীন্তন লাইব্রেরীয়ান হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে একটি চিঠি লেখেন। তার উত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় উপারদ্ধৃত চিঠিতে মন্তব্য করেন যে, রামমোহনের পূর্বে বাংলায় স্মৃতিকল্পদ্রুম রচিত হয়েছিল।

আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রধান বাহন ছিল পদ্য। পোর্তুগীস্ পাদ্রিরা ষোল শতকের শেষ দিকে কয়েকখানি প্রশ্নোত্তরময় ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধকও ঐ ধরণের ছোট কড়চা বই লেখেন। আঠারো শতকেও

স্মৃতি, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে গদ্য অনুবাদ ও কড়চা জাতীয় বই লেখা হয়। কিন্তু ঐগুলি সাধারণের জন্যে লেখা হ'তনা। আঠারো শতকের শেষে কয়েকখানি আইনের বই-এর অনুবাদ হয়। এইভাবে বিদেশী ধর্মপ্রচারক ও শাসনকর্তাদের প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের কার্যকরী ব্যবহার সুরু হয়।

(অমৃতলাল বসুর চিঠি)

কলিকাতা,
২৫ মার্চ্চ, ১৯০৩

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু—

প্রণামান্তেনিবেদন,

কায়স্থের কুলপ্রথানুসারে শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার পূজনীয় পাঠ লিখিতে হয়, কিন্তু পাচকড়িবাবুকে আমি বরাবর স্নেহের সম্ভাষণে সম্বোধন করি। আমার প্রকৃতিই এই যে যাহাকে ভাই বলি তাহাকে ভাই মনে করি। যাঁহার দেহে মনে বা ধনে কোনরূপ আঘাত লাগিলে আমাকে কাতর হইয়া ব্যস্ত হইতে হইবে তাঁহার কোনরূপ হানি করিবার চেষ্টা করা আমার পক্ষে কতকটা নিজের অঙ্গে আঘাত করার তুল্য বলিয়া বোধ হয়। আমার চর্ম্ম নিতান্ত সূক্ষ্ম নহে। রসিকতার শ্লেষ উপভোগ করিতে আমি বিলক্ষণ সমর্থ— তাহা যদি না হইতাম সে রসময় কলা নিজের হস্তে ধারণ করিতাম না। তবে রসিকতার অর্থ গালি নহে। আর এক কথা আমার নিজের দুচারিটা গালি আমি সহ্য করিতে পারি, কিন্তু যে গালি আমার জাতি বংশ বা বিদ্যা ও ব্যবসায়কে স্পর্শ করে তাহা নীরবে উপেক্ষা করিবার অধিকার কি আমার আছে? এই বেশ্যাবাস সম্বন্ধে নিজ মত ব্যক্ত করিবার অধিকার আপনার সম্পূর্ণ আছে

তাহাতে কথা কহিবার আমি কে? কিন্তু "কাকে কাকের মাংস খাইতেছে" একথার অর্থ কি? একপক্ষে কাক যদি এস্থলে বেশ্যা অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহা হইলে অপরপক্ষে আমি কি হইলাম? বেশ্যা না বেশ্যাবৃত্তির অর্থে পরিপোষিত? রঙ্গালয়ের সম্পাদক কি জানে না যে নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা এই অভাগিনীদিগকে কিরূপ বেতন দেন? এবং তাহারা কতটা সময় নাট্যশালার কার্য্যে আটক থাকিতে বাধ্য? আপনি কি জানেন না যে উহাদের কোন প্রকাশ্য দুর্ব্বিনীত ব্যবহার যদি আমাদের কর্ণ-গোচর হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত আমরা সকল সম্পর্ক রহিত করি? তাহারাও একপ্রকার অনন্যোপায় হইয়া পর-পুরুষ সহবাসে বাস করে এবং আমরাও অন্য উপায় করিতে দিতে না পারিয়া সেটা দেখিয়াও দেখিনা, আর উপায় করিবই বা কি? একসময়ে সচ্চরিত্রা দুঃখিনী বালিকাদিগকে অভিনেত্রী করিবার চেষ্টায় ব্রাহ্মবন্ধুগণের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন তাঁহারা সাধিয়া ওরূপ অভিনেত্রী দিলেও আমি গ্রহণ করি না, দশহাজার বিশহাজারের অগ্নিপরীক্ষায় কজন শিক্ষিতবাবু টিঁকিতে পারেন যে অসহায়া স্ত্রীলোক সেই লোভের জাল এড়াইবে। সুধু তাই নয়, যাঁহারা অভিনেত্রীকুল ধ্বংস করেন তাঁহারাই আবার রাজদ্বারে সমাজ সমক্ষে এবং সংবাদপত্রস্তম্ভে বরণীয় হয়েন। মিথ্যা বলিলাম কি? তারপর অভিনেত্রীগণের নায়কগণকে বিশেষ সম্মান করার কথা—আপনি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন ষ্টার থিয়েটারে কখন একার্য্য হইয়াছে? যাঁহারা থিয়েটারের কোন সংবাদ রাখেন তাঁহারাই এসম্বন্ধে আমাদের তেজ গর্ব্ব ও দৃঢ়তার বিষয় জানেন; যদি এতটুকু আলগা দিতে স্বীকৃত হইতাম তাহা হইলে রঙ্গমঞ্চ আজ একটি অনুপমা অভিনেত্রীকে হারাতেন না। সুধু আমরা কেন, কোন ভদ্রলোক থিয়েটার যে এবিষয়ে প্রশ্রয় দেয় তাহা বিশ্বাস করিতে আমার রুচি হয় না; তবে আজকাল চারপাঁচটি নাট্যশালা ও দায়িত্বহীন সমালোচকের কল্যাণে প্লাকার্ডে নাম ছাপাইতে পারিলেই ম্যানেজার হওয়া যায় ও 'ভেট্রিনারি'* অ্যাক্টর ত ছড়াছড়ি—এই ধূমকেতুদের তিন সাত্তে একুশ খুন মাপ। আপনি জানেন না যে থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা যদি কাহাকেও সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাঁহাদের কার্য্যের কণ্টক-স্বরূপ জ্ঞান করেন, তাহারা এই নাগরবাবুর দল। আপনার কোন দুইটি উক্তিতে আমার বিশেষ ব্যথা লাগিয়াছে তাহা এক্ষণে আপনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, কি করিলে ইহার সংশোধন হয় তাহাও আপনার ন্যায় লেখকের

লেখনী কৌশলের সীমাবহির্ভূত নয়। সুতরাং সেইরূপ করিবেন। আমি কখনও কাহারও সহিত কলহ করি নাই। এই বয়সে এবং দেহমনের ভগ্ন অবস্থায় সে সাধ ত সহজে হইতেই পারে না।

প্রণত

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

[অমৃতলালের পৌত্র শ্রীপ্রীতিভূষণ বসুর সৌজন্যে]

* ইংরেজী 'ভেটার্ণ্' শব্দের অমৃতলালকৃত ব্যঙ্গরূপ।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবতঃ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'বসুমতী'র সম্পাদনা ছেড়ে অমরেন্দ্র দত্ত প্রবর্তিত "রঙ্গালয়ে" যোগ দেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,—

...এক্ষণে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে আমি যদি আমার ব্যবসাকে —সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিব, তবে অপরে কেন সম্মান করিবে? জগদীশ্বরের অপার করুণায় আমার অটল বিশ্বাস আছে, তাঁহারই কৃপায় আপনার ন্যায় সাহিত্যগগনের প্রভাকরকে সুহৃদ্‌রূপে আমার জীবনে আলোক প্রদানের জন্য লাভ করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি বিশুদ্ধ থাকিয়া ষ্টার থিয়েটারের নাম হইতে থিয়েটারী কলঙ্ক মোচন করিতে সমর্থ হই। গোঁড়ার দল বা থিয়েটারকে ঘৃণা দেখান যাঁহাদের স্বার্থের সহিত জড়িত, তাঁহারা ভিন্ন অপর সমস্ত উচ্চ সম্প্রদায়ের নিকট ষ্টার থিয়েটার এক্ষণে সাধারণ থিয়েটার অপেক্ষা সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত নাট্যশালা বলিয়া সাদরে পরিচিত হইয়াছে।...

স্নেহাভিলাষী—অমৃত

['সাহিত্য সাধক চরিতমালা' ষষ্ঠখণ্ড থেকে উদ্ধৃত]

অমৃতলাল বসু এই চিঠিটি লেখেন কালীপ্রসন্ন ঘোষকে।

(স্বর্ণকুমারী দেবীর চিঠি

সোলাপুর
শ্রাবণ, ১৮৯২

ভাই—

তুমি আমাদের 'ল' কে জান কি? তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে একবার এইরূপ চিঠি লিখিয়াছিলেন, "My dear, More next time, yours." রাগ করিও না ভাই, তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া আমারও তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিতে হইতেছে। কি লিখি? এই নীরস শুষ্ক দেশ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া উপহার দেওয়া যে কি বিষম ব্যাপার, তাহা আমার অবস্থায় না পড়িলে তুমি বুঝিবেনা। না আছে এখানে বর্ণনোপযোগী প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, না আছে প্রাসাদশিল্প নৈপুণ্য, কি লিখি বল দেখি? তুমি আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সোলাপুর কি সমুদ্রের ধারে? শুনিয়া এখানকার সকলেই হাসিলেন, আমিও ভাবিয়া দেখিতেছি কথাটা একটু হাসিবার মতই বটে! এখানে পুকুর মেলে না, তা আবার সমুদ্র! সমস্ত সোলাপুর সহরে মোট তিন চারিটি পুকুর। বোম্বে সহর হইতে সোলাপুর যদিও ট্রেণে ১০।১২ ঘণ্টার রাস্তামাত্র, কিন্তু হইলে কি হয়; ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতা ও দারজিলিংএ যে প্রভেদ ইহাদের মধ্যেও অনেকটা সেইরূপ। বোম্বাই নগরীর সে নগর শোভা, সুপ্রশস্ত পরিষ্কার রাজপথ, সুসজ্জিত বিপণি, বিচিত্র ত্রিতল চৌতল হর্ম্যাবলী, মনোহর উদ্যানবাটিকা এবং সে প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সুনীল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শ্যামল স্তর, কিছুই এখানে নাই। এখানে প্রাসাদের মধ্যে ভগ্নাবশেষ এক পুরাতন দুর্গ, একটি কাপড়ের কল, দুই তিনটি মন্দির, রোমান ক্যাথলিকদিগের দুইটি গির্জ্জা এবং পারসিদিগের একটি সমাধি মন্দির। ইহা ছাড়া বাস-বাটি সমস্তই কুটির গৃহ, ইংরাজদের বাঙ্গলা, দেশীয় ভদ্রলোকের দ্বিতল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নিকেতন, দোকান পসারিও তথৈবচ, আর গরধবদিগের ক্ষুদ্র মৃত্তিকাগৃহ যেমন সর্ব্বত্রই দেখা যায়। এই ত সোলাপুর সহর। তারপর ইহার প্রাকৃতিক চিত্র। এখানে নদী নাই, পর্ব্বত নাই, যত দূরে দৃষ্টি যায় নিম্নোন্নত শুষ্ক তৃণময় কঠিন ভূমি ধূ ধূ

করিতেছে ; সেই শুষ্ক ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে কণ্টকাকীর্ণ ছোট ছোট গাছের শুষ্ক ঝোপ, স্থানে স্থানে ঘৃতকুমারীর ক্ষুদ্র জঙ্গল, ইতস্ততঃ দূরবিক্ষিপ্ত এক একটি সঙ্গীহীন তরু, অধিকাংশই কঙ্কালবশেষ মৃতপ্রায় বাব্‌লা, মাঝে মাঝে অশ্বত্থ বট, নিম প্রভৃতি সজীব তরু আছে বটে, কিন্তু তাহা বিরল ও নিস্তেজ। কোন কোন রাজ পথের দু'ধারে কেবল অপেক্ষাকৃত সুশ্যাম তরুগণ। * * আর বারে এসময় সোলাপুর কি শ্যামল শোভা ধারণ করিয়াছিল। ক্ষেত্রের যে দিগে চাহিয়া দেখ—নবীন তৃণময়, গাছপালা সরস, সতেজ, নবপল্লবিত আকাশে মেঘালোকের বিচিত্র খেলা, এই বৃষ্টি, এই রৌদ্র, সঙ্গে সঙ্গে সুকণ্ঠ পক্ষীদের মধুর গীতিতে দিগ্‌দিগন্ত উথলিত। এবার বর্ষাতে বর্ষা নাই, তাই সোলাপুরের এই মরা দৃশ্য। তাই পাখীরা পর্যন্ত এবার গান গাহিতে ভুলিয়াছে। আমরা সকালে পেচকের ডাক শুনিয়া উঠি! তাই ভাবিতেছি কি লিখিব? বিশেষতঃ তোমার মত কবি লোককে?

বলিতে কি, মাঝে মাঝে আমার যেন মনে হয় এ সোলাপুর সে সোলাপুর নহে। না আছে বাহিরের সেই নবীন সৌন্দর্য্য—না আছে ভিতরের সেই প্রফুল্ল ভাব, পরস্পরের আত্মীয়তা সম্পর্ক। যাঁহাদের জন্য এই নির্জীব নীরস ক্ষুদ্র স্থান সর্ব্বদা আমোদপ্রমোদযুক্ত সরস সজীব থাকিত, তাঁহাদের প্রায় সকলেই অন্যস্থানে চলিয়া গিয়াছেন—সোলাপুরের যেমন এখন মুমূর্ষু অবস্থা। দেশে থাকিতে তাঁহাদিগকে একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়া তাঁহাদের অভাব বড়ই অনুভব করিতেছি; আর মনে হইতেছে, সত্যই কি এ সেই সোলাপুর? * * *। যাহা হউক ইহা সত্ত্বেও এই সোলাপুর সেই সোলাপুরই বটে। সেই বাড়ী, সেই রাস্তা, সেই জিমখানা, সেই সাক্ষাৎ প্রতিসাক্ষাতের ধূম, সেই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, সেই বৈকালিক ভ্রমণ, সেই জিম-খানার খেলাধূলা, ঘড়ির কাঁটার মত নিত্য নৈমিত্তিক জীবনযাপন প্রণালী—সকলি সেইরূপ, কেবল যদি সেই পরিচিত মুখগুলি থাকিত।

এ দেশের অভ্যর্থনা প্রথা বড়ই সুন্দর! যাঁহাকে সমাদৃত করিতে হইবে, তাঁহাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সম্ভ্রান্তদিগকে পানসুপারির নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রণ সভায় প্রায়ই নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে, আহারাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই; তাহার পর বিদায় কালে নিমন্ত্রিতগণের হস্তে আতর মর্দ্দন ও ফুলের তোড়া ও রাংতা-মণ্ডিত পান দান করিয়া, গলে ফুলহার পরাইয়া, গাত্রে

গোলাপজল বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করা হয়। যাঁহার সম্মানের জন্য প্রধানতঃ সভা আহূত, তাঁহার ফুলহার ও ফুলের তোড়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

এই চিঠিটি আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত সঙ্কলিত 'আদর্শ লিপিমালা' থেকে উদ্ধৃত। বইটি দেখার সুযোগ দেওয়ার জন্যে মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

(অশ্বিনীকুমার দত্তের চিঠি)

১

বইএর কথা না লিখিয়া আমার অনুভূতির কথা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছ। আমার কি তেমন কপাল যে তাহা লিখিতে পারি, তবে কখনও কদাচিৎ যে কিছু অনুভব না করিয়াছি তাহাই বা বলি কি প্রকারে। একদিন জেলে যখন ছিলাম আনন্দ পাইয়া পাগলের মত যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা তোমাকে পাঠাইতে আমার সঙ্কোচ নাই, উহাতে রস, মাধুর্য্য, লালিত্য কিছুই নাই, তবে মোদ্দা কথাটা আছে, সভ্য সমাজে উহা উপস্থিত করিও না, তুমি দেখিও। আমাকে ভালবাস বলিয়া তোমার কাছে মন্দ লাগিবে না। একটি গান লিখিয়াছিলাম, সে গানটি এই—

পিলু—যৎ

ইনি যখন দয়া করেন, কি যে তখন হয়ে যাই।
কারে কব সে সব কথা, শুনলে পাগল বলবে ভাই॥
চাঁদ এসে কোলে পড়ে
প্রাণে মধুনির্ঝর ঝরে
হীরা মানিক থরে থরে
হৃদয় মাঝে দেখিতে পাই।

যারে দেখি সেই মিষ্টি
সবাই করে সুধা বৃষ্টি
ঘুচে যায় তার ইষ্টিরিষ্টি
শত্তুর মিত্তির ভেদ নাই।
কি যেন পিয়ে পিয়ে
ভাবে হয় বিভোল হিয়ে
ধূলো মুঠা হাতে নিয়ে
শত শত চুমো খাই।

বাস্তবিকই বড় সুখ হয়, বড় সুখ হয়। খুব স্ফূর্ত্তিতে থাক্‌বে, আছই ত। আবার আমি তা তোমাকে বলে দেব। আশীর্ব্বাদ করি দেবভোগ্য আম লাভ করিয়া আয়ুষ্মান হও ও চিরদিন মধুমাস রসাক্রান্ত বৃক্ষবদ্‌নন্দিতোভব।

আশীর্ব্বাদ করি—

জপোজল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনম্
গতি প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণ মদনস্থাহুতিবিধিঃ।
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদৃশা
সপর্য্যা পর্য্যায়স্তব ভবতু যন্মেবিলসিতম্।

তোমার সমস্ত জল্পনা তাঁহার জপ হউক, যত গঠনাদি ক্রিয়া পূজার সময়ের মুদ্রাবিচরণরূপে প্রতিভাত হউক, তোমার গমনাগমন মাত্রেই তাঁহার প্রদক্ষিণরূপে পরিণত হউক, আহারাদি তাঁহাকে আহুতি দেওয়া হইতেছে এই জ্ঞান হউক, শয়ন যেন তাঁহার চরণে প্রণাম বলিয়া গণ্য হয়, তাহাতে আত্মনিবেদন যেন তোমার সকল সুখ এবং তোমার যাহা কিছু ক্রীড়া, চেষ্টা সকলই যেন তাঁহার পূজার ক্রম বলিয়া গৃহীত হয়।

১০ ভাদ্র, ১৩২৪

রমেশ, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি যে "শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিধায়িনীর" কার্য্যে মন দিয়াছ তাহাতে বড়ই প্রীত হইয়াছি। তুমি চেষ্টা করিলে যথেষ্ট চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারিবে। তোমার প্রতি লোকের

ভক্তি আছে: কত তুলিতে পারিয়াছ জানাইবে। ললিত এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। শরীরটা আজকাল বেজায় মন্দ বলিয়া উত্তর লিখিতে ইচ্ছা হয় না। আশা করি, শীঘ্রই লিখিব। যাহা ভাল বোধ কর তোমরাই করিবে। বাবাজী, অমন ভাল কাজ আর নাই। আমার টাকা জানুয়ারীর মাঝামাঝি পাইবে। ও টাকাটা পুকুরাদির সাহায্যের জন্য রাখাই ভাল মনে হয়।

এবার পূজায় কোন্ দিকে যাইবে? গ্রামে গ্রামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনীর জন্য ঘুরিলে ভাল হয় না? ইহাতে তোমাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আসিবে। ললিতেরও বাহির হওয়া উচিত। আছ ত ভাল? অপর অধ্যাপক বন্ধুগণ ভাল আছেন ত?

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীঅঃ

[চিঠি দু'টি শরৎচন্দ্র রায় প্রণীত 'মহাত্মা অশ্বিনীকুমার' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

অশ্বিনীকুমারের প্রথম চিঠি তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র ললিতমোহন দাসকে মহাশয় লেখা। শরৎচন্দ্র রায় এই চিঠির প্রসঙ্গে লিখেছেন—"ভক্ত অশ্বিনীকুমার কি প্রকারে তাঁহার প্রিয়তম দেবতাকে অহর্নিশ সকল কার্যের মধ্যে অনুভব করিয়া থাকেন উক্ত পত্রে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।" ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে তাঁর মনে ধর্মানুরাগ প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি স্বতস্ফূর্ত প্রেরণায় এই রকম বহু ভক্তিমূলক গান রচনা করেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় পত্রটি লেখেন ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক রমেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে। বৃদ্ধ বয়সেও অশ্বিনীকুমার বরিশালের মঙ্গলামঙ্গলের কথা না ভেবে থাকতে পারতেন না। এই সময়ে তিনি বরিশালে "শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী" সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতিকে তিনি বার্ষিক তিনশত টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেছিলেন। এবং এর জন্যে অসুস্থ শরীরেও তিনি পরিশ্রম করতে পরাঙ্মুখ হতেন না। মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যহানি হওয়ার দরুণ কিছুদিনের জন্য অন্যত্র যেতেন কিন্তু সেখান থেকেও যে তিনি এই সমিতির কাজের খোঁজ রাখতেন এই চিঠিটিই তার প্রমাণ।

(বিপিনচন্দ্র পালের চিঠি)

বাংলায় যে সন্ত্রাসবাদী নানা রকমের কাজ হচ্ছে তার মনস্তাত্ত্বিক হেতু ও কারণ হ'ল সরকারী দমন-নীতি। এই নীতির নিন্দা করা যদি অপরাধের হয়, তাহলে আমি অপরাধ স্বীকার করছি আর এর জন্যে আমাকে আদালতে অভিযুক্ত করতে গবর্ণমেণ্টকে বলছি। 'বন্দেমাতরম্' পত্রের প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা যদি অপরাধের হয়, তাহলে এ অপরাধও আমার স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু এটা প্রণিধানযোগ্য যে, যতদিন এই পত্রের সম্পাদনা ভার আমার উপর ছিল, আর যদিও আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছি যে, জাতীয় কার্য্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তবু এর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের হয়নি!

গত ৫।৬ বৎসর আমি যা লিখেছি বা যা বলেছি তার কোন কথার অদলবদল করবার নেই আমার; তা ভারতেই হোক বা বাইরেই হোক। যদি আমার সে সব মত অপরাধের হয়ে থাকে তাহলে সে জন্যে আমাকে অভিযুক্ত করা হ'ল না কেন? যে ভারতে যে কোন কথার রাজদ্রোহকর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে সেখানেও আমাকে রাজদ্রোহের জন্যে কখন গ্রেপ্তার করা হয়নি।

শুনেছি, সম্প্রতি কোন এক জজ আমার ফটো রাজদ্রোহকর বলে প্রচার নিষিদ্ধ করে রায় দিয়েছে, কিন্তু মূল মূর্ত্তিটির বিরুদ্ধে এখনো কোন রায় দেওয়া হয়নি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

['মাসিক বসুমতী', ১৩৫৭ বৈশাখ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

বিপ্লবী নেতা বিপিনচন্দ্র পালের এই চিঠিখানি "কর্ম্মযোগিন্" পত্রে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট ছাপা হয়। বিপিনচন্দ্র তখন বিলাতে। এই চিঠিতে বাংলার সন্ত্রাসবাদ দমনে সরকারী প্রচেষ্টা এবং বিপিনচন্দ্রের মনোবলের পরিচয় পাওয়া যায়।

(জগদীশচন্দ্র বসুর চিঠি)

লণ্ডন

২রা নভেম্বর, ১৯০০

বন্ধু,

তোমার দু'খানা পত্র পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আজ প্রায় দু'মাস যাবত মনের অহোরাত্র মনের ভিতর সংগ্রাম চলিতেছে। এখানে থাকিব, কি দেশে ফিরিয়া যাইব। তুমিও কি আমাকে প্রলুব্ধ করিবে?

ভাবিয়া দেখ, যদি সকলেই আমাদের বোঝা ফেলিয়া চলিয়া আসি, তবে কে ভার বহিবে?

আরও মনে করিয়া দেখ, তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট এক-প্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তারপর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহ-ধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম। আমার নিজের আশা ও দুরাশা অনেককাল পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তোমাদের স্নেহের প্রতিদান করিতে আমি অসমর্থ। আমি অনেক সময়ে একেবারে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি; কিন্তু তোমাদের জন্য আমি বিশ্রাম করিতে পারি না। তোমরা আমাকে এরূপ বাঁধিয়াছ। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীর-বসন পরিহিতা মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সে-সব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব? তুমি বুঝিবে।

সাধারণতঃ লোকের যে-সব বন্ধন থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চল-ডোর ছেদন করিতে পারি না।

আমি অনেক সময় না ভাবিয়া লিখি। অনেক সময় বিনা চেষ্টায় মনে অনেক ভাব আসে। শেষে আশ্চর্য্য হই। সে সব আমার অতীত; কে আমাকে এসব কথা শুনাইতেছেন?

আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে-সব বাধা পড়িবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিব।

গতকল্য Sir William Crookes এর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছি; তিনি লিখিয়াছেন, "I have read the most interesting

account of your researches with extreme interest. I wonder whether I could induce you to deliver a lecture on these or kindred subjects of research before the Royal Institution. If you could do so, I shall be very glad to put your name down for a Friday Evening Discourse after Easter of 1901. I have a vivid recollection of the great pleasure you gave us all on the occasion when you lectured a few years ago."

Royal Institutionএ Friday Evening Discourse দিতে পারিলে আমি অতিশয় গৌরবান্বিত হইতাম। বিশেষতঃ সে স্থানে experiment দেখাইতে পারিলে আমার সমস্ত theory বুঝাইতে পারিতাম। অনেকে এইরূপ নূতন theory দেখিয়া এখন সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেহ বলিলেন, "Why, if this goes on, we shall have to write entirely new text-books of physics." সুতরাং এখন experiment দিয়া বুঝাইলে নূতন মত প্রচারের সুবিধা হইবে। নতুবা অনেকেই বুঝিতে পারিবেনা। দুঃখের বিষয় এই যে Easterএর পূর্ব্বেই আমার ছুটি ফুরাইয়া আসিবে। ছুটি চাহিতে ইচ্ছা করে না, আর চাহিলেও পাইব কিনা সন্দেহ। এদিকে Dr. Waller, the great physiologistএর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি এখানকার প্রধান Physiological Societyতে বক্তৃতা করিতে আহুত হইয়াছি। Dr. Waller প্রথম প্রথম অতিশয় বিরোধী ছিলেন। পরিশেষে কতক কতক বুঝিতে পারিয়া অতিশয় excitedly বলেন, "It appears that your work will probably upset mine Truth is truth and I don't care—if I am proved to be in the wrong. So come and work, I will place my laboratory at your disposal. Teach me or let us work together"

আমার সম্মুখে কত কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে বলিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত কিছু করিতে পারি নাই। কল প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগিতেছে। এতদিনে অনেকের সহিত আলাপ হওয়াতে কার্য্য আরম্ভ করিবার সুবিধা হইতেছে। এখন দুই বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে অনেকটা শেষ করিতে পারিতাম। Physiological Laboratory ইত্যাদি দেশে পাইব না। আমি কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। এই সময়ে

বাধা পড়িলে পুনরায় কয়েক বৎসর পর আরম্ভ করিতে অনেক সময় নষ্ট হইবে। আর এই সময়ে লোকের interest হইয়াছে, এখন করিতে পারিলেই ভাল হইত। আমি মনে করিতেছি যে, দেশে ফিরিয়া আসিয়াই দুবৎসর ছুটি লইয়া এদেশে থাকিব। তারপর প্রতি তিন বৎসর পর এক বৎসর ছুটি লইয়া এদেশে থাকিব। যদি অপরের মুখাপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারি তাহা হইলে এইরূপে অনেকটা কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিব।

আমার যে অসুখ হইযাছিল, তাহা এখন অনেকটা ভাল হইযাছে। কিন্তু দেশে যাইবার পূর্ব্বে operation করা আবশ্যক হইবে। আমি আমার কতকগুলি paper শেষ করিয়া ডাক্তারের হস্তে জীবন অর্পণ করিব।

এখন তোমার বিষয়ে দু' একটি কথা লিখিব। তুমি যে cutting পাঠাইযাছ, তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট হই নাই। তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, তাহা আমি হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিযা দেখিও, তুমি সার্ব্বভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা লইযা কথা হইযাছিল। একজনের সহিত কথা আছে (শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন) যদি তোমার গল্প ইতিমধ্যে আসে তবে তাহা প্রকাশ করিব। Mrs. Knightকে অন্য একটি দিব। প্রথমোক্ত বন্ধুর দ্বারা লিখাইতে পারিলে অতি সুন্দর হইবে। তারপর লোকেনকে ধরিয়া translate করাইতে পার না? আমি তাহাকে অনেক অনুনয করিয়া লিখিয়াছি।

তোমার নূতন লেখা অনেকদিন যাবৎ পাঠাও নাই, পাঠাইও। আমি মনে করি তোমার কবিতা চিরকালের জন্য। তোমার লেখা আমাকে যেরূপ জলন্ত করে সেরূপ যেন অসংখ্য লোককে করিতে পারে।

তোমার জগদীশ

বন্ধুজায়া এবং তোমার পুত্রকন্যাকে আমার সম্ভাষণ জানাইও।

[প্রবাসী ১৩৩৩ আষাঢ় সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রের উত্তরে তাঁকে লেখেন—"যেমন করিয়া হোক তোমার কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্ম্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয সে ভার আমি লইব।" (প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৩৩)

(অবলা বসুর চিঠি)

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

লা কলিন

টেরিটেট

স্নেহের শোভনা,

তোমার চিঠিখানা অনেকবার পড়িয়াছি এবং তুমি যে মেয়েদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছ তাহার জন্য আনন্দ পাইতেছি। দেশে করিবার অনেক কাজ আছে, দুঃখের বিষয় শিক্ষিতা মেয়েদের দৃষ্টি তাহার দিকে নাই। আমাদের গরীব দেশে বিদেশীয় শাসনে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে Voluntary work (স্বেচ্ছামূলক কাজ) ছাড়া সম্ভব নহে, কিন্তু ক'জনের তাহার দিকে দৃষ্টি বল? ছাত্র সঙ্ঘ, ছাত্রী সঙ্ঘ কোনটাতেই constructive programme (গঠনমূলক কার্য্যসূচী) নাই। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে ছাত্রছাত্রীরা কত করিতে পারে, দেশময় শিক্ষা বিস্তার করিতে পারে। কোথাযও তাদের এমন কোন Programme (কাজ) নাই। Picketting (পিকেটিং) প্রভৃতি কাজ ক্ষণিকের, তাতে একটা উত্তেজনাও আছে। তাতে কেহ কেহ যোগ দিযাছেন বটে কিন্তু তাহাতেও সত্যাগ্রহীদের মত প্রেরণা নাই। আমি বলছিনা যে ছেলেমেয়েরা কিছু সহ্য করছেনা, দেশ ছাড়িবার আগেই ত চামেলীর কাছ থেকে কাঁথিতে অত্যাচারের কথা শুনিযা এসেছি তারপর কাগজও পড়িয়াছি। আমাদের দেশের ছেলেমেয়ে যে এতটা সহ্য করিতে প্রস্তুত সেটা একটা দেশের মস্ত লাভ বটে, এখন সেটা জনসাধারণের মধ্যে দিতে হবে এবং সেজন্য শিক্ষা চাই— কেবল ঘৃণাতে কোন কাজ হয না। যাক্, স্কুলের কথা বলিতে গিযে অনেক কথা হ'ল—যা বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, আমাদের হাতে অতগুলি মেযে আছে, তাদের যদি আমরা তৈরি করে দিতে পারি তবে কতটা কাজ হয। মেয়েদের কোন দোষ নাই, তাদের স্বার্থপর বিলাসী হ'তে শিক্ষা দিয়াছি তাই তাহারা বড় হয়ে loyal (অনুগত) হতে শেখে নাই, অশিক্ষিত বোনের কথা মনে করেনা। কেবল জানে, পরীক্ষা পাস করিতে ও ফ্যাসান করিতে। হৃদয়ের কোন শিক্ষাই দেইনা। মিস্ সেকার খেলাধূলা ইনট্রোডিউস (প্রবর্ত্তন) করে একটা ফেয়ার প্লের (সুন্দর ব্যবস্থার) আইডিয়া (মতলব) দিয়াছেন। এখন মেয়েরা প্রফুল্লভাবে হারিতে শিখিয়াছে। কিন্তু তিনি একাকী কত

পারেন? শিক্ষয়িত্রীদের সকলের সহায়তা না পেলে কখনও মেয়েদের চরিত্র গঠন করা যায়না। শিক্ষয়িত্রীদের নিজের ক্লাশে পড়ান পর্য্যন্তই দায় তারপর আর কোন আইডিয়াল (আদর্শ) নেই। এসব বিষয়ে গিয়া তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

মণ্টেশরি ক্লাসে আমরা হাতের কাজ ইনট্রোডিউস (প্রবর্ত্তন) করিতে পারি কি? তাহা হইলে আমি যাবার পর বাগানের পূব দিকের রান্নাঘরের কাছের কোণাটাতে যদি ছেলেমেয়েরা বাড়িঘর তৈয়ার করে ও তাতে রং দেয় ও সাজায় ত কেমন হয়? অবিশ্যি বড় মেয়েরা অর্থাৎ ওর মধ্যে যারা বড় —একটা জলপ্রপাত ও তাতে কল ঘুরছে এক কোণে তাও করতে পারে অর্থাৎ হাতে কলমে একটা জিনিষ গড়িয়া তোলা কি ওদের পক্ষে 'টু মাচ' (খুব বেশি) হয়? চাক লিখেছে ওরা বেশ স্বদেশী গান শিখেছে। ওদের কি গজল শেখান হয়? আমার দেশে গিয়ে এই ক্লাসটার জন্যে ছাত্রছাত্রী খুঁজতে হবে। আরও ৫০টা না হলে স্কুল রাখতে পারবোনা। অথচ স্কুল অর্থাৎ মণ্টেশরি ক্লাস আমি কিছুতে ছাড়বোনা। এতদিন পর আমার মনোমত শিক্ষা হচ্ছে। আগে স্কুলে গিয়ে ইনফ্যাণ্ট ক্লাসগুলি (শিশুশ্রেণী) দেখতে কান্না পেত। তুমিও ত নিজে এসে দেখেছ। * *

শুভার্থিনী অবলা বসু

[মাসিক বসুমতী, ১৩৬১ আষাঢ় সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

এই চিঠিটি জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিনী লেডী অবলা বসু জননায়ক বিপিন চন্দ্র পালের কন্যা শ্রীমতী শোভনা দেবীকে লেখেন।

এই চিঠিতে বিশ শতকের গোড়ার দিকের শিক্ষিতা নারী সমাজের অবস্থা এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে লেখিকা তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই মহীয়সী মহিলা যে নীরবে সমাজ উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় দিকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এই পত্রটি থেকে তা হৃদয়ঙ্গম হয়।

(গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর চিঠি)

১

পরমপূজ্য প্রণয়-পবিত্র প্রাণবল্লভ
শ্রীযুক্ত··· ···

স্বধর্ম্মপরিপালকেষু,

হৃদয়বল্লভ,

ত্বদীয় বদনরূপ নবঘন দর্শনে এ অধিনীর হৃদয় চাতকিনী সাতিশয় দর্শনপিপাসু হইয়া এই নিদাঘকালে 'বারিদ' 'বারিদ' রবে ত্বদীয় আগমন বারি যাচ্ঞা করিতেছে। হে মহোদয়! অনুকম্পা পুরসরঃ আশ্রিতা চাতকীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। হে কান্ত! তব অদর্শনে এই সুখকর ভুবনে ভূরি ভূরি সৌন্দর্য্য স্বদর্শনে কিছুতেই মদীয় চিত্ত শান্ত হইতেছে না। কোনখানে পৌর্ণমাসীতে পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে চকোর-চকোরী সুধাময় কিরণে আনন্দাভিষিক্ত হইয়া গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইতেছে; কোথাও বা কুমুদিনী-সঙ্গিনী স্বীয় বল্লভাগমন দেখিয়া বায়ু-প্রবাহচ্ছলে মন্দ মন্দ নৃত্য করিতেছে; কোথাও বা ব্রততীপুঞ্জের শ্যামলবর্ণ পল্লবে চন্দ্ররশ্মি পতন হওয়াতে মনোহর সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে। হে কান্ত! এবম্বিধ শোভাতেও একমাত্র ত্বদীয় বিরহ কিছুতেই মদীয় মনোরঞ্জন করিতেছে না। যেমন নভোমণ্ডল অসংখ্য তারকামালায় আবৃত থাকিলেও একমাত্র চন্দ্র বিরহে রমণীয় হয় না। হে কান্ত! আমার তৎপ্রায় একমাত্র ত্বদীয় বিরহে কিছুতেই সুখোৎপত্তি হইতেছে না। অতএব এ অধিনীর আবাস-গগনে উদয় হইয়া সকল সুখ সফল করিতে অগ্রসর হউন।

সতত দর্শনাভিলাষী
শ্রীমতী······

কলিকাতা
বহুবাজার
২০ শে শ্রাবণ ১২৭৭

পরমপূজ্য প্রণয-পবিত্র প্রাণবল্লভ

শ্রীনন্দ··· ···

স্বধর্ম্ম পরিপালকেষু,

প্রাণেশ্বর !

অদ্য তিন দিবস হইল আপনার বদন-শশধর অদর্শনে এ অবলার হৃদয়-গগন ঘোর চিন্তা-তিমিরাবৃত রহিয়াছে। মঙ্গল সমাচার দানে চিন্তাতিমির দূরীকৃত করিবেন।

প্রিয়তম! তিন দিবস আপনার কোন সমাচার না পাইয়া কাননদগ্ধা কুরঙ্গিণীর ন্যায় আছি, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিনা এবং আপনার নিকট অধিক লোক থাকে এজন্য পরিচারিকারাও আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারেনা। তবে আমি আর কি প্রকারে সমাচার পাইতে পারি? এজন্য আমাকে নিষ্ঠুরা বিবেচনা করিবেন না।

গত দ্বিরজনী ওহে দিনমণি
না পেয়ে তব সংবাদ।
হায় মোর মন, ভাবে সর্ব্বক্ষণ
ঘটিল একি প্রমাদ॥
হয়ে কুলনারী, সরমেতে মরি,
জিজ্ঞাসিতে নারি কারে।
ওহে প্রাণপতি তবে কিসে সতী
সমাচার পেতে পারে
যাহা হউক ভাই, এই ভিক্ষা চাই,
ঈশ্বর সদনে আমি।
থাক যেই খানে রেখ মোরে মনে
কুশলে থাকহ তুমি॥

তদানুগতা

শ্রীমতী ····

কলিকাতা

বহুবাজার

১৫ই কার্ত্তিক, ১২৭৭।

গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর স্বামীকে লেখা চিঠি দু'খানি লেখিকার 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' নামক পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত। এই পুস্তিকায় তাঁর স্বামীকে লেখা চারখানি চিঠি এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে লেখা একখানি চিঠি আছে। ১২৭৮ সালে মহেন্দ্রনাথ সোম কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হয়। ডাক্তার সরকারকে লেখা চিঠিখানি ১৩২৩ সারের 'মানসী ও মর্মবাণী'র কার্তিক সংখ্যায় আবার মুদ্রিত হয়। কিন্তু পত্রাবলীর অন্তর্ভুক্ত চিঠির সঙ্গে তার হুবহু মিল নেই। স্থানবিশেষে কিছু কিছু পাঠান্তর দেখা যায়। পুস্তিকাটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এক কপি বই আছে। আমার বন্ধু, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে চিঠিগুলির প্রতিলিপি পাওয়া গেছে।

গিরীন্দ্র মোহিনীর চিঠির প্রশস্তি এবং ভাষা প্রাচীন পত্ররচনার রীতি-সম্মত। তাছাড়া এই পত্রগুলিতে তাঁর স্বভাব সুলভ কবিত্বশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

(ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের চিঠি)

"আমি গতবার লিখিয়াছি যে পাঞ্জাবে এখানের চেয়ে শীতের প্রকোপ অধিক। তিন চারি দিন থেকে আর তাহা বলা চলে না। একেবারে হাড়-ভাঙ্গা শীত পড়েছে। গত সপ্তাহে দু'তিন দিন বৃষ্টি হয়। সেইজন্যে নদী উপচে উঠায় তটস্থ মাঠগুলি জলময় হয়েছিল। শীতের চোটে মাঠের জল সব জমে বরফ হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারধবল ভূমিখণ্ড সূর্য-কিরণে রঞ্জিত হয়ে অপ্সরাদের নর্তনপ্রাঙ্গণের মত দেখাইতেছে। যথার্থই এখানে নৃত্য হয়। চক্রবিশিষ্ট কাষ্ঠ বা লৌহপাদুকার সাহায্যে নরনারী ওই বরফের উপর দিয়া রথের মতো ঘর্ঘর শব্দে অতি বেগে ছুটিয়া বেড়ায় বা ঘুরপাক খায়। নদী দু'টি প্রায় জমে এসেছে, আর দু'এক দিন এই রকম ঠাণ্ডা থাকিলেই চলে পারাপার হওয়া যাবে। কাল সন্ধ্যার সময়

নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বরফের বড় বড় থান নিয়ে নদীর মাঝখানে ছুড়িয়া ফেলিলাম। সব চূরমার হয়ে গেল। কেননা মাঝখানেও জল পাথরের মতো জমে গেছে। আমার খুব ফুর্তি। শীত বেশ মিঠে কড়া লাগিল। আর আমি একেশ্বর রাজার মতো বিহার করিতে করিতে আনন্দে ডুবে গেলাম; একেশ্বর, ঠাণ্ডায় লোকজন অতি অল্পই সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে বেড়াতে এসেছিল। ইংরেজরা ভারি শীতকাতুরে। মদ খায় মাংস খায়—তবু হি-হি-হি করে; আর আগুনের কাছে বসিতে পারিলে বাঁচে। আমার শীতসহিষ্ণুতা দেখে এরা বিস্মিত হয়। গতকল্য দু'জন ইংরেজ থিয়োসফিস্টের সঙ্গে খুব আলাপ পরিচয় হ'ল। আমায় শীতে কাবু করতে পারে না দেখে একজন আভাস দিল যে, আমার বোধহয় যোগবল আছে। আমি যদি কথাটাতে সায় দিয়ে একটু গম্ভীরভাবে যোগমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতাম তাহ'লে খাতিরটা বোধ হয় একটু জমিত। অমনিতেই যথেষ্ট হয়েছিল, তাই আর ভান করিবার প্রয়োজন ছিল না।

গেল সোমবার এখানকার একজন অধ্যাপক আমায় গাড়ী করে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মাথায় জরিদার টুপি ও গায়ে পীত বর্ণের বনাত ছিল। রাস্তায় বড় বাহার হয়েছিল—লোকে হাঁ করে দেখিতে লাগিল। গোটাকতক ছোঁড়া হো হো করে হেসেও উঠিল। আর আমি ফর ফর করে ইংরেজী কথা কহিতেছি দেখে মেমসাহেবরা অবাক। এইরূপ ধবল শ্যাম-যুগল মূর্তি—অশ্বযানে অতি দ্রুতবেগে চলিলাম। দেড় ক্রোশ দূরে লিট্‌ল-নোর নামক এক গ্রামে আমরা উপনীত হইলাম। এই গ্রাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে চিরকালই প্রসিদ্ধ থাকিবে। এখানে স্বর্গীয় নিউম্যান বাস করিতেন। ইনি একজন ধর্মবীর। ইংলণ্ডে ধর্মসম্বন্ধীর চিন্তার গতি বিশ্বাস ও ভক্তির দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। যে গৃহে তিনি বাস করিতেন সেই গৃহে আমরা গেলাম। সেখানে এখন আর একজন অধ্যাপক বাস করেন। ভিতরে গিয়া দেখি যে, মল্লিখিত এক ইংরেজী প্রবন্ধ মেঝেয় খোলা রহিয়াছে ও পাতায় পাতায় পেন্সিলের আলোচনা ঘন-সন্নিবিষ্ট। অধ্যাপক আসিয়া উভয়কে সম্ভাষণ করিয়া, আমার সহিত মায়াবাদ সম্বন্ধে আলাপ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমার তখন বেড়াবার সখ চেপেছে। আমি তাঁকে আর একদিন আসিবার অঙ্গীকার করিয়া বিদায় লইলাম, প্রবন্ধে মায়ার বিষয়ই লেখা ছিল। মায়া কথাটা শুনিলে ইংরেজ স্তম্ভিত ও চমকিত হয়। আমরা দীন-হীন জাতি

—আমাদের বাঁচা-মরা শালগ্রামের শোয়া বসার মতন দুই সমান। জগতকে মায়াময় মিথ্যা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি। কিন্তু ইংরেজের ঐশ্বর্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তাই জগৎ মিথ্যা—ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা মনে হয়। অনেক মারপ্যাচ করে বুঝাতে হয়। সহজে তারা ঘাড় পাতে না কিন্তু অবশেষে ঘাড় পাতিতেই হবে। আমাদিগকে পরাজয় ক'রে তারা সম্রাট হয়েছে। ঐ সাম্রাজ্য মায়ার ফাঁকি—আর কিছুই নয়—এই স্বীকার করে একদিন তাহাদিগকে হিন্দুস্থানের পদানত হতে হবে, ও জ্ঞানের জয় ও বলের পরাজয় ঘোষণা করিতে হবেই। ইংলণ্ডে অল্পস্বল্প বেদান্তের কথা রটেছে। কিন্তু যাঁরা রটান তাঁরা মায়ার বাঁধে এমনি আটকেছেন যে মায়াবাদে আর পঁহুছিতে পারেন না। পুরুষেরা অবিদ্যাকে সদ্বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর অবিদ্যারা পুরুষকে তুচ্ছ করিয়া মাথায় চড়িয়া বসিয়াছেন। কাজেই একটা কিম্ভূতকিমাকার গাউন-পরানো বেদান্ত দাঁড়িয়ে উঠেছে। তবে রক্ষে যে, বিলাতি-মার্কা মায়াবাদের বা মায়া সাধের প্রাদুর্ভাব অতি কম।

যাহা হউক সেই গ্রাম ছাড়িয়ে আমরা গ্রামান্তরে গেলাম। চাষাভুষা দেখে মনে ধারণা হয় যে, ইংরেজরা আমাদের মতনই মানুষ। সেই চাষ করে, মরাই বাঁধে, গরু চরায়। তবে চারি কোটি না পাঁচ কোটি লোক ধরাখানাকে সরা ক'রে তুলেছে কেমন ক'রে। ঐক্য ও পুরুষকারের জোরে। সমস্ত ইংরেজ জাতির মধ্যে একটা বাঁধন আছে—সেটা কিছুতেই ছেঁড়ে না। এত ভয়ানক দলাদলি ও রাগারাগি যে তার সিকির সিকিও আমাদের দেশে নাই। অনেকেই ত' রাজমন্ত্রীদিগকে ও গভর্ণমেণ্টকে গাল দিয়ে ভূত ভাগায়। কিন্তু বিধিপূর্বক আইন পাশ হলেই সব ঠাণ্ডা। অনেকেই প্রতিবাদ করে কিন্তু বিধি কিছুতেই লঙ্ঘন করে না। ইংরেজের নিজের জাতির উপর ভারি টান। বুয়র যুদ্ধে স্বদেশীয়ের রক্তপাত হয়েছে শুনে গভর্ণমেণ্টের শত্রুরা সব মিত্র হয়ে গেল। আর বুয়র-পরাজয়ে একপ্রাণ হয়ে উঠে পড়ে লাগলো। এই ত' গেল একতা। ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখলে বুঝা যায় যে, ইংরেজের —তা কৃষকই হউক, বা অধ্যাপকই হউক—চোখে মুখে পুরুষকার মাখানো। প্রকৃতিকে ব্যবহার-ক্ষেত্রে জয় করিতে সবাই বদ্ধপরিকর। এইরূপ প্রকৃতি জয়ে বেশ একটা নিষ্কাম ভাব আছে। যদি ইংরেজ মনে করে যে, অমুক তারিখে কোন তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ গিরিশিখরে ধ্বজা গাড়িবে—তাহা হইলে

সেই দিনে সেই দুরারোহ স্থানে কেশরি চিহ্নিত নিশান পতপত করিয়া উড়িবেই উড়িবে। উত্তর-কেন্দ্রের অপর পারে কি আছে দেখিব—প্রাণ যায় বা থাক। কত জাহাজ তুষার গর্ভে বিলীন হইল—কত লোক মরিল—তথাপি আবিষ্কার করিবার পণ ভঙ্গ হইবে না। কোন আর্থিক লাভ নেই—কেবল একটা একটা আনন্দ, জয়ের আনন্দ—ঈশ্বরত্বের আত্মতুষ্টি—এই জিগীষাকে জ্বালাইয়া রাখে। কিন্তু নিষ্কাম ভাব লোপ পাইয়া যাইতেছে। লালসার বহ্নিতে সমগ্র জাতিটা জ্বলিতেছে।

আমাদের সংস্কারকেরা ইংরেজের ঈশ্বরত্ব দেখিয়া স্বদেশকে ধিক্কার দেন ও মনে করেন যে, কি কুক্ষণে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুর প্রকৃতি জয়ের কথা বড় একটা বুঝেন না—বুঝিতে চান না।

হিন্দুর মুখ্য আদর্শ—নিবৃত্তি। প্রকৃতিকে জয় করিয়া নিষ্কাম হওয়া—ঈশ্বরত্ব সম্পন্ন হওয়া—হিন্দুর পরম সাধন। ঈশ্বর হইতে গেলে ঐশ্বর্যশালী হইতে হয়। যাহার প্রয়োজনীয় বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নাই সে ঐশ্বর্যের অধিকারী নহে। কিন্তু যিনি স্বাধিকারের প্রাচুর্য ও বাহুল্যগুণে প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়াছেন তিনিই ঈশ্বর—ঐশ্বর্যের স্বামী। রাজা নিজ ভুজ বলে মৃগয়া করিতে সমর্থ, তথাপি অস্ত্রধারী অনুচরেরা তাঁহাকে অনুসরণ করে। অনুচরের তাঁহার প্রয়োজন নাই, তাহারা কেবল বাহুল্যমাত্র। মৃগয়াপক্ষে তাহাদের থাকা না থাকা সমান কথা। রাজার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহারা ঐশ্বর্যরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে মাত্র। কিন্তু যে ভীরু বা কাপুরুষ শত বা সহস্র রক্ষী বিনা আত্মরক্ষা করিতে পারে না তাহারই অনুচরবর্গের যথার্থই প্রয়োজন আছে। অনুচরেরা তাহার যেমন দাস, সেও তদ্রূপ তাহাদিগের দাস। সে প্রয়োজনের বশগামী। অনুচরবর্গ সত্বেও ঈশ্বরত্ব তাহার নাই।

প্রকৃতিকে ব্যবহার ক্ষেত্রে জয় করিয়া তাহাকে সেবাদাসী করিয়া কি ফল যদি তাহার সঙ্গ ব্যতিরেকে শান্তি ভঙ্গ হয়? এরূপ জয় জয় নহে, কিন্তু পরাজয়—কেবল দাসানুদাসত্ব স্বীকার করা। আমি যদি বিদ্যুৎকে ধরিয়া আনিয়া আমার দৌত্য কার্যে নিযুক্ত করিতে পারি কিন্তু তাহার ক্ষিপ্র সংবাদ বহন বিনা রাত্রিতে আমার নিদ্রা না হয়, তাহা হইলে ধরিতে গিয়া কেবল ধরা পড়া হয় মাত্র। যদি কামানের গোলাবর্ষণ করিয়া নর রক্তপাত করিয়া মরুভূমির গভ হইতে স্বর্ণ আহরণ করি—আর সেই স্বর্ণ লইয়া স্বার্থের সহিত ঘোর সংঘর্ষ ঘটে—সেই কাঞ্চন লইয়া মারামারি পড়িয়া যায়—সেই হেমপ্রভা বিচ্যুত

হইলে আমার শয্যাকণ্টকী পীড়া হয় তাহা হইলে পুরুষকার আর গোলামিতে কি প্রভেদ ?

হিন্দুর প্রকৃতি-জয় ওরূপ নহে। প্রকৃতির বিবিধ উপকরণ দিয়া বাসনার নেশার মাত্রাটা চড়ানো হিন্দুর স্বভাব-সুলভ নহে। হিন্দু নিঃসঙ্গভাবে প্রকৃতির সহিত ব্যবহার করা অভ্যাস করে। হিন্দুর কাছে তিনিই নরশ্রেষ্ঠ—যিনি ভূমা অনন্ত সর্বময় একত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা রূপময় বহুত্বের মধ্যে ঈশ্বররূপে বিচরণ করেন। প্রকৃতি তাঁহার সেবা করে বটে, কিন্তু প্রকৃতির সম্বন্ধে তিনি বদ্ধ নহেন। তিনি সকল সম্ভোগ ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করিয়া আত্মাস্থিত হইয়া বিরাজ করিতে পারেন। প্রকৃতির ঐশ্বর্য তাঁহার নিকট কেবল বাহুল্য মাত্র। উহার থাকা না থাকা তাঁহার পক্ষে দুইই সমান। হিন্দু একত্বের ভিতর দিয়া বহুত্বকে দেখে—তাই সম্ভোগবিজড়িত বহুলতার প্রয়োজন তাহার চক্ষে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়। যেখানে পূর্ণ আত্মাস্থিতি সেখানে অনাত্ম-বস্তুর প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। নিষ্কাম ঈশ্বরত্বলাভ হিন্দুর আদর্শ।

আজ হিন্দু জাতি এই উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। তথাপি পূর্ব-সাধনার লক্ষণ এখনো বর্তমান। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে প্রকৃতির অতি অল্পই প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। তাহার আচার-ব্যবহার আদান-প্রদান কঠোর সংযম দ্বারা নিয়মিত। সংসারের ভোগৈশ্বর্যকে লাঞ্ছিত করিয়া যেন তাহার দৈনিক কার্যের সমাধান হয়। গৃহস্থ ছাড়িয়া নৃপতির প্রাসাদে যাও—দেখিবে ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি—মণিমুক্তা হীরা জহরৎ শালা-দোশালা কিংখাপে প্রকোষ্ঠসকল সমাকুল। সেই সকল ধনরত্ন-ভূষণ কিন্তু বাহুল্যরূপে বিরাজিত। রাজা উহাদের অধীন নহেন। সে সকল কখনো ব্যবহার করেন কখনো বা পরিহার করেন। ঐশ্বর্যের আধিক্যে প্রয়োজন পলায়ন করিয়াছে। রাজার মহিমা-বর্ধনের জন্যই মণিমানিক্যাদির কেবল প্রয়োজন—অভাব পূরণের জন্য নহে। হিন্দুর হয় সম্ভোগসামগ্রীর অল্পতা—শাদাশিদে চালচলন—নয় ত' ছড়াছড়ি বাড়াবাড়ি বাহুল্য আড়ম্বর। প্রয়োজনের সুদীর্ঘ পরম্পরার নিগড় হিন্দুকে বাঁধিয়া রাখে না।

কিন্তু য়ুরোপে ইহার বিপরীত ভাব। য়ুরোপীয় গৃহস্থের ঘরে খুঁটিনাটি সামগ্রীর আদি অন্ত নাই—সসাগরা পৃথিবী সেই ক্ষুদ্র নরদেবতাকে যেন কর প্রদান করিয়াছে। কিন্তু সেই সকল সামগ্রী গৃহস্বামীকে প্রয়োজনের রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া রাখে। যা না ব্যবহার করিলেও চলে এমন বস্তু বড় একটা দেখা যায় না। সমস্তই কাজের তালিকায় লেখা। তথায় বাহুল্যের হিসাবে পেটিকায়

পুঁজি করিবার অবসর অতি অল্পই আছে। য়ুরোপীয়ের ঘরে দেবাসুরবিজয়ী পঞ্চভূত অশেষ প্রকার রূপ ধরিয়া দাসত্ব করে বটে কিন্তু প্রবৃত্তির কোষাগার হইতে তাহাদের পাওনা-গণ্ডা সুঁদে আসলে আদায় করিয়া লইতে ছাড়েনা। প্রকৃতি যেমন ইংরাজের দাস আসলে সাহেবও তদ্রূপ প্রকৃতির দাস।

ধান ভানিতে শিবের গীত গেয়ে ফেলেছি। ঘণ্টা দুই বেরিয়ে আমরা সহরে ফিরে এলাম। গ্রামগুলি দেখে কেবল আমার মনে হতে লাগিল যে, এখানে একটা বাঙালীর আড্ডা করিলে মন্দ হয় না। ছাত্রেরা অনায়াসেই উক্ষপারে পড়িতে আসিতে পারে—কেন না বড় বড় ঘোড়ার গাড়ি সদাই যাতায়াত করিতেছে। ব্যবসায়ীরাও থাকিতে পারেন। লণ্ডন ও এখান হইতে বারমিংহাম দেড় ঘণ্টার পথ। একটি ছোট গ্রামের মতন হ'লে ইংরেজের মুখোমুখি দাঁড়ান যায়।

সে দিন একটি ছেলে নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করিতেছিল। গানের সঙ্গে সঙ্গে একর্ডিয়ন বাজাইতেছিল। বোধ হ'ল বৈষ্ণবের ছেলে যেন গান গাহিতেছে—বড় মিষ্টি সুর। আহা তার নাকে যদি একটি তিলক থাকিত তাহলে সোনায় সোহগা হ'ত। এখানে শুধু ভিক্ষা করিবার যো নাই, তবে গান গেয়ে বা বাদ্য বাজিয়ে ভিক্ষা করিতে পারা যায়। একজন অন্ধ একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে রাস্তা দিয়ে গাহিতে গাহিতে যায়, পাড়া একেবারে মাতিয়ে তুলে। ইংরাজের সুরে কেমন একটা ধুপধাপের ভাব আছে, কিন্তু এর গলাটি এমনি মোলায়েম যে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

আমার দ্বিতীয় বক্তৃতার পর তৃতীয় বক্তৃতাটি অতি বিলম্বে হইয়াছিল। সভাপতি ডাঃ কেয়ার্ডের সময় ছিল না বলিয়া তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেল। পাঁচ হপ্তা পরে আবার খুলিবে। তখন বক্তৃতা আরম্ভ করা যাবে। বারমিংহামে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছি। বক্তৃতা ১৫ই ফেব্রুয়ারি হইবে।

উক্ষপার ১৬ই জানুয়ারি

[মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' ১৩০৫, মাঘ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

(রবীন্দ্রনাথের চিঠি)

১

"ইংলণ্ডে আসবার আগে আমি নির্বোধের মতো আশা করেছিলেম যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের দুই হস্ত-পরিমিত ভূমির সর্বত্রই গ্লাডষ্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাকস্-মূলরের বেদব্যাখ্যা, টিণ্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত। সৌভাগ্য ক্রমে তাতে আমি নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলেছে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষ ভাবে কোলাহল শোনা যায়। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে থাকে, তুমি নাচে গিয়েছিলে কিনা, কনসর্ট কেমন লাগল, থিয়েটারে একজন নূতন অ্যাক্টর এসেছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যাণ্ড হবে ইত্যাদি। পুরুষেরা বলবে, আফগান যুদ্ধের বিষয় তুমি কি বিবেচনা কর, Marquis of Lorneকে লণ্ডনীয়েরা খুব সমাদর করেছিল, আজ দিন বেশ ভালো, কালকের দিন বড় মিজারেবল্ ছিল। এ-দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটারদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে। এদেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক। টেমপারেন্স মীটিং, ওয়ার্কিং মেনস্ সোসাইটি প্রভৃতি যতপ্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মধ্যে তাদের কণ্ঠ আছে। পুরুষদের মতো তাঁদের আপিসে যেতে হয় না, মেয়েদের মতো ছেলেপিলে মানুষ করতে হয় না, এদিকে হয়তো এত বয়স হয়েছে যে 'বলে' গিয়ে নাচা বা ফ্লার্ট করে সময় কাটানো সঙ্গত হয় না; তাই তাঁরা অনেক কাজ করতে পারেন, তাতে উপকারও হয়তো আছে।

এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, দরজির দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান, পদে পদে দেখতে পাই কিন্তু বইয়ের দোকান প্রায় দেখতে পাইনে। আমাদের একটা কবিতার বই কেনবার আবশ্যক হয়েছিল কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে একজন খেলনাওয়ালাকে সেই বই আনিয়ে দিতে হুকুম করতে হয়েছিল—আমি আগে জানতেম, এ-দেশে একটা কসাইয়ের দোকান যেমন প্রচুররূপে দরকারি বইয়ের দোকানও তেমনি।

ইংলণ্ডে এলে সকলের চেয়ে চোখে পড়ে লোকের ব্যস্ততা। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখতে মজা আছে—বগলে ছাতি নিয়ে হুস হুস করে চলেছে, পাশের লোকদের উপর ভ্রূক্ষেপ নেই; মুখে যেন মহা উদ্বেগ, সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। সমস্ত লণ্ডনময় রেলোয়ে। প্রতি পাঁচ মিনিটে অন্তর এক একটা ট্রেণ যাচ্ছে। লণ্ডন থেকে ব্রাইটনে আসবার সময় দেখি, প্রতি মুহূর্তে উপর দিয়ে একটা, নিচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা এমন চারিদিক থেকে হুস হাস করে ট্রেণ ছুটেছে। সে ট্রেণগুলোর চেহারা লণ্ডনের লোকদেরই মতো, এদিক থেকে ওদিক থেকে মহা ব্যস্তভাবে হাঁস ফাঁস করতে করতে চলেছে। দেশ তো এই একরত্তি, দু'পা চললেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেণ যে কেন ভেবে পাইনে। আমরা একবার লণ্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেণ মিস্ করেছিলেম, কিন্তু তার জন্যে বাড়ি ফিরে আসতে হয়নি, তার আধ ঘণ্টা পরেই আর এক ট্রেণ এসে হাজির।

এ-দেশের লোক প্রকৃতির আদুরে ছেলে নয়, কারুর নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে থাকবার জো নেই। একে তো আমাদের দেশের মতো এ-দেশের জমিতে আঁচড় কাটলেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে মারামারি করতে হয়। তাছাড়া শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপড় দরকার হয় তার ঠিক নেই—তার পরে কম খেলে এ-দেশে বাঁচবার জো নেই ; শরীরে তাপ জন্মাবার জন্যে অনেক খাওয়া চাই। এ-দেশের লোকের কাপড়, কয়লা খাওয়া অপর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে চলে না, তার উপরে আবার মদ আছে। আমাদের বাংলার খাওয়া নামমাত্র, কাপড় পরাও তাই। এদেশে যার ক্ষমতা আছে সেই মাথা তুলতে পারে, দুর্বল লোকদের এখানে রক্ষা নেই—একে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ তাতে কার্যক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি করছে।

ক্রমে ক্রমে এখানকার দুই-একজন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হতে চলল। একটা মজা দেখছি, এখানকার লোকেরা আমাকে নিতান্ত অবুঝের মতো মনে করে। একদিন Dr.—এর ভাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিলেম। একটা দোকানের সম্মুখে কতকগুলো ফটোগ্রাফ ছিল, সে আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে ফটোগ্রাফের ব্যাখ্যান আরম্ভ করে দিলে—আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, একরকম যন্ত্র দিয়ে ওই ছবিগুলো তৈরি হয়, মানুষে হাতে করে আঁকেনা। আমার চারদিকে লোক দাঁড়িয়ে গেল। একটা ঘড়ির দোকানের সামনে নিয়ে

ঘড়িটা যে খুব আশ্চর্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার চেষ্টা করতে লাগল। একটা ঈভনিং পার্টিতে মিস্—আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি এর পূর্বে পিয়ানোর শব্দ শুনেছি কিনা। এদেশের অনেক লোক হয়তো পরলোকের একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি একবিন্দুও খবর জানে। ইংলণ্ড থেকে কোনো দেশের যে কিছু তফাত আছে তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক্—সাধারণ লোকেরা কত বিষয় জানেনা তার ঠিক নেই।

[য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, দ্বিতীয়]

বিশ্বভারতীর অনুমোদন ক্রমে মুদ্রিত

১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতী'তে য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রায় বছর খানেক পরে বই আকারে ছাপা হয। পরে এই পত্র আর প্রকাশ করার ইচ্ছা কবির ছিলনা, এজন্যে বইটি বহুকাল গ্রন্থাকারে পাওয়া যেত না। বহুকাল পরে পাশ্চাত্য-ভ্রমণ (১৩৪৩ আশ্বিন) গ্রন্থে পরিবর্তিত আকারে ইহা 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি'র ২য খণ্ডের সঙ্গে আবার প্রকাশিত হয। নব পর্যাযে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে ৬নং পত্রের কিছু অংশ, ৭নং, ৯নং ও ১০নং পত্র ও সেই সঙ্গে 'ভারতী' সম্পাদকের মন্তব্য বাদ গেছে। কোন কোন পত্রের আকারও ছোট করা হযেছে।

২

শিলাইদহ

২ আষাঢ় ১২৯৯

কাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক বেশ রীতিমতো আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে। দিনের বেলাটা খুব গরম হয়ে বিকেলের দিকে ভারি ঘনঘটা মেঘ করে এল।

কাল ভাবলুম, বর্ষার প্রথম দিনটা, আজ বরঞ্চ ভেজাও ভালো তব অন্ধকূপের মধ্যে দিন যাপন করব না। জীবনে '৯৯ সাল আর দ্বিতীয়বার আসবে না—ভেবে দেখতে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে—সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তাহলেও খুব দীর্ঘজীবন বলতে হবে।

মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে, নিদেন আমার পক্ষে। আমি প্রায়ই এক এক সময়ে ভাবি, এই যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আসছে—কোনোটি সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধনীল, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সাদা ফুলের মতো প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য। এবং এর কি কম মূল্যবান। হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস্ সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু বহু কালের শত শত সুখদুঃখ-বিরহমিলনময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ। সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতিবৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে, অবশেষে এক সময় আসবে, যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদূতের দিন, ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদৃষ্টে আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। একথা ভালো করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে; ইচ্ছে করে, জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই। আমি যদি সাধু প্রকৃতির লোক হতুম তাহলে হযতো মনে করতুম, জীবন নশ্বর, অতএব প্রতিদিন বৃথা ব্যয় না করে সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। কিন্তু আমার সে প্রকৃতি নয়—তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে, এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছিনে। এই সমস্ত রঙ, এই আলো, এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক-ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারেনা—সে যেন আরও লক্ষ যোজন দূরে। রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে পড়ে যাচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়েনা। সেই বিলেত যাবার পথে লোহিত-সমুদ্রের

স্থির জলের উপরে যে একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে। কিন্তু ভাগ্যিস আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায় নি—অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কবি দেখেনি। আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে। এমন এক-একটি দিন সম্পত্তির মতো! আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতালার ছাতের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চলশিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়, এইরকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণ-খণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাতে পড়ে থাকতুম, তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেণার মতো একেবারে উপ্‌চে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত। যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এখানকার মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব, এরা কেবলি দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে, পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই জন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্ভুত। এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘ্যাটাটোপ পরিয়ে রাখেনি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায়নি সেই আশ্চর্য। স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পালকির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে! যদি বাসনা এবং সাধনা-অনুরূপ পরকাল থাকে তাহলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি। যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হ'তে অক্ষম, তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন ব'লে অবজ্ঞা করে। কিন্তু, এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে, সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।

আমি ভদ্রলোক সেজে শহরের বড় রাস্তায় আনাগোনা করছি, পরিপাটী ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথাবার্তা কয়ে জীবন মিথ্যে কাটিয়ে দিচ্ছি। আমি অন্তরে অসভ্য অভদ্র—আমার জন্যে কোথাও কি একটা ভারি সুন্দর অরাজকতা নেই? কতকগুলো খ্যাপা লোকের আনন্দমেলা নেই? কিন্তু, আমি কী এসমস্ত বকছি—কাব্যের নায়কেরা এই রকম সব কথা বলে, কন্‌ভেন্‌শ্যানালিটির উপরে তিন-চার পাতা জোড়া স্বগত উক্তি প্রয়োগ করে, আপনাকে

সমস্ত মানবসমাজের চেয়ে বড়ো মনে করে। বাস্তবিক, এসব কথা বলতে লজ্জা করে। এর মধ্যে যে সত্যটা আছে সে বহুকাল থেকে ক্রমাগত কথাচাপা পড়ে আসছে। পৃথিবীতে সবাই ভারি কথা কয়, তার মধ্যে আমি একজন অগ্রগামী। হঠাৎ এতক্ষণে সে বিষয়ে চেতনা হঁল।

পুঃ—আসল যে কথাটা বলতে গিয়েছিলুম সেটা ব'লে নিই, ভয় নেই, আবার চারপাতা জুড়বেনা—কথাটা হচ্ছে, পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। ব্যাস্।

[ছিন্নপত্র, ৫৩নং চিঠি বিশ্বভারতীর অনুমোদন-ক্রমে মুদ্রিত]

"ছিন্নপত্র" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালে। এটি প্রধানত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রের সংকলন। এর মধ্যে প্রথম চিঠিটির তারিখ-৩০ অক্টোবর, ১৮৮৫ আর শেষ চিঠির তারিখ—১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫। ১৩৪৫ সালে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' 'পথে ও পথের প্রান্তে'র সঙ্গে 'ছিন্নপত্র' "পত্রধারা" নামে প্রকাশিত হয়। কবি এই তিনখানি বই সম্বন্ধে একটি ভূমিকা লেখেন। সেটি প্রথমে 'পথে ও পথের প্রান্তে' মুদ্রিত হয়েছিল। 'ছিন্নপত্র' প্রসঙ্গে কবি সেখানে লিখেছেন—"পত্রধারার 'ছিন্নপত্র' পর্যায়ে যে চিঠির টুকরোগুলি ছাপানো হয়েছে তার অধিকাংশই আমার ভাইঝি ইন্দিরাকে লেখা চিঠির থেকে নেওয়া। তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, আমার পথচলা মনে সেই সকল গ্রাম-দৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল; তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে।" ছিন্নপত্রের বৈশিষ্ট্য কবির নিসর্গ-প্রীতি মূলক চিঠিতে। উদ্ধৃত চিঠিতে তারই সুন্দর নিদর্শন।

৩

কলিকাতা

তুমি দেরী করে আমার চিঠির উত্তর দিয়েছিলে এতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল কিন্তু রাগ করতে সাহস হয়না—কেননা আমার স্বভাবে অনেক দোষ আছে—দেরি করে উত্তর দেওয়া তার মধ্যে একটি। আমি

জানি তুমি লক্ষ্মীমেয়ে, তুমি অনেক সহ্য করতে পার; আমার কুঁড়েমি, আমার ভোলা-স্বভাব, আমার এই সাতান্ন বছর বয়সের যত রকম শৈথিল্য সব তোমাকে সহ্য করতে হবে। আমার মতো অন্যমনস্ক অকেজো মানুষের সঙ্গে ভাব রাখতে হ'লে খুব সহিষ্ণুতা থাকা চাই—চিঠির উত্তর যত পাবে তার চেয়ে বেশি চিঠি লেখবার মতো শক্তি যদি তোমার না থাকে, দেনা-পাওনা সম্বন্ধে তোমার হিসাব যদি খুব বেশি কড়াক্কড় হয় তাহলে একদিন তোমার আমার সঙ্গে হয়তো ঝগড়া হতেও পারে, এই কথা মনে করে ভয়ে ভয়ে আছি। কিন্তু একথা আমি জোর করে বলচি যে, ঝগড়া যদি কোন-দিন বাধে তার অপরাধটা আমার দিকে ঘটতে পারে কিন্তু রাগটা তোমার দিকেই হবে। আর যা হোক আমি রাগী নই। তার কারণ এ নয় যে, আমি খুব ভালোমানুষ, তার কারণ এই যে, আমার স্মরণশক্তি ভারি কম। রাগ করবার কারণ কী ঘটেচে সে আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারিনে। তুমি মনে ক'রো না কেবল পরের সম্বন্ধেই আমার এই দশা, নিজের দোষের কথা আমি আরো বেশি ভুলি। চিঠির জবাব দিতে যখন ভুলে যাই তখন মনেও থাকেনা যে ভুলে গেছি, কর্তব্য করতে ভুলি, ভুল সংশোধন করতেও ভুলেছি তাও ভুলি। এমন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব কর এবং সে বন্ধুত্ব যদি স্থায়ী রাখতে চাও তাহলে তোমাকেও অনেক ভুলতে হবে, বিশেষত চিঠির হিসাবটা।

পদ্মার ধারের হাঁসেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল কী করে জিজ্ঞাসা করেচ। বোধহয় তার কারণ এই যে, বোবার শত্রু নেই। ওরা যখন খুব দল বেঁধে চেঁচামেচি করে আমি চুপ করে শুনি, একটিও জবাব দিইনে। আমি এত বেশি শান্ত হয়ে থাকি যে, ওরা আমাকে মানুষ বলেই গণ্যই করেনা—আমাকে বোধ হয় পাখির অধম বলেই জানে—কেননা আমার দুই পা আছে বটে কিন্তু ডানা নেই। আর যাই হোক ওদের সঙ্গে আমার চিঠি পত্র চলে না—যদি চলত তাহলে আমাকেই হার মানতে হত—কেননা ওদের ডানা ভরা কলম আছে, আর ওদের সময়ের টানাটানি খুব কম।

তোমাকে-যে এত বড়ো চিঠি লিখলুম আমার ভয় হচ্ছে পাছে বিশ্বাস না কর যে আমার সময় কম। অনেক কাজ পড়ে আছে কাজ ফাঁকি দিয়েই তোমাকে চিঠি লিখচি—কাজ যদি না থাকত তাহলে কাজ ফাঁকি দেওয়াও চলত না।

বেলা অনেক হয়ে গেছে—অনেক আগে স্নান করতে যাওয়া উচিত ছিল—হাঁসেদের কথায় হঠাৎ স্নানের কথাটা মনে পড়ে গেল—তাহলে আজ চললুম। আজ রাতে বোলপুর যেতে হবে। ইতি ৬ই কার্ত্তিক, ১৩২৪।

[ভানুসিংহের পত্রাবলী, ৪ নং চিঠি,
বিশ্বভারতীর অনুমোদন ক্রমে মুদ্রিত]

ভানুসিংহের পত্রাবলীর রচনাকাল ১৩২৪ সাল থেকে ১৩৩০ সাল। চিঠিগুলি শান্তিনিকেতনের রাণু নামে একটি বালিকাকে লেখা।

৪

কলকাতায় যাই যাই করি, কিন্তু পা ওঠেনা। তার কারণ এ নয় যে এখানকার শ্রাবণের টানে আটকা পড়েছি। কারণটা কিছু সূক্ষ্ম—সাইকোলজিক্যাল।

আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল আমার মনের মধ্যে একটা সঙ্কল্পের সম্পূর্ণ ধ্যানমূর্তি জেগে উঠেছিল, ইংরেজীতে যাকে বলে vision। তখন বয়স ছিল অল্প, মনের দৃষ্টিশক্তিতে একটুও চাল্‌শে পড়েনি। জীবনের লক্ষ্যকে বড় করে সমগ্র করে স্পষ্ট করে দেখতে পাবার আনন্দ যে কতখানি তা ঠিক মতো তোমরা বুঝতে পারবে কিনা জানিনে। সে আনন্দের পরিমাণ পাবে আমার ত্যাগের পরিমাপে। আমার শিলাইদা, আমার সাহিত্য সাধনা, আমার সংসার সমস্তকেই বঞ্চিত করে আমি বেরিয়ে এসেছিলুম। আমার ঋণের বোঝা ছিল প্রকাণ্ড, কাজের অভিজ্ঞতা ছিল নাস্তি। তারপরে সুদীর্ঘকাল এই দুস্তর অধ্যবসায়ে একলা পাড়ি দিয়েছিলুম। কাউকে দোষ দিইনি, কারো উপর দায় চাপাইনি, কারো কাছে ভিক্ষে চাইনি। তারি মাঝখানে সংসারের নানা দুঃখ গেল। কিন্তু সেই সময়টাতেই মনের ভিতর মহলে যেন সব আলোই জ্বলে উঠেছিল। সেটা বুঝতে পারবে যদি ভেবে দেখো তখনকার বঙ্গদর্শনে কী লিখছি—তখনকার পার্টিশন আন্দোলনে কী দোলা লাগিয়েছি,—মনের মধ্যে ভারতবর্ষের একটা নিত্যরূপ দেখা দিচ্ছে অথচ তার সঙ্গে মানুষের বিশ্বরূপের বিরোধ নেই,—পল্লীতে পল্লীতে নিজের চেষ্টায় স্বাতন্ত্র্যের কেন্দ্র স্থাপনের কল্পনা মনের মধ্যে খেপে বেড়াচ্ছে,—

শিলাইদহে নিজেদের জমিদারির মধ্যে তার চেষ্টাও চলছে। আমার এই নানামুখী চেষ্টার মাঝখানে গভীর একটা তপস্যা ছিল—একেবারে ছিলুম সন্যাসী, সত্যের অন্বেষণে এবং সত্যকে রূপ দেবার একান্ত সাধনায়। তখন বিপদ ছিল চারিদিকে এবং দারিদ্র্য ছিল ঘরের মধ্যে। সেদিনকার ঢেউ থামল কিন্তু আমার অন্তরের মধ্যে নিয়ত কর্ম চলছেই। মনকে টানছে মানুষের দিকে—বাইরের বড়ো রাস্তায়। ডাকঘর লিখেছিলুম সেই কথাটা বলতে। দইওয়ালার হাঁক বলো আর প্রহরীর ঘণ্টা বলো কিছুই তুচ্ছ নয়—তারা বিরাট বাহিরের বাণীতেই প্রকাশ পাচ্ছে—সেই বাহির আমাকে সেদিন বলছিল আমার মধ্যে তোমার স্থান। সেই সময়েই রোজ সকালে বিকালে রাত্তিরে লিখেছি গীতাঞ্জলির গান—শারদোৎসবে ছেলেদের সঙ্গে উৎসব জমিয়েছি, এখানকার শাল-বীথিকায় জ্যোৎস্না-নিশীথে পরিপূর্ণ মন নিয়ে একলা একলা ঘুরেছি। সেদিন ছেলেরা নিশ্চয়ই আমার প্রাণোচ্ছ্বাসের অংশ পাচ্ছিল, অন্তত আমি তাদের কৈশোরের রসে অভিষিক্ত ছিলুম।

এখন শরীর ক্লিষ্ট ক্লান্ত, মনের অনেকগুলো আলো নিভে গেছে—আমার সেদিনকার পরিচয়টাকে এখানকার প্রদোষান্ধকারে ভালো করে আর খুঁজে পাইনে। আমার সেদিনকার ধ্যানরূপের প্রতিবিম্ব আমার চারিদিকে কারো মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় না। বুঝতে পারি কাছের লোকের মধ্যে আমার প্রাণের অনুপ্রাণন ঠিকমত ঘটে ওঠেনি। আমার পিতৃদেব যেমন করে আপনার জীবনের দীক্ষাকে রেখে গেছেন আমি আমার অন্তরের ধ্যানটিকে তেমন করে রেখে যেতে পারবনা। তাঁর জায়গায় ব্যবস্থা আসবে, কর্মের চাকা চলবে। একটা কারণ, আমার মনঃপ্রকৃতির বিচিত্রতা, আমি সব দিকেই যাই, সব কথাই বলি, সব ছবিই আঁকি।

অথচ ক্ষণে ক্ষণে যখন দেখি বিদেশের লোক এ জায়গাটার ভাবের ছবি দেখে গেছে, তাদের অনেকের লেখাতেই সেটা পড়লুম—তখন মনের ভিতরে একটা কান্না আসে ; এই ছবিটাকে মুছতে দিয়োনা, এর দাম আছে, তোমার যা কিছু বড়ো, যা কিছু সজীব এখনো এর মধ্যে উৎসর্গ করো।

সেই যে সেদিন আমার জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে একটি উজ্জ্বল ধ্যান নীহারিকার মাঝখানে নক্ষত্রের মতো, অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল তাকে আবার দেখতে পাই এখানে যখন একলা বসে থাকি, চারিদিকে আর কোনো কথা থাকে না কেবল থাকে আমার সেই অতীত কালের বাণী। তাকে

হারাতে, ভুলতে, ঝাপসা হোতে দিতে ইচ্ছে করে না। জীবনের সত্যযুগ মাঝে মাঝে আসে, তখন নিজেকে সত্য করে পাই, তখনকার চিন্তা এবং কর্ম একটা ধ্যানকেন্দ্রকে ভাবকেন্দ্রকে আশ্রয় করে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই সত্য যুগের সঙ্গে সঙ্গে আসে কর্মযুগ—কর্মযুগে নানা মানুষ নানা কথা তুচ্ছতায় মনের আকাশকে কেবল যে আবিল করে তা নয় উদ্যমকে ক্লান্ত করতে থাকে। আমাদের দেশের মন আধিভৌতিক, materialistic। সেই মনের ধ্যানসম্পদ নেই—আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে বড়ো খর্ব, বড়ো সঙ্কীর্ণ, বড়ো কঠিন করে দেয়। যাদের ধ্যানরূপের দৃষ্টি নেই তাদের কাছে ধ্যানরূপের মূল্য নেই। চারিদিকের এই ঔদাসীন্য থেকে এই স্থূল হস্তাবলেপ থেকে নিজের মনে উৎসাহের নবীনতাকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়। বিশেষত শরীর যখন দুর্বল।

এইজন্যেই এখান থেকে নড়তে এত অনিচ্ছা হয়। সেদিনকার বিশুদ্ধ আনন্দের স্পর্শ চুপচাপ বসে এখনো পাই—আজ বুধবার ভোরে আমার সেদিনকার আমি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল। আমার দৌর্বল্যের উপলক্ষ্য নিয়ে একে আমার একপাশে সরিয়ে ফেলতে একটুও ইচ্ছে করে না। কেননা জীবনের সত্যকে যতই ম্লান করি ততই অবসাদে নৈরাশ্যে পেয়ে বসে। সত্য যখন সজাগ থাকে কর্মের ফলাফল যাই হোক না কেন পরিতৃপ্তির অভাব ঘটে না। ইতি ৯ই শ্রাবণ ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮)

[পথে ও পথের প্রান্তে, ১৮ নং চিঠি, বিশ্বভারতীর অনুমোদন ক্রমে মুদ্রিত]

"পত্রধারা"র তৃতীয় পর্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে "পথে ও পথের প্রান্তে।"

এই পর্যায়ের চিঠি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সেবার যখন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম সেখানকার নানা দেশে আমার ডাক পড়েছিল। তখন অসুস্থদশায় রথীন্দ্রনাথ বন্দী ছিলেন বার্লিনে আরোগ্যশালায়। তাই আমার সাহচর্যের ভার পড়েছিল প্রশান্ত মহলানবিশের 'পরে, তাঁর স্ত্রী রাণী ছিলেন তাঁর সঙ্গে। * * * তাদের সাহচর্যে-গাঁথা পথযাত্রার ছিন্ন-সূত্রকে যে সব চিঠির দ্বারা জুড়তে জুড়তে চলেছিলাম দেশের দিকে, সেইগুলি ও তারই পরবর্তীকালের চিঠিগুলি পত্রধারার তৃতীয় পর্যায়ে সংকলিত হোলো।"

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, এসেছি গিয়ানয়ার রাজবাড়িতে। মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে সুনীতি রাজবাড়ির ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়ে খুব আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। খেতে বসে রাজা আমাকে বললেন একটু সংস্কৃত আওড়াতে। দু'চার রকমের শ্লোক আওড়ানো গেল। সুনীতি একটি শ্লোকের পরিচয় দিতে গিয়ে যেমনি বললেন "শার্দূলবিক্রীড়িত" অমনি রাজা সেটা উচ্চারণ করে জানালেন, তিনিও জানেন। এখানকার রাজার মুখে অত বড় একটা সংস্কৃত শব্দ শুনে আমি তো আশ্চর্য। তার পরে রাজা বলে গেলেন, শিখরিণী, স্রগ্ধরা, মালিনী, বসন্ততিলক আরও কতকগুলো নাম যা আমাদের অলংকারশাস্ত্রে কখনো পাইনি। বললেন, তাঁহাদের ভাষায় এসব ছন্দ প্রচলিত। অথচ, মন্দাক্রান্তা বা অনুষ্টুভ এঁরা জানেন না। এখানে ভারতীয় বিদ্যার এই সব ভাঙ্গাচোরা মূর্তি দেখে মনে হয় যেন ভূমিকম্প হয়ে একটা প্রাচীন মহানগরী ধ্বসে গিয়েছে, মাটির নিচে বসে গিয়েছে—সেই সব জায়গায় উঠেছে পরবর্তী কালের ঘরবাড়ি চাষ আবাদ; আবার অনেক জায়গায় সেই পুরানো কীর্তির অবশেষ উপরে জেগে, এই দুইয়ে মিলে জোড়াতাড়া দিয়ে এখানকার লোকালয়।

সেকালের ভারতবর্ষের যা-কিছু বাকি আছে তার থেকে ভারতের তখনকার কালের বিবরণ অনেকটা আন্দাজ করা যায়। এখানে হিন্দুধর্ম প্রধানতই শৈব। দুর্গা আছেন, কিন্তু কপালমালিনী লোলরসনা উলঙ্গিনী কালী নেই। কোনো দেবতার কাছে পশুবলি এরা জানে না। কিছুকাল আগে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ উপলক্ষ্যে পশুবধ হত, কিন্তু দেবীর কাছে জীবরক্ত নৈবেদ্য দেওয়া হত না। এর থেকে বোঝা যায়, তখনকার ভারতবর্ষে ব্যাধ-শবরদের উপাস্য দেবতা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করে রক্তাভিষিক্ত দেবপূজা প্রচার করেন নি।

তারপর রামায়ণ মহাভারতের যে-সকল পাঠ এদেশে প্রচলিত আমাদের দেশের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। যে যে স্থানে এদের পাঠান্তর তার সমস্তই যে অশুদ্ধ, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এখানকার রামায়ণে রাম সীতা ভাই-বোন; সেই ভাই বোনে বিবাহ হয়েছিল। একজ

ওলন্দাজ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল; তিনি বললেন, তাঁর মতে এই কাহিনীটাই প্রাচীন, পরবর্তীকাল এই কথাটাকে চাপা দিয়েছে।

এই মতটাকে যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় তাহলে রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে মস্ত কয়েকটি মিল দেখতে পাই। দুটি কাহিনীরই মূলে দুটি বিবাহ। দুটি বিবাহই আর্যরীতি অনুসারে অসঙ্গত। ভাই-বোনে বিবাহ বৌদ্ধ ইতিহাসে কোন কোন জায়গায় শোনা যায়, কিন্তু সেটা আমাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অন্যদিকে এক স্ত্রীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিবাহও তেমনি অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয় মিল হচ্ছে দুই বিবাহেরই গোড়ার অস্ত্রপরীক্ষা, অথচ সেই পরীক্ষা বিবাহযোগ্যতা প্রসঙ্গে নিরর্থক। তৃতীয় মিল হচ্ছে, দুটি কন্যাই মানবীগর্ভজাত নয়; সীতা পৃথিবীর কন্যা, হলরেখার মুখে কুড়িয়ে পাওয়া; কৃষ্ণা যজ্ঞসম্ভবা। চতুর্থ মিল হচ্ছে, উভয়েই প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন। পঞ্চম·মিল হচ্ছে, দুই কাহিনীতেই শত্রুর হাতে স্ত্রীর অবমাননা ও সেই অবমাননার প্রতিশোধ।

সেইজন্যে আমি পূর্বেই অন্যত্র এই মত প্রকাশ করেছি যে, দুটি বিবাহই রূপকমূলক। রামায়ণের রূপকটি খুবই স্পষ্ট। কৃষির হলবিদারণরেখাকে যদি কোন রূপ দিতেই হয় তবে তাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যেতে পারে। শস্যকে যদি নবদুর্বাদলশ্যাম রাম বলে কল্পনা করা যায় তবে সেই শস্যও তো পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুসারে উভয়ে ভাইবোন, আর পরস্পর পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ।

হরধনু ভঙ্গের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধনু ভঙ্গের ব্যাপার—সীতাকে গ্রহণ রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যে। আর্যাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে-অভিযান হয়েছিল সে সহজে হয়নি; তার পিছনে ঘরে-বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।

মহাভারতে খাণ্ডব বন-দহনের মধ্যেও এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের আভাস পাই। সেও বনের গাছপালা পোড়ানো নয়, সেদিন বন যে-প্রতিকূল মানবশক্তির আশ্রয় ছিল তাকে ধ্বংস করা। এর বিরুদ্ধে কেবল-যে অনার্য তা নয়, ইন্দ্র যাঁদের দেবতা তাঁরাও ছিলেন। ইন্দ্র বৃষ্টিবর্ষণে খাণ্ডবের আগুন নেবাবার চেষ্টা করেছিছেন।

মহাভারতেরও অর্থ পাওয়া যায় লক্ষ্যবেধের মধ্যে। এই শূন্যস্থিত লক্ষ্যবেধের মধ্যে এমন একটি সাধনার সংকেত আছে যে, একাগ্র সাধনার দ্বারা কৃষ্ণাকে পাওয়া যায় ; আর এই যজ্ঞসম্ভবা কৃঞা এমন একটি তত্ত্ব যাকে নিয়ে একদিন ভারতবর্ষে বিষম দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল। একে একদল স্বীকার করেছিল, একদল স্বীকার করেনি। কৃষ্ণাকে পঞ্চপাণ্ডব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কৌরবেরা তাঁকে অপমান করতে ত্রুটি করেননি। এই যুদ্ধে কুরু সেনাপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য, আর পাণ্ডববীর অর্জুনের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ। রামের অস্ত্রদীক্ষা যেমন বিশ্বামিত্রের কাছে, অর্জুনের যুদ্ধদীক্ষা তেমনি কৃষ্ণের কাছ থেকে। বিশ্বামিত্র স্বয়ং লড়াই করেন নি, কিন্তু লড়াইয়ের প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে। কৃষ্ণও স্বয়ং লড়াই করেন নি কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রবর্তন করেছিলেন তিনি ; ভগবদ্গীতাতেই এই যুদ্ধের সত্য, এই যুদ্ধের ধর্ম, ঘোষিত হয়েছে—সেই ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণ একাত্মক, যে-কৃষ্ণ কৃষ্ণার সখা, অপমানকালে কৃষ্ণা যাকে স্মরণ করেছিলেন বলে তাঁর লজ্জা রক্ষা হয়েছিল, যে-কৃষ্ণের সম্মাননার জন্যেই পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞ। রাম দীর্ঘকাল সীতাকে নিয়ে যে-বনে ভ্রমণ করেছিলেন সে ছিল অনার্যদের বন, আর কৃষ্ণাকে নিয়ে পাণ্ডবেরা ফিরেছিলেন যে-বনে সে হচ্ছে ব্রাহ্মণ ঋষিদের বন। পাণ্ডবদের সাহচর্যে এই বনে কৃষ্ণার প্রবেশ ঘটেছিল। সেখানে কৃষ্ণা তাঁর অক্ষয় অন্নপাত্র থেকে অতিথিদের অন্নদান করেছিলেন। ভারতবর্ষে একটা দ্বন্দ্ব ছিল অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের, আর একটা দ্বন্দ্ব বেদের ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণের ধর্মের। লঙ্কা ছিল অনার্যশক্তির পুরী, সেইখানে আর্যের হল জয় ; কুরুক্ষেত্র ছিল কৃষ্ণবিরোধী কৌরবের ক্ষেত্র, সেইখানে কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডব জয়ী হলেন। সব ইতিহাসেই বাইরের দিকে অন্ন নিয়ে যুদ্ধ, আর ভিতরের দিকে তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ। প্রজা বেড়ে যায়, তখন খাদ্য নিয়ে টানাটানি পড়ে, তখন নব নব ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রসারিত করতে হয়। চিত্তের প্রসার বেড়ে যায়, তখন যারা সঙ্কীর্ণ প্রথাকে আঁকড়ে থাকে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাঁধে যারা সত্যকে প্রশস্ত ও গভীরভাবে গ্রহণ করতে চায়। এক সময়ে ভারতবর্ষে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়েছিল ; একপক্ষ বেদমন্ত্রকে ব্রহ্ম বলতেন, অন্যপক্ষ ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলে জেনেছিলেন। বুদ্ধদেব যখন তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেন তার পূর্বেই ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে মতের দ্বন্দ্ব তাঁর পথ অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে।

রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে ভারতবর্ষের যে মূল ইতিহাস নানা কাহিনীতে

বিজড়িত, তাকে স্পষ্টতর করে দেখতে পাব যখন এখানকার পাঠগুলি মিলিয়ে দেখবার সুযোগ হবে। কথায় কথায় এখানকার একজনের কাছে শোনা গেল যে, দ্রোণাচার্য ভীমকে কৌশলে বধ করবার জন্যে কোনো-এক অসাধ্য কর্মে পাঠিয়েছেন। দ্রুপদ-বিদ্বেষী দ্রোণ যে পাণ্ডবদের অনুকূল ছিলেন না, তার হয়তো প্রমাণ এখানকার মহাভারতে আছে।

রামায়ণের কাহিনী সম্বন্ধে আর একটি কথা আমার মনে আসছে সেটা এখানে বলে রাখি। কৃষির ক্ষেত্র দুরকম করে নষ্ট হতে পারে, এক বাইরের দৌরাত্ম্যে, আর এক নিজের অযত্নে। যখন রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গেল তখন রামের সঙ্গে সীতার আবার মিলন হতে পেরেছিল। কিন্তু, যখন অযত্নে অনাদরে রাম সীতার বিচ্ছেদ ঘটল তখন পৃথিবীর কন্যা সীতা পৃথিবীতেই মিলিয়ে গেলেন। অযত্নে নির্বাসিতা সীতার গর্ভে যে-যমজ সন্তান জন্মেছিল তাদের নাম লব কুশ। লবের মূল ধাতুগত অর্থ ছেদন, কুশের জানাই আছে। কুশ ঘাস একবার জন্মালে ফসলের ক্ষেতকে যে কি রকম নষ্ট করে সেও জানা কথা। আমি যে-মানেটা আন্দাজ করছি সেটা যদি একেবারেই অগ্রাহ্য না হয় তাহলে লবের সঙ্গে কুশের একত্র জন্মানোর ঠিক তাৎপর্য কি হ'তে পারে, একথা আমি পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি।

অন্যদের চিঠি থেকে খবর পেয়ে থাকবে যে, এখানে আমরা প্রকাণ্ড একটা অন্ত্যেষ্টি সৎকারের অনুষ্ঠান দেখতে এসেছি। মোটের উপরে এটা কতকটা চীনেদের মতো—তারাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এইরকম ধূমধাম সাজসজ্জা বাজনাবাদ্য করে থাকে। কেবল মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির ভঙ্গিটা হিন্দুদের মতো। দাহক্রিয়াটা এরা হিন্দুদের কাছ থেকে নিয়েছে। কিন্তু, কেমন মনে হয়, ওটা যেন অন্তরের সঙ্গে নেয়নি। হিন্দুরা আত্মাকে দেহের অতীত করে দেখতে চায়, তাই মৃত্যুর পরেই পুড়িয়ে ফেলে দেহের মমতা থেকে একেবারে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে। এখানে মৃতদেহকে অনেক সময়েই বহু বৎসর ধরে রেখে দেয়। এই রেখে দেবার ইচ্ছেটা কবর দেবার ইচ্ছেরই সামিল। এদের রীতির মধ্যে এরা দেহটাকে রেখে দেওয়া আর দেহটাকে পোড়ানো, এই দুই উলটো প্রথার মধ্যে যেন রফানিষ্পত্তি করে নিয়েছে। মানুষের মনঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা স্বীকার করে নিয়ে হিন্দুধর্ম রফানিষ্পত্তিসূত্রে কত বিপরীত রকম রাজিনামা লিখে দিয়েছে তার ঠিকানা নেই। ভেদ নষ্ট

করে ফেলে হিন্দুধর্ম ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করেনি, ভেদ রক্ষা করেও সে একটা ঐক্য আনতে চেয়েছে।

কিন্তু এমন ঐক্য সহজ নয় বলেই এর মধ্যে দৃঢ় ঐক্যের শক্তি থাকেনা। বিভিন্ন বহুকে এক বলে স্বীকার করেও তার মাঝে মাঝে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তুলে দিতে হয়। একে অবিচ্ছিন্ন এক বলা যায় না, একে বলতে হয় বিভক্ত এক। ঐক্য এতে ভারগ্রস্ত হয়, ঐক্য এতে শক্তিমান হয় না। আমাদের দেশের স্বধর্মানুরাগী অনেকেই বালিদ্বীপের অধিবাসীদের আপন বলে স্বীকার করে নিতে উৎসুক হবেন, কিন্তু সেই মুহূর্তেই নিজের সমাজ থেকে ওদের দূরে ঠেকিয়ে রাখবেন। এইখানে প্রতিযোগিতায় মুসলমানের সঙ্গে আমাদের হারতেই হয়। মুসলমানে মুসলমানে এক মুহূর্তেই সম্পূর্ণ জোড় লেগে যায়, হিন্দুতে হিন্দুতে তা লাগে না। এই জন্যেই হিন্দুর ঐক্য আপন বিপুল অংশ-প্রত্যংশ নিয়ে কেবলি নড়্ নড়্ করছে। মুসলমান যেখানে আসে সেখানে সে-যে কেবলমাত্র আপন বল দেখিয়ে বা যুক্তি দেখিয়ে বা চরিত্র দেখিয়ে সেখানকার লোককে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত করে তা নয়, সে আপন সন্ততি-বিস্তার দ্বারা সজীব ও ধারাবাহিক ভাবে আপন ধর্মের বিস্তার করে। জাতির, এমন কি, পর জাতির লোকের সঙ্গে বিবাহে তার কোন বাধা নেই। এই অবাধ বিবাহের দ্বারা সে আপন সামাজিক অধিকার সর্বত্র প্রসারিত করতে পারে। কেবলমাত্র রক্তপাতের রাস্তা দিয়ে নয়, রক্তমিশ্রণের রাস্তা দিয়ে সে দূরে দূরান্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে। হিন্দু যদি তা পারত তাহলে বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম স্থায়ী বিশুদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত হতে দেরি হত না।

গিয়ানয়ার

১ আগষ্ট, ১৯২৭

[জাভাযাত্রীর পত্র, ৭নং বিশ্বভারতীর অনুমোদনক্রমে মুদ্রিত]

...ীর পত্র' থেকে উদ্ধৃত এই চিঠিটি শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে 'জাভাযাত্রীর পত্র' লেখা হয় এবং বাংলা ১৩৩৪ সালের 'বিচিত্রা'য় আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে

প্রকাশিত হয়। গ্রন্থপরিচয়ে বলা হয়েছে যে, ৫, ৬, ও ২১ সংখ্যক পত্র কেবল 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়নি।

১৯২৭-এর ১৪ই জুলাই রবীন্দ্রনাথ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা প্রমুখ অধ্যাপক ও শিল্পীগণকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাজ থেকে পূর্বদ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৩৩৬ সালে প্রকাশিত "যাত্রী" নামক গ্রন্থে "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি" ও "জাভাযাত্রীর পত্র" মুদ্রিত হয়।

৬

ব্রেমেন জাহাজ

আমাদের দেশে পলিটিকস্‌কে যারা নিছক পালোয়ানি বলে জানে সব রকম ললিত কলাকে তারা পৌরুষের বিরোধী বলে ধরে রেখেছে। এ সম্বন্ধে আমি আগেই লিখেছি। রাশিয়ার জার ছিল একদিন দশাননের মতো সম্রাট, তার সাম্রাজ্য পৃথিবীর অনেকখানিকেই অজগর সাপের মতো গিলে ফেলেছিল, লেজের পাকে যাকে সে জড়িয়েছে, তার হাড়গোড় দিয়েছে পিষে।

প্রায় বছর তেরো হোল এরই প্রতাপের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঝুটোপুটি বেঁধে গিয়েছিল। সম্রাট যখন গুষ্টিসুদ্ধ গেল সরে তখনো তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল, তাদের অস্ত্র এবং উৎসাহ জোগালে অপর সাম্রাজ্য-ভোগীরা। বুঝতেই পারছ, ব্যাপারখানা সহজ ছিল না। একদা যারা ছিল সম্রাটের উপগ্রহ ধনীর দল, চাষীদের প'রে যাদের ছিল অসীম প্রভুত্ব, তাদের সবনাশ বেঁধে গেল। লুটপাট, কাড়াকাড়ি চলল, তাদের বহুমূল্য ভোগের সামগ্রী ছারখার করবার জন্যে প্রজারা হন্যে হয়ে উঠেছে। এত বড় উচ্ছৃঙ্খল উৎপাতের সময় বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম এসেছে—আর্ট সামগ্রীকে কোনো মতে যেন নষ্ট হতে দেওয়া না হয়। ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্ররা অধ্যাপকেরা অর্ধ-অভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা-কিছু রক্ষণযোগ্য জিনিষ সমস্ত উদ্ধার করে য়ুনিভার্সিটির ম্যুজিয়মে সংগ্রহ করতে লাগল।

মনে আছে আমরা যখন চীনে গিয়েছিলুম কী দেখেছিলুম। য়ুরোপের

সাম্রাজ্যভোগীরা পিকিনের বসন্তপ্রাসাদকে কী রকম ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে, বহু যুগের অমূল্য শিল্পসামগ্রী কী রকম লুটেপুটে ছিঁড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে উড়িয়ে পুড়িয়ে। তেমন সব জিনিষ জগতে আর কোনদিন তৈরী হতেই পারবেনা।

সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্য সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার, বর্বরের মত তাকে নষ্ট হতে দেয় নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ করে এসেছে এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তা নয়, জ্ঞানের জন্যে আনন্দের জন্যে মানব-জীবনে যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে। শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়—একথা তারা বুঝেছিল এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানির চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো একথা তারা স্বীকার করেছে।

এদের বিপ্লবের সময় উপরতলার অনেক জিনিষ নীচে তলিয়ে গেছে একথা সত্য, কিন্তু টেঁকে রয়েছে এবং ভরে উঠেছে ম্যাজিয়ম থিয়েটর, লাইব্রেরী, সংগীতশালা।

আমাদের দেশের মতোই এদের গুণীর গুণপনা প্রধানত ধর্মমন্দিরেই প্রকাশ পেত। মোহন্তেরা নিজের স্থূল রুচি নিয়ে তার উপরে যেমন-খুশি হাত চালিয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত ভক্ত বাবুরা পুরীর মন্দিরকে যেমন চুনকাম করতে সংকুচিত হয়নি, তেমনি এখানকার মন্দিরের কর্তারা আপন সংস্কার অনুসারে সংস্কৃত করে প্রাচীন কীর্তিকে অবাধে আচ্ছন্ন করে দিযেছে—তার ঐতিহাসিক মূল্য যে সর্বজনের সর্বকালের পক্ষে, একথা তারা মনে করেনি, এমন কি পুরোনো পূজোর পাত্রগুলিকে নূতন করে ঢালাই করেছে। আমাদের দেশেও মঠে মন্দিরে অনেক জিনিষ আছে ইতিহাসের পক্ষে যা মূল্যবান। কিন্তু কারও তা ব্যবহার করবার জো নেই—মোহন্তেরাও অতলস্পর্শ মোহে মগ্ন—সেগুলিকে ব্যবহার করবার মতো বুদ্ধি ও বিদ্যার ধার ধারেনা। ক্ষিতিবাবুর কাছে শোনা যায় প্রাচীন অনেক পুঁথি মঠে মঠে আটক পড়ে আছে, দৈত্যপুরীতে রাজকন্যার মতো, উদ্ধার করবার উপায় নেই।

বিপ্লবীরা ধর্মমন্দিরের. সম্পত্তির বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে সমস্তকেই সাধারণের সম্পত্তি করে দিয়েছে। যেগুলি পূজার সামগ্রী সেগুলি রেখে বাকি সমস্ত

জমা করা হয়েছে ম্যুজিয়মে। একদিকে যখন আত্মবিপ্লব চলছে, যখন চার দিকে টাইফয়িডের প্রবল প্রকোপ, রেলের পথ সব উৎখাত, সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক সন্ধানীর দল গিয়েছে প্রত্যন্তপ্রদেশ সমস্ত হাৎড়িয়ে পুরাকালীন শিল্পসামগ্রী উদ্ধার করবার জন্যে। কত পুঁথি কত ছবি কত খোদকারির কাজ সংগ্রহ হল তার সীমা নেই।

এ তো গেল ধনীগৃহে বা ধর্মমন্দিরে যা-কিছু পাওয়া গেছে তারই কথা। দেশের সাধারণ চাষীদের কর্মিদের কৃত শিল্পসামগ্রী, পূর্বতন কালে যা অবজ্ঞাভাজন ছিল, তার মূল্য নিরূপণ করবার দিকে দৃষ্টি পড়েছে। শুধু ছবি নয়, লোকসাহিত্য, লোকসংগীত প্রভৃতি নিয়েও প্রবল বেগে কাজ চলেছে।

এই তো গেল সংগ্রহ, তারপরে এই-সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা। ইতিপূর্বেই তার বিবরণ লিখেছি। এত কথা যে তোমাকে লিখছি তার কারণ এই, দেশের লোককে আমি জানাতে চাই, আজ কেবলমাত্র দশ বছর আগেকার রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের বর্তমান জনসাধারণের সমতুল্যই ছিল; সোভিয়েট শাসনে এই জাতীয় লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ করে তোলবার আদর্শ কতখানি উচ্চ। এর মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা সমস্তই আছে—অর্থাৎ আমাদের দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্যে শিক্ষার যে আয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণেই সম্পূর্ণতর।

কাগজে পড়লুম, সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষ্যে হুকুম পাস হয়েছে প্রজাদের কান ম'লে শিক্ষাকর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার পড়েছে জমিদারের পরে। অর্থাৎ যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে শিক্ষার ছুতো করে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া।

শিক্ষাকর চাই বৈকি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে। কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কর কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না। সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্ণর ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন, কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই। তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেন্‌সেন নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না। পাটকলের যে সব বড়ো বড়ো বিলাতি মহাজন পাটের চাষীর রক্ত দিয়ে মোটা মুনাফার সৃষ্টি করে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনোই দায়িত্ব নেই? যে সব মিনিষ্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরা-পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন

তাদের উৎসাহের কানাকড়ি মূল্যও কি তাঁদের নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে না।

একেই বলে শিক্ষার জন্যে দরদ? আমি তো একজন জমিদার, আমার প্রজাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কিছু দিয়েও থাকি; আরও দ্বিগুণ তিনগুণ যদি দিতে হয় তো তাও দিতে রাজী আছি, কিন্তু এই কথাটা প্রতিদিন ওদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে—আমি তাদের আপন লোক, তাদের শিক্ষায় আমারই মঙ্গল; এবং আমিই তাদের দিচ্ছি, দিচ্ছেনা এই রাজ্য-শাসকদের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্নশ্রেণীর একজনও এক পয়সাও।

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণের উন্নতিবিধানের চাপ খুবই বেশি, সেজন্যে আহারেবিহারে লোক কষ্ট পাচ্ছে কম নয়, কিন্তু এই কষ্টের ভাগ উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সকলেই নিয়েছে। তেমন কষ্টকে তো কষ্ট বলব না, সে যে তপস্যা। প্রাথমিক শিক্ষার নামে কণামাত্র শিক্ষা চালিয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট এতদিন পরে দু'শো বছরের কলঙ্ক মোচন করতে চান, অথচ তার দাম দেবে তারাই যারা দাম দিতে সকলের চেয়ে অক্ষম, গভর্ণমেণ্টের প্রশ্রয়লালিত বহ্বাশী বাহন যারা তারা নয়, তারা আছে গৌরব ভোগ করবার জন্যে।

আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনো মতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দে করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে। মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে।

অনেক কথা বলবার আছে। এরকম তথ্য সংগ্রহ করে লেখা আমার অভ্যাস নয়, কিন্তু না লেখা আমার অন্যায় হবে বলে লিখতে বসেছি। রাশিয়ার শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে লিখব বলে আমার সঙ্কল্প আছে। কতবার মনে হয়েছে, আর কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিৎ। ভারতবর্ষ থেকে অনেক চর সেখানে যায়, বিপ্লব-পন্থীরাও আনাগোনা করে, কিন্তু আমার মনে হয়, কিছুর জন্য নয়, কেবল শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার।

যাক, আমার নিজের খবর দিতে উৎসাহ পাইনে। আমি যে আর্টিষ্ট এই অভিমান মনে প্রবল হবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত বাইরে খ্যাতি পেয়েছি, অন্তরে পৌছয় না। কেবলই মনে হয় দৈবগুণে পেয়েছি, নিজগুণে নয়।

ভাসছি এখন মাঝ-সমুদ্রে। পারে গিয়ে কপালে কি জানিনে। শরীর ক্লান্ত, মন অনিচ্ছুক। শূন্য ভিক্ষাপাত্রের মতো ভারী জিনিষ জগতে আর কিছুই নেই, সেটা জগন্নাথকে শেষ নিবেদন করে দিযে কবে আমি ছুটি পাব। ইতি ৫ অক্টোবর, ১৯৩০

[রাশিযার চিঠি, ৯নং ; বিশ্বভারতীর অনুমোদনক্রমে মুদ্রিত]

'রাশিয়ার চিঠি' ১৩৩৮ সালের বৈশাখে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ-ধর্মী চিঠির রচনারীতি সম্বন্ধে 'পত্র প্রসঙ্গে' আলোচনা করা হয়েছে।

(আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিঠি)

University College of Science

১৪।১২।২১

প্রিয় ভগিনী,

আমার হৃদয় এরূপ উদ্বেলিত হইয়াছে যে, আমি আমার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বোমার মামলার সময় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সেই হইতে তিনি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার অসীম বদান্যতা তাঁহার আন্তরিক স্বদেশপ্রীতি, তাঁহার উচ্চ আদর্শ ও দুর্ব্বলকে আশ্রয়দান বরাবরই আমাদের বিস্ময় ও ভক্তি উৎপাদন করিয়াছে। তাঁহার বিশিষ্ট

ব্যক্তিত্ব যে বাঙলার ও ভারতের যুবকবৃন্দের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত যাঁহাদের মত-বিরোধ আছে, তাঁহারাও তাঁহার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগে বিস্মিত না হইয়া পারেন না। তাঁহার বর্ত্তমান পরীক্ষার সময় আমার মন তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। আমি জনসাধারণ হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন আছি; সুতরাং আমার মনে হয় আমি হয়ত তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কবি বলিয়াছেন—বৈজ্ঞানিকেরা পার্থিব গৌরবকেই অধিক ভালবাসিয়া থাকে। সারা জীবন আমি আমার প্রিয় বিষয়ে নিবিষ্ট থাকাতে হয়ত আমার অন্তর্দৃষ্টি কতকটা নষ্ট হইয়াছে। আমার মানসিক শক্তিও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

প্রিয় ভগিনী, আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমার প্রিয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্য দিয়াই আমি আমার দেশের সেবা করিব। আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্যই এক। ভগবান জানেন আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আপনি বীরের মত হাসি-মুখে সমস্ত বিপৎপাত সহ্য করিতেছেন, এবং আপনি বর্ত্তমান বঙ্গ দেশের নারীজাতির নিকট এমন এক আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, যাহা রাজপুতদের সেই গৌরবের দিনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আর কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, আমাদের মাতৃভূমির ভাগ্যাকাশ যে ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই দূরীভূত হইবে এবং আপনার স্বামীও আমাদের নিকট শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

[শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় প্রণীত আচার্য্য-বাণী, ২য় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত]

(স্বামী বিবেকানন্দের চিঠি)

১

ওঁ তৎসৎ

দার্জ্জিলিং

৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭

মান্যবরাসু—

মহাশয়ার প্রেরিত 'ভারতী' পাইয়া বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিতেছি এবং যে উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যে ভবদীয়ার ন্যায় মহানুভাবাদের সাধুবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

এ জীবনসংগ্রামে নবীন ভাবের সমুদ্ঘাতার উত্তেজক অতি বিরল, উৎসাহয়িত্রীর কথা ত দূরে থাকুক; বিশেষতঃ আমাদের হতভাগ্য দেশে। এজন্য বঙ্গ-বিদূষী নারীর সাধুবাদ সমগ্র ভারতীয় পুরুষের উচ্চকণ্ঠ ধন্যবাদাপেক্ষাও অধিক শ্লাঘ্য।

প্রভু করুন, যেন আপনার মত অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।

আপনার লিখিত 'ভারতী' পত্রিকায় মৎসম্বন্ধী প্রবন্ধ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ মন্তব্য আছে; তাহা এই—

পাশ্চাত্ত্য দেশে ধর্ম্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই করা হই ছে এবং হইবে। পাশ্চাত্ত্যেরা সহায়তা না করিলে যে আমরা উঠিতে পারিব না, ইহা চির ধারণা। এদেশে এখনও গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই, এবং সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, কৃতকর্ম্মতা (Practicality) আদৌ নাই।

উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহা সাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্য্যে মহা ভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে আমরা অতি নির্দ্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা

যায়, অন্য উপায় নাই, ভাল মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে, কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া এক হস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। এক দিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্য দিকে অস্থির ধৈর্য্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক ; কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম যে, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়া-পুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কখনও পুতুল ভাঙ্গে না। হে মহাভাগে, আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাস ভোগসুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্ত্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সদুদ্দেশ্যে, অকপটতা ও অনন্ত প্রেম বিশ্ব বিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটি কোটি কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্বুদ্ধি নাশ করিতে সক্ষম।

আমার পুনর্ব্বার পাশ্চাত্যদেশ গমন অনিশ্চিত ; যদি যাইও তাহাও জানিবেন ভারতের জন্য—এদেশে লোকবল কোথায়? অর্থবল কোথায়? অনেক পাশ্চাত্য নরনারী ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে কয়জন? আর অর্থবল! আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কলিকাতাবাসীরা টিকিট বিক্রয় করিয়া লেকচার দেওয়াইলেন এবং তাহাতেও সঙ্কুলান না হওয়ায় ৩০০ টাকার এক বিল আমার নিকট প্রেরণ করেন!!! ইহাতে কাহারও দোষ দিতেছি না বা কুসমালোচনাও করিতেছিনা, কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থবল ও লোকবল না হইলে যে আমাদের কল্যাণ অসম্ভব, ইহারই পোষণ করিতেছি। ইতি শম্

চির কৃতজ্ঞ ও সদা প্রভু সন্নিধানে ভগবৎ কল্যাণ-কামনাকারী

বিবেকানন্দ

[পত্রাবলী, ২য় সংস্করণ, ৮০নং পত্র স্বামী আত্মবোধানন্দজীর অনুমোদনক্রমে মুদ্রিত]।

স্বামীজী 'ভারতী' সম্পাদিকা সরলা দেবীকে এই চিঠিটি লেখেন।

ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসীর চিত্ত জয় ক'রে স্বামীজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে দেশের দিকে রওনা হ'ন। তিনি দেশে ফিরে এলে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারী রাজা রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজারের বাড়ীতে এক বিরাট অভিনন্দন সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজী এই চিঠিতে ঐ সভারই উল্লেখ করেছেন। এর পর আর একখানি চিঠিতে 'ভারতী' সম্পাদিকাকে তিনি জানান যে তিনি ঐ টাকা দিতে অপরাগ হওয়ায় উদ্যোক্তারা নিজেরাই সে খরচ মিটিয়ে দেন। স্বামীজী এসময়ে দার্জিলিং গিয়েছিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায়। স্বামীজীর অন্যান্য চিঠির মত এই চিঠিতেও দেশবাসীর জন্যে তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় আছে।

২

১৮ এপ্রিল, ১৮৯৮

স্নেহাস্পদাষু,

জো, কর্মযোগ সব সময়ে কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা করো, যেন চিরদিনের জন্য আমার কাজ করা শেষ হয়ে যায়, আর আমার মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় নিঃশেষে মিলে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।

লণ্ডনে পুনরায় এসে নিশ্চয়ই তুমি খুশী হয়েছ। পুরাতন বন্ধুদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসা দিও। আমি ভাল আছি,—মানসিক খুব ভালই আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তিই বেশী বোধ করছি। জীবন-যুদ্ধে হার জিত দুই-ই হল। এখন পুঁটলি-পোঁটলা বেঁধে বসে আছি পরম মুক্তি-দাতার প্রতীক্ষায়। "শিব, শিব, পারে নিয়ে চল আমার তরী"।

যতই যা হোক, দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব বাণী শুনতে শুনতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেত যে বালক আমি আজও সেই বালক ছাড়া আর কিছু নই। সেই বালকভাবটাই হচ্ছে আমার সত্যিকার প্রকৃতি। কাজকর্ম, পরোপকার প্রভৃতি যা কিছু করেছি তা সবই বাইরের জিনিষ। আজকাল আবার তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি—সেই আগেকার প্রাণমাতানো কণ্ঠস্বর। বাঁধন সব টুটে যাচ্ছে, মানুষের মায়া দূর হচ্ছে,

কাজকর্ম আর ভাল লাগছে না, জীবনের সব চাকচিক্য শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু গুরু মহারাজের ডাক শুনতে পাচ্ছি, যাই, প্রভু, যাই।

"প্রেতের পিণ্ডদান প্রেতের দল করুক। তুই এসব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আয়।"—হে প্রেমাস্পদ, আমি আজ তোমার পথেই চলেছি।

হ্যাঁ, এবার ঠিক চলেছি। একেবারে নির্বাণের তীরে এসে দাঁড়িয়েছি। সময়ে সময়ে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি যেন সেই অনন্ত শান্তির সমুদ্র,—তার বুকে এতটুকু চাঞ্চল্য—এতটুকু ঢেউ নেই।

এই পৃথিবীতে যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী। জীবনে যে এত দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করলুম তাতেও খুশী। কাজ করতে করতে বড় বড় ভুলভ্রান্তি ঘটেছে তাতেও খুশী। আবার এখন যে শান্তির রাজ্যে এগিয়ে চলেছি—তাতেও খুশী। জগতে কাউকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে যাচ্ছি না—কারও বাঁধন নিয়েও যাচ্ছি না। দেহটা ধ্বংস হলে মুক্তি আসুক অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্তি পাই—যাই হোক না কেন, সেই পুরানো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে, আর কখনও ফিরবে না।

গুরু, পরিচালক, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ মারা গেছে—পড়ে আছে শুধু বালকস্বভাব, জীবনের সদাউৎসুক ছাত্র, সেবক বিবেকানন্দ।

তুমি বুঝতে পারছ কেন আর আমি * * বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। কোন কথা বলবার কি অধিকার আছে আমার? অনেক দিন হ'ল নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছি। হুকুম করার অধিকার আর আমার নেই। * * * প্রভুর ইচ্ছাস্রোতে যখন সম্পূর্ণরূপে গা ভাসান দিয়ে থাকতুম, সেই দিনগুলি আমার জীবনের সবচেয়ে মধুময় সময় বলে মনে হয়। আবার আমি গা ভাসান দিয়েছি।

আকাশে সূর্যের খর আলো আর সামনে দিগন্তবিস্তৃত শ্যামলিমা। দিনের উত্তাপে চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম ধরিত্রী, আর আমি ভেসে চলেছি ধীরে ধীরে নদীর শীতল বুকে—নিজের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা না রেখে। হাত পা নেড়ে সামান্যমাত্র আওয়াজ করার সাহস পর্যন্ত নেই পাছে এই অপূর্ব নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়। প্রাণের এই রকম শান্তিই জগৎটাকে মায়া বলে উড়িয়ে দেয়।

আগে আমার কর্ম-আয়োজনের মধ্যে জাগত মান যশের উচ্চাশা,

ভালবাসার ভিতর আসত ব্যক্তি-বিচার, ব্রহ্মচর্য সাধনার পিছনে থাকত ভয়, নেতৃত্বের মধ্যে প্রভুত্বস্পৃহা। এখন সে সব মরে যাচ্ছে, আর আমি ভেসে চলেছি। যাই, মা, যাই। তোমার স্নেহময় বুকে করে যেখানে আমায় নিয়ে চলেছ সেই অশব্দ, অস্পষ্ট, অজ্ঞাত, অপূর্ব রাজ্যে কাজ করার সব শক্তি বিসর্জন দিয়ে আমি যাব শুধু দ্রষ্টা হিসাবে।

আহা, কি অসীম শান্তি। মনে হচ্ছে, চিন্তাগুলো পর্যন্ত যেন হৃদয়ের দূর অতিদূর গভীর তল থেকে অস্পষ্ট দূরাগত গুঞ্জনধ্বনির মত ভেসে আসছে। চারিদিকে শান্তি। মধুর—মধুর সে শান্তি। মানুষ ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে কয়েক মুহূর্ত যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিষ দেখা যায় তবু মনে হয় যেন ছায়ার মত—যখন মানুষের মনে থাকে না ভয়, থাকে না কিছুর উপর টান, থাকে না কোন হৃদয়াবেগ। আমার অবস্থা আজ ঠিক সেই রকম। আমার মনে এখন জেগেছে সেই শান্তি—যে শান্তি মানুষ ছবি আর পুতুল দিয়ে সাজানো ঘরে একলা একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করে। যাই, প্রভু, যাই।

[* 'এপিসিল্‌স্‌' ৪র্থ ভাগ, থেকে উদ্ধৃত]

স্বামীজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল তাঁর পাশ্চাত্য দেশীয় শিষ্যা শ্রীমতী ম্যাক্‌লিঅডকে এই চিঠিখানি লেখেন।

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চিঠি)

সাইরেন ষ্টেসর—৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৮৪

আমার বিশ্বাস যে যতদিন আমাদের দেশবাসীর ভাল আবাসগৃহে আরামে থাকিতে ইচ্ছা না হইবে, ততদিন আমাদের গার্হস্থ্য অবস্থার উন্নতি হইবে না। পরিচ্ছন্নতা, ও অন্ততঃ আয়সাধ্য ভাল অবস্থায় জীবন ধারণ করা আমাদের জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। * * * আমাদিগের কৃষকের অবস্থার সঙ্গে এখানকার কৃষকের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়

আমাদের কৃষকেরা কি গরিব দুরবস্থাপন্ন। যে দিন যাহা পায় প্রায় সেই দিনই তাহা ব্যয় করে, সঞ্চিত অর্থ নাই; আরামময় বাসস্থান নাই; তৃণাবৃত কুটিরে শতছিন্ন শয্যায়, শত গ্রন্থিময় বসনে, বহু সন্তানের পিতা, কৃষক দীনভাবে কোন প্রকারে জীবন যাপন করে। দুর্ভিক্ষকালে তাহারা (হতভাগা কৃষক!) সপুত্র-পরিবারে অনশনে প্রাণত্যাগ করে। ইহার কারণ কি? অন্যান্য কারণও আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে বর্ত্তমানে সন্তোষই ইহার মূল। তাহার অবস্থা উত্তম হইতে পারে, ইহা তাহার ধারণা হয় না।

পূর্ব্বপুরুষ-ব্যবহৃত ভূকর্ষী ব্যবহার না করিয়া নূতন প্রকার লাঙ্গল ব্যবহার করিলে যে ভূমি দ্বিগুণ ফলবতী হইতে পারে ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস হয় না। গরীব থাকিলেই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট, নব প্রথার উপকারিতায় অবিশ্বাসী, দুর্ভিক্ষ হইলে তাহারা বিধি নির্ব্বন্ধের দোষ দেয়, নিজ ভাগ্যকে অভিশাপ দেয় ও স্বীয় ললাটে করাঘাত করে। আমি বলি তাহাদিগের মনে সম্ভোগ-বাসনা দাও উন্নতির সোপান রচিত হইবে।

আমি যেন শুনিতেছি পৃথিবীর ঘটনানভিজ্ঞ ভাবসর্ব্বস্ব (sentimental) কেহ এখানে হয়ত কবিত্বময়ী ভাষায় বলিতেছেন—"বিলাসের চিন্তা দূরে রাখ, সম্ভোগ-বাসনা শত যোজন অন্তরে চিরদিন অবস্থান করুক, এই সন্তোষই কৃষকদিগের জীবন, ইহাই তাহাদিগের সুখ-সম্পদ, ইহাই তাহাদিগের দুর্ভাগ্যের, ধৈর্য্যের ও সহিষ্ণুতার জননী। বিলাস তাহাদিগের মধ্যে আনিও না। ইহা তাহাদিগের জীবনকে দুঃখময় করিবে, পারিবারিক সুখে কালিমা নিক্ষেপ করিবে, ইহা মধু না আনিয়া তাহাদের জীবনে অসন্তোষের হলাহল ঢালিয়া দিবে।

এখানে কেহ বলিতে পারেন যে যদি অসন্তোষই উন্নতির মূল হইল, অসন্তোষই পারিবারিক শৃঙ্খলার কারণ হইল, আর সেই অসন্তোষই ভবিষ্যতের উন্নতির সোপান হইয়া জীবনের সঙ্গী হইল, তাহা হইলে সুখ কোথায় রহিল? অসন্তোষপ্রণোদিত কার্য্যলব্ধ ফলসুখের একটি উপাদান। আমার আরও বিশ্বাস দুর্ভিক্ষসময় যে খাইতে পায় সে, যে খাইতে পায় না সেই অনাহারা, সপরিবারে মৃতপ্রায়, হতভাগ্য কৃষক অপেক্ষা অধিক সুখী; কারণ তাহার সম্মুখে ধূল্যবলুণ্ঠিত পুত্র কন্যা কাঁদে না, প্রিয় ভার্য্যা সম্মুখে অনশনে প্রাণত্যাগ করে না। আর সুখই যদি মানবের একমাত্র লক্ষ্য হয়, যদি আরও উন্নত অবস্থায় সুখ না থাকে, তবে মানবের আদিম

অবস্থা হইতে .সভ্যাবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে বলিতে হইবে। মনুষ্য বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাকিলে সভ্য হইত না, তাহা হইলে সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি ধরণীপৃষ্ঠ সুশোভিত করিত না, বাণিজ্যপোত নির্ম্মিত হইত না, রেলগাড়ি বৈদ্যুতিক তার উদ্ভাবিত হইত না, ব্যোমযান আকাশে উড়িত না, তাহা হইলে সঙ্গীতের প্রাণালোভী ঝঙ্কার চিত্রের হৃদয়োন্মাদী মাধুর্য্য, ভাস্কর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির প্রস্তরগত কবিত্ব, কবিতায় তারাময়ী ভাষা সৃষ্ট হইত না, ও মানব জীবন-পথে কুসুম-বৃষ্টি করিত না। অসন্তোষই ইহাদিগের উৎপত্তি স্থান। অসন্তোষই সভ্যতা-স্রোতস্বিনীর নির্ঝর।

[নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

চিঠিটি, 'পতাকা'য় ১২৯১ সালের ১৯ পৌষ প্রকাশিত হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চিঠি

১২, পার্শিবাগান লেন. -লিকাতা

২০ মাঘ, ১৩১৮

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। রবীন্দ্র সংবর্দ্ধনার বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসহিত অভিনন্দন পত্রখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র পাঠে দেখিবেন, রবীন্দ্রবাবুর পঞ্চাশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার বহু বৎসরের সাহিত্য সেবার উপলক্ষ্য করিয়া (পরিষৎ) দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছেন মাত্র; কোনরূপ রাজ্যে বা সাম্রাজ্যে. অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দেন নাই, বা সাহিত্য ক্ষেত্রে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার স্থান নির্দ্দেশের বা পদবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থান লইয়া মতভেদ আছে ও চিরকাল থাকিবে; সাহিত্য-পরিষৎ সে বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করিয়া ধৃষ্টতা দেখাইবেন না, বা দেখান নাই। তবে তিনি বহু বৎসর

সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও সামান্য নহে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই; কাজেই একটা উপলক্ষ্য পাইয়া তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করায় পরিষদের কোনরূপ অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে। অন্যান্য সাহিত্যসেবক ও সাহিত্যঅনুগ্রাহকগণকেও পরিষৎ এইরূপে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শনে চিরকাল প্রস্তুত আছেন ও থাকিবেন। তাহার নজিরও আছে। বহুদিন পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থ বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল। পরিষদের শৈশবে বিদেশী পণ্ডিত বেণ্ডাল সাহেব পরিষদে উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্মানার্থ উৎসব অনুষ্ঠান হয। সেবার পরিষদের স্থাপনকর্ত্তা ৺রমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা আসিলে তাঁহার সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা হয। সম্প্রতি বিশ্বকোষ গ্রন্থ সমাপ্তি উপলক্ষ্যে বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রস্তাব উপস্থিত আছে। পূর্ব্বতন 'সাহিত্য-রথী'-দিগেরও সম্মানার্থ পরিষৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতা আসিলে পরিষৎ তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতির জীবদ্দশায় পরিষৎ তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবার অবসর পান নাই; কেননা, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না। তথাপি হেমচন্দ্রের শেষ বয়সে অর্থকষ্ট নিবারণের জন্য পরিষৎ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন ও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ৺নবীনচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা পরিষৎ-মন্দিরে শীঘ্র হইবে। বিদ্যাসাগরের বহু যত্নের লাইব্রেরিটি যখন নিলামে চড়িয়া বাঙ্গালীর দুইগালে চূণকালি মাখাইবার উপক্রম করিয়াছিল, পরিষৎ তখন মাঝে পড়িয়া ঐ লাইব্রেরিটি রক্ষা করিয়াছিলেন, উহা পরিষৎ মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইয়া বিদ্যাসাগরের জীবন্ত মূর্ত্তিস্বরূপে সাধারণের সম্মুখে রহিয়াছে।

অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ একটা অপূর্ব্ব অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তাহা বলা চলে না।

অপিচ এই অনুষ্ঠানে পরিষদের একপয়সাও ব্যয় করিতে হয় নাই।

বঙ্গের মান্যগণ্য কতিপয় ব্যক্তি একটি সংবর্দ্ধনার কমিটি স্থাপন করিয়া কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। এই চাঁদা সর্ব্বসাধারণের নিকট তোলা হয় নাই, তাঁহাদের নিজেরা ও বন্ধুবান্ধবের নিকট তোলা হয়। পরিষৎকে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র করিয়া তাঁহারা পরিষৎকে এই অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পরিষৎ সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা উচিত বোধ করেন নাই। সেই সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশ-মাত্র এই অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ সাহিত্যের কোনরূপ স্থায়ী উপকারের জন্য পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এখনও হিসাব শেষ হয় নাই; সম্ভবতঃ অন্যূন সাত হাজার টাকা এইরূপে সাহিত্যের স্থায়ী উপকারার্থ পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। পরিষদের হিতৈষী মাত্রেই এই সংবাদ পাইলে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ মাত্র নাই।

আমাদের কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কেন যে কলিকাতায় থাকিয়াও ও সমুদয় তথ্য জানিয়াও এই কবিসংবর্দ্ধনা ব্যাপারে এতটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মফস্বলবাসীরা দূরে থাকেন, সকল তথ্য জানিতে পারেন না; তাঁহাদের মনে নানারূপ আশঙ্কা হওয়া সঙ্গত বটে, কিন্তু যাঁহারা কলিকাতায় আছেন ও অন্তরঙ্গরূপে আমাদের সহিত কাজ করেন, তাঁহারা যে কেন এইরূপ অমূলক আশঙ্কা ও অভিযোগ করেন, বুঝিনা। * *

আপনার কুশলপ্রার্থী
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[আশুতোষ বাজপেয়ী প্রণীত 'রামেন্দ্রসুন্দর' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও কবির অন্যান্য বন্ধুবর্গ একটি সমিতি গঠন করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠানের জন্যে অনুরোধ জানান। সেই অনুযায়ী ১৪ই মাঘ পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্রের পৌরোহিত্যে টাউন হলে কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। রামেন্দ্র-সুন্দর অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। সেই অভিনন্দন সম্বন্ধে কলিকাতার কোন কোন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি বিরূপ মন্তব্য করেন। সম্পাদক হিসাবে

রামেন্দ্রসুন্দরকেও অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। উপরিদ্ধৃত পত্রে সংবর্ধনা সভা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের কাছে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন।

(কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি)

১

কল্যাণীয়েষু,

তোমরা আবার বুড়ো ধরতে আরম্ভ করলে যে! এ সখ্ মাথায় এলো কেনো? রকম রাখতে হবে বলে' নাকি? আমি যতদূর শুনেছি,—তোমাদের তো ব্যবসা নয়। তোমরা ছেলেমেয়েদের মনের মত মানুষ করতে চাও, তাদের আত্মসম্মান বোধ জাগাতে চাও। বেশ কথা। তাতে আমাদের জোটানো কেনো? আমাদের বুঝি চেন না? চিনবেই বা কি করে,—দু'ধাপ পেছিয়ে পৌঁচেছ যে!

আমাদের আত্মসম্মান বোধ কিসে ছিল জানো? চাকরিতে। মুদী ধার দেবার জন্যে মুকিয়ে থাকতো। ধোপায়—সবার সেরা কাপড় কাচতো,—কুটির কাপড় কিনা! ইস্তিরির ইজ্জৎ কতো! কফের, কলারের কদর কতো ছিল! প্যাণ্টের ভাঁজ্ সাম্‌নের দিকে খাড়া থাকতো। ঠিক সাহেবদের মত হওয়া চাই। তোমাদের সবই দেখচি উল্‌টো।

আমাদের যাঁরা চিনেছিলেন, তাঁরা—পঞ্চাশ পেরুলেই আমাদের বনে পাঠাবার ব্যবস্থা,—বাক্যে নয়—লেখাপড়ায় পাকা করে রেখে গিয়েছেন, পাছে বেশী থাকলে, দেশের সর্ব্বনাশ করে বসি। কিন্তু সাহেবরা করে দিলেন—পঞ্চান্ন থেকে যাট। সব ভেস্তে গেল। অধঃপতন ওই থেকেই আরম্ভ হল।

শুনতে পাই—আমাদের শাস্ত্রকারদের চেয়ে বিচক্ষণ জাতও জগতে ছিল। তারা বৃদ্ধদের উঁচু চাল থেকে গড়িয়ে দিত, শেষ কড়ায় চড়িয়ে, ভোগ লাগিয়ে, তবে নিশ্চিন্ত হোত। শত্রুর শেষ রাখতে নেই কিনা!

সে-সব পণ্ডিতেরাও রইলেন না, তাঁদের বিধি নিষেধও লোপ পেলে। আমাদের দুর্ভাগ্য।

আমাদের সময়ের কথাই বলি। তখন রাজধানীতে বিলিতি কলমের চারা গজিয়েছে,—বোল ধরতে আরম্ভ হয়েছে। ইংরিজি লেক্‌চারের বাহবা পড়ে গেছে।

কলকেতার তিন ক্রোশ তফাতে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামেও, জোড়-কলম বাঁধবার ব্যবস্থা এসে গেল।—বঙ্গ বিদ্যালয়ে ইঙ্গ-বীজ বোনা হল,—অবশ্য হিন্দুর হাতে শোধন করা—সরকার মশার পাক্। তখন A, B, C, শুনে, পাড়ার পদ্ম পিসি কাণে গঙ্গাজল দেন, বলেন—সর্ব্বনাশ সুরু হল! স্বকৃতভঙ্গ-কর্ত্তারা বলেন,—রাজভাষা গো—রাজভাষা,—ওর তেজ কতো। 'রাস্‌কেল্'—শুনেছ? অমন জোরালো কথা—আমাদের কাদম্বরীতেও নেই,—যেন শক্তিশেল! তোমরা আর শুনতে পাবে কোথায়! পিসি বলেন,—"আমাদের শুনে কাজ নেই—তোরাই শোন।"—সাধ্বীদের কথা নাকি ফলে,—বৃথা হয় না।

যেদিন ছোট এ, বি, লিখলুম, বাবার আনন্দ ধরে না, স্বর্গ যেন সামনে দেখতে পেলেন! পাড়ায় খবর দিয়ে আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে ফিরলেন। বল্‌লেন —"সাহেবরা খুসী হ'লে আর চাই কি? দেনেওলা ওরাই। স্থাখ্‌,—সায়েব দেখলেই সেলাম করবি,—ওরাই কলির দেবতা।" পিতৃবাক্য। তবু তখনো শুনিনি "পিতরি প্রীতিমাপন্নে" ইত্যাদি। সেটা তিনি গত হ'লে জানলুম! Too late!

গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের বড় কথা ছিল,—সায়েবের কুটী আর সায়েবের চাকরি। সেই সব মন্ত্র সজীব হ'য়ে ক্রমে কুটস্থ হ'তে লাগলো। চাকরির জন্যেও ছট্‌ফটানি ধরলো;—তখনকার দিনে এতো বেইমানী বাড়েনি,—শিন্নি দিতেই সত্যনারায়ণ কথা শুনলেন—তাও হ'ল। ভয় থেকে নাকি ভক্তির জন্ম,—নিত্যই ভক্তিও বাড়তে লাগলো।

তখন ব্রাহ্মণবাড়ী মাত্রেই গৃহদেবতা (শালগ্রামশিলা) থাকতেন। পূজা ছিল আমাদের নিত্যকর্ম্ম,—এখন যেমন চা খাওয়াটা। পূজায় ধ্যানও করতে হয়। ক্রমে চক্ষু বুজলেই জীবন্ত-দেবতারা প্রকট হতে লাগলেন। তবে তো ঠিকই,—পিতৃবাক্য মিথ্যা হয় না—শ্রদ্ধা বেড়েই চললো। কারো কারো মূর্ত্তি কিন্তু রুদ্র! ওঃ ঠিক হয়েছে,—নিশ্চয়ই ভক্তি বাড়াবার জন্যে। শেষ দেখি,—শাস্ত্রের সঙ্গে মিলেও যাচ্ছে,—স্বেদ কম্প, সবই আসে। বাঃ! সরকার মশায়ের

বীজ ফ্যালাও হতেই, পাতুরে ঝঞ্ঝাট ফেলাও সুরু হয়ে গেল। একমেবাদ্বিতীয়ং—তুই আবার কেনো? ভক্তি একমুখী দাঁড়ালো,—শালগ্রাম গ্রাম ছাড়লেন।

ক্রমে জোড়কলম বেদাগ্ বেঁধে গেল। সরকার মশার First Bopk, first class fruit দেখিয়ে দিলে। বামন পাড়ায় যখন তখন তাঁর—"met a hen" মুখস্ত হ'তে লাগলো। বিলিতি ছাড়া কারো কিছু আর মনে ধরে না,—মেয়েরাও ছোঁয় না।—"ওমা, এ যে দিশী, এ আনতে বলেছিল কে!"—মন্টিথের জুতো মাথায় করে নিলুম। তোমরা আজ তার আদিখ্যেতা বুঝবে না। তা হোক, ভয় নেই, হতাশ হযোনা, এখনো আমাদের মত দৃঢ়ব্রত অনেক আছেন।

ও-কি বলচো! হনুমান হঠে যান—এমন সব দামী ভক্তও দেখা দিযেছিলেন, যাঁরা রং বদলাবার জন্যে—লাকো টাকা সেধে দিতে রাজি ছিলেন। ভালোটা কে না চায়। তোমরা চাও না? Daniel-de-foe (ড্যানিযেল-ডি-ফো) মার্কা চুল ছাটো নাকি বন্ধ? গ্ল্যাড্-নেক্, ক্লিন্-নেক্ চলছে না কি! এ Noa's Arcএ সবই আছে,—থাকবেও! তখনকার honourable exception ছিলেন "রইস এণ্ড্ রাযটের" শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শম্ভু মুখুয্যে মশাই, তিনি কাবুলী পোষাক পরতেন।

সাযেবদের দাক্ষিণ্যে আমরা কত সোহাগে, বাংলা থেকে আরম্ভ করে—মধ্য প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম, পাঞ্জাব, পেশোয়ার পর্য্যন্ত, আপিস্ আলো কোরে রাজ্যের কাজ করেছি। বাঙালী না হ'লে চলতো না। যেখানে যেখানে গিয়েছি—সব সহরেই বাঙালীর কীর্ত্তি দেখতে পাবে কালীবাড়ি, ইস্কুল, ক্লব, লাইব্রেরী, দুর্গাবাড়ি, থিয়েটার, মায হরিসভা,—এই বাঙালীই সূচনা করে, প্রতিষ্ঠা করে। স্থানীয় লোকদের চোখ ফোটায়। তাতেও তখন ইংরাজের সাহায্য পেয়েছি, চাঁদা পেযেছি। হাসি মুখে সব রসগোল্লা খেয়ে গেছেন,—মেমের জন্যে নিয়ে গেছেন।

আজ এই বাঙালীর স্থান কোথাও নেই,—কারুর আর মনে ধরচে না। কেনো? এই কথাই ভাবি।

এখন 'ডোমিসাইল' সার্টিফিকেট চাই! আবার তা বাপের থাকলে ছেলের তাতে দাবী নেই, অথচ বিষয়ে দাবী আছে! আইন। বাপের দেনা থাকলে, ছেলে শুধতে বাধ্য, নচেৎ জেলে ঢুকতে পাবে অনায়াসে—পাবে না

কেবল এই দুর্ল্লভ অধিকার! আর্ট (art) কথাটা তোমাদেরই আমদানী, তাই নয় তো? বুঝিনা।

সর্ব্বনাশ হলে,—মনকে বোঝাতে শুনি,—'ভগবান যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্য'; সুতরাং দুঃখের কারণ নেই—খুসীরই কথা। শান্তি খুঁজতে হলে,—তাই বলতে হয়।

দেশ-ভক্তি দেশ-ভক্তি—হালে শুনচি—আমাদের দেশ ছিলনা,—এখনো আছে কিনা জানি না। তবে মুখস্ত পড়ার মত, বলতে শুনি বটে। আমরা ছিলুম ভিটে-ভক্ত। এখন দেখচি—তাও নেই, অধিকাংশই নানা স্থানি, সহর ভক্ত, মেস্ ভক্ত। তখন কর্ত্তাদের কাছে প্রায়ই শুনতুম,—"কেউ বলুক না দেখি,—৭০ বছরের মধ্যে শশধর বাঁড়ুয্যে—চৌকাটের বাইরে পা বাড়িয়েছে!"

তেমন সদুপদেশও আর শুনতে পাওয়া যায় না। আমরা কতো শুনেছি— "দেখো বাবা কোনো কাজে কখনো সবার আগে এগিয়ে যেওনা। থাক্না—আরো পাঁচজন তো রয়েছে।" এখন সবই উল্টো—তোমরা এগিয়ে বসে আছো!

এখনো আমাদের সময়ের পাঁচ-সাত জন আছেন, তাই রক্ষে। সেদিন একটি বৃদ্ধ, ছেলেদের বলছিলেন,—"লেখা-পড়া শিখে মুক্ষু হযোনা,—ও সব ফ্যাসাদে তোমাদের যাওয়া কেনো? কিছু হ'লে কি তোমাদের বাদ দিয়ে হবে? ওদের হলেই তোমাদেরও হবে, ঘরে বসে মিলবে, এটা বোঝনা!" ভিক্টোরিয়ান্ যুগের লোক কমে যাচ্ছেন দেখে, দ'মে যাচ্ছিলুম। আছেন দেখে সাহস পেলুম। যে ক'দিন আছি, যেন থাকেন।

কি দিনই ছিল, আর এখন কি দেখছি। আশ্চর্য্য, একটা লোককেও গুড়ুক খেতে দেখি না! তখন তিনটের বেশী চারটে ডুব দেবার হুকুম ছিল না, দশ মিনিটের বেশী জলে থাকলে, কর্ত্তা কাণ ধরে কিলুতে কিলুতে বাড়ি নিয়ে যেতেন। আর এখন শুনচি,—ছেলে চার দিন চিৎপাৎ হয়ে জলে ভাসছে দিন রাত। কুমীরেও যা পারে না। বাপ মা খোঁজও করেন না। লোহার 'বয়া' নাকি রে বাবা! চামড়ায় 'সুটকেস্' বনে তো কাজে লাগবে। তা নয়;—শুনতে পাই, বৈতরণী নয়,—ইংলিস্ চ্যানাল্ পার হবার প্রাক্‌টিস্! বলে কি? কি দুঃখে যে, তা বুঝি না।

তাই বলছি,—আমরা থাকতে তোমাদের সুবিধে নেই,—কেবল বাধা দেব, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করবো, আর প্রার্থনা করবো—সুমতি হোক্!

কেদারনাথ এই চিঠিটি লেখেন শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে। 'বেনু' ১৩৩৮, আশ্বিন সংখ্যা থেকে শ্রীক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে উদ্ধৃত।

২

নিউ ইয়ার '৪৩

আমাদের আড্ডা কথাটি শুনতে সুমিষ্ট ভব্য না হলেও সেখানে প্রাণটা কিন্তু চাঙ্গা থাকে, হাসিখুশিতে তাজা হয়। কলকেতায় তার প্রাচুর্য্য থাকায় ৺অমৃত বোস আমাদের অনেক আনন্দ দিয়ে গেছেন, দীনবন্ধুও বন্ধুর কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎভায়া সাহিত্যের সৌন্দর্য্য না বাড়িয়ে গেলে, বাঙালীর যে কি দুর্দ্দশা হতো, সে যে কি নিয়ে দুর্ব্বহ জীবন বহন করত—ভাবতে পারি না। তুমি শেষের দু'জনের কথা লিখেছ। তাঁদের পত্র যে দুর্দ্দিনের কতটা সহায় তা লিখে জানাবার জিনিষ নয়, মনে অমন সঞ্জীবনী আর কে দিবে? বহুভাগ্যে বাংলা দেশ তাঁদের পেয়েছিল। আমি তোমাদের আপন বলে জানি, এইটুকুই আমার সুখ ও পাথেয়।

পূর্ব্ব পত্র যখন লিখি, আমার অন্য ভায়েদের কথাও মনে হয়েছিল। কি যে লিখব ভেবে পাইনি। তোমরা পাঁচজন যেখানে থাকবে সেই ত আমার দেশ, সেইখানেই সব আছে। "যেখানেই থাকি, থাকি তাঁরি দ্বারে" —এই ভাবলেই গেট্‌ফেট্‌ কোথায় চলে যায়। মন মুক্ত। খুব হেসে খেলে কাটাও ভাই সব। বাইরে কেবল হাট আর হট্টগোল। সাধন-ক্ষেত্রে আছ, ওটাকে বাঁধন ভেব না। মুখ বদলানো মাত্র।

কারো চেয়ে তোমরা কম নও,—কত লোক তোমাদের কথা নিত্য কয়। —"সবার উপরে মানুষ বড়।"

যেখানে দশ জনে থাকবে, তাকেই আনন্দের হাট বানিয়ে নেবে—এ আশা আমি রাখি। রাতের পর প্রভাতও আসে।

শীতে গুটি মেরে যাচ্ছি—এখন ছুটি দাও,—আর সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভাশীষ লও।

তোমাদের শুভার্থী—দাদামশাই

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় যখন রাজসাহী জেলে ছিলেন [illegible] দা তাঁকে এই চিঠি লেখেন। শ্রীক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ১৩৫৩ আশ্বিনের ‘শ্রীহর্ষ’ পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত। •

(আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চিঠি)

৭৭, রসা রোড নর্থ
ভবানীপুর, কলিকাতা
৩রা নভেম্বর, ১৯১৮

প্রিয় লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড,

নিতান্ত অনিচ্ছায় আমি আপনাকে যে বিষয়ে লিখিতে মনস্থ করিয়াছি আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত হইলেও তাহা অনেকদূর পর্যন্ত গড়াইতে পারে।

গত বৎসরের ১৯এ অক্টোবর মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা দিবার জন্য আমি কিছুকাল পূর্বে মহীশূরের মহামান্য মহারাজার নিকট হইতে আমন্ত্রণ পাই। সেই আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করি এবং মহীশূরে যাওয়ার পথে ১৭ই অক্টোবর মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছাই। প্রথম শ্রেণীর একটি সংরক্ষিত কামরায় আমি যাইতেছিলাম এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সেই কামরায় আমার নাম ও পদের একটি চিরকুট লাগাইয়া দিয়াছিলেন। গাড়ি হইতে নামামাত্র একজন ইউরোপীয়ান পুলিস কর্মচারী প্রথমে সেই চিরকুট দেখে এবং তারপর আমাকে কোথায় থাকিব, কতদিন থাকিব ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করে। সত্য কথা বলিতে কি আমার প্রতি পুলিসের এই ধরণের মনোযোগ আমার ভাল লাগে নাই। আমার মনে হয় না যে ‘হিজ ম্যাজেষ্টির’ কোন জজের চেহারায় পুলিসের সন্দেহ বা অশোভন কৌতূহল উদ্রেক করিবার মত কিছু থাকিতে পারে। আমি আপনার কর্ম পরিষদের প্রাক্তন সদস্য স্যর শিবস্বামী আয়ারের বাড়ী গিয়াছিলাম। কারণ তিনি আমাকে মাদ্রাজে অবস্থানকালে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। সেইদিন সন্ধ্যায়

আমি মহীশূর যাত্রা করি এবং ২৩এ অক্টোবর (বুধবার) মাদ্রাজে ফিরিয়া আসি। আসিয়াই শুনিলাম যে, আমার অনুপস্থিতিকালে পুলিস আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিল। স্যর শিবস্বামী আয়ার যে 'বার্তা'টি পাইয়াছিলেন তাহা আমাকে প্রদান করেন এবং সেইসঙ্গে প্রযোজনমত তাহা ব্যবহার করিবারও অনুমতি দেন।

সেই 'বার্তা'টি আমার নিকট আছে এবং তাহাতে এইরূপ লেখা আছে :

"স্যর পি. এস. শিবস্বামী আযার

ময়ালপুর

অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানান, মাননীয় স্যর আশুতোষ মুখার্জী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য) ২৩ তারিখে মাদ্রাজে আসিলে আপনার গৃহে অবস্থান করিবেন কিনা, যদি আপনার গৃহে না থাকেন তাহা হইলে কোথায় অবস্থান করিবেন জানাইবেন।

(পুলিস ইনস্পেক্টার, মাউণ্ট রোড ডিভিসনের নিকট হইতে।)

ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় আমি ত্রিচিনপল্লী যাত্রা করি এবং ২৫ তারিখে (শুক্রবার) প্রাতে মাদ্রাজে ফিরিয়া আসি। সেইদিন বিকালে আমার মাদ্রাজ মেলে কলিকাতা অভিমুখে ফিরিবার বন্দোবস্ত করা ছিল। আমার প্রথম শ্রেণীর সংরক্ষিত কামরায় ভ্রমণ করিবার কথা ছিল এবং তদনুসারে রেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি আমার নাম ও পদের একটি চিরকুটও আমার জন্য নির্দিষ্ট কামরায লাগাইয়া দিয়াছিলেন। আমি স্টেশনে উপস্থিত হইলে একজন ইউরোপীয়ান পুলিস কর্মচারী আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করে। ইহা অত্যন্ত রূঢ় বোধ হওয়ায় আমি বিরক্তি প্রকাশ করিতে সে নিরস্ত হয় বটে কিন্তু ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া আমাকে লক্ষ্য করিতে থাকে।

আপনি যদি একটি তদন্তের ব্যবস্থা করিয়া ইহার কারণ অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন তাহা হইলে কৃতজ্ঞ থাকিব। প্রথমে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল ব্যাপারটি লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে জানাই কিন্তু পরে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে আপনাকে সকল ঘটনা না জানাইলে আপনার প্রতি অবিবেচনা করা হইবে। আমার মত পদাধিকারী ব্যক্তিকে কেন যে পুলিস অনুসরণ করিবে তাহা আমার নিকট দুর্বোধ্য। একথা বলিতে আমি আনন্দ পাইতেছি যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্যরূপে ভারতের সর্বত্রই বহুস্থানে আমি গিয়াছি

কিন্তু মাদ্রাজ ব্যতীত পুলিশের এইরূপ মনোযোগ আকর্ষণের সৌভাগ্য আমার কোথাও হয় নাই।

আপনার বিশ্বস্ত

আশুতোষ মুখার্জী

মহামহিমান্বিত বেরন পেণ্টল্যাণ্ড অব লীথ, পি. সি. জি.সি. আই. ই. সমীপে।

আশুতোষের এই চিঠির উত্তরে লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড জানান যে, শুধু আশুতোষের জন্যেই নয়, সকল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সম্বন্ধেই এইরকম ব্যবস্থা করা হয়। আর স্যর আয়ারের কাছে যে 'বার্তা' পাঠানো হয়েছিল সেটি পুলিস ইনস্পেক্টার নয়, প্রেসিডেন্সি পোষ্টমাষ্টারের নির্দেশে পোষ্ট অফিসের ইনস্পেক্টার পাঠান। উদ্দেশ্য—মাদ্রাজে আশুতোষের অবস্থানকালে তাঁর ডাক সেখানে পাঠানো। কিন্তু ইতিপূর্বে স্যর শিবস্বামী আয়ার আশুতোষকে যে চিঠিখানি লেখেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঐ ঘটনা গভীর উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সে সময়ে ইংরেজ সরকার সকল শ্রেণীর বাঙালীকে যে কি রকম সন্দেহের চোখে দেখতেন উক্ত ঘটনাটি থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। স্যর আয়ারও তাঁর চিঠিতে সেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন…"if some big fish is allowed to escape some really queer fish too might escape." অর্থাৎ রুই-কাতলা জাল ফস্কে পালালে চুনো-পুঁটি ত যাবেই। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের Calcutta Review থেকে চিঠিটি অনুবাদ করা হয়েছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি)

১

"দেখ, সেদিন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে দেখিয়া একটা কথা মনে পড়িল। তুমি জান আমি বুড়ো মানুষকে ভালবাসি না।…কিন্তু বুড়ো কাহাকে বলি জান? রাজনারায়ণবাবু, রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে আমি বুড়ো বলি না। কারণ আমার অভিধানে চুল পাকিলেই বুড়ো হয় না। যে মনে করে, আমি সব

জানি, সংসারের উন্নতি যা হবার হয়ে গেছে সেই বৃদ্ধ। যাহাদের হৃদয়ে নিত্য নূতন আশা, নূতন আকাঙ্খা জাগে না সেই বৃদ্ধ। যা আছে মন্দ হইলেও তাহাই থাকিবে, ইহাই যাহার বিশ্বাস সেই বৃদ্ধ। বৃদ্ধ সে, যে যুবকের পবিত্র উৎসাহ অগ্নি নিবাইতে চায়। চুল পাকিয়াছে বলিয়া কি রামতনুবাবু বৃদ্ধ? শুনিলাম তিনি নাকি আবার 'বোধোদয়' পড়িতেছেন, কারণ তিনি বলেন, 'বোধোদয়ে' যাহা লেখা আছে আমরা তাহাই করি না; বড় বই পড়ি কেন? পরলোকের দ্বারদেশে আগতপ্রায় এই সপ্ততিপর বৃদ্ধের কি অদ্ভুত ধর্ম্মপিপাসা! আর রাজনারায়ণবাবুর যে পরিহাস-রসিকতা, হাসির ছটা দেখিলাম, তাঁহাকে বৃদ্ধ বলি কেমন করিয়া? বৃদ্ধ আমরা; পেঁচার মত মুখ ভার করিয়া বিজ্ঞতার ভান করি; যেন বিধাতার কাছে লেখাপড়া করিয়া দিয়াছি যে আর হাসিব না। শিশুর হাসি আর সাধুর হাসি একই রকমের। উভয়েই জননীর মুখ দেখিতে পান।"...

এই চিঠিটি শ্রীযুক্তা শান্তাদেবী প্রণীত "রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা" নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। ১২৯৬ সালের 'ধর্ম্মবন্ধু'তে চিঠিপত্রের স্তম্ভে রামানন্দ এই পত্রটি প্রকাশ করেন।

প্রবাসী কার্য্যালয়, এলাহাবাদ
১৯-১১-১৯০১

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত রচনাগুলি আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি। সকলগুলিই প্রশংসনীয়। অবশ্য সকলগুলিকে একই কারণে বা একই রকমের প্রশংসা দেওয়া যায় না। 'বনলীলা' ছন্দের মধুর ঝঙ্কারে এবং কবিত্বে মনোজ্ঞ হইয়াছে। ছন্দের এত বাঁধুনীর মধ্যে এতটা কবিত্ব রাখা বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচায়ক। 'প্রেমলীলা'ও বেশ হইয়াছে। কিন্তু Petruchio ও Kate-এর মত Court-shipটা এত সংক্ষেপে সারিতে গিয়া আপনি আনন্দ ও সুহাসিনীকে কতকটা abruptly প্রেমে ফেলিয়াছেন। ক্রেতা একটা দর হাঁকিয়া কিম্বা লইব না বলিয়া দোকান হইতে দু'পা যাইতে না যাইতেই যে দোকানদার দর কমাইয়া দেয়, সে এখনও দোকানদারী শিখে নাই। সুহাসিনীকে প্রেমের ব্যবসায়ে কি এতটা অনভিজ্ঞ করা আপনার উদ্দেশ্য। অথবা হয়ত সে বেচারা মুখরা হইলেও নিতান্ত সরলা।

'মোতিয়া' বেশ হইয়াছে। সাহেব বাঁদরটাকে আর একটুকু নাচাইলে মন্দ হইত না।

ঋতু-সংহারের অনুবাদ মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ পাই নাই, সে ক্ষমতাও নাই। কবিতা হিসাবে বেশ হইয়াছে। ইহা সত্য যে সমুদয় রচনা delicate রুচির লোকের উপযোগী নয়। ঋতু-সংহার সে মোহ জন্মাইতে পারে না, যাহা সংস্কৃত মূলে আছে। এইজন্য অনেক জায়গায় indelicate মনে হয়। ফ্রেম অনুসারে ছবি মানানসই বা বেমানান হয়। তেমনি উজ্জয়িনীর নায়ক নায়িকার চিত্র উজ্জয়িনীর ফ্রেমে যেমন ঘোরালো হয় বাংলার ফ্রেমে তেমনটি হয় না। আমার ধারণা দুর্নীতি বা অশ্লীলতা কথায় হয় না, উদ্দেশ্যে হয়। দাম্পত্য প্রেমের চরম পরিণতি যাহাই হউক, মূলতঃ এবং প্রধানতঃ উহা শুধু অশরীরী ব্যাপার নয়ঃ—দৈহিক আধ্যাত্মিকের অনির্ব্বচনীয় সংমিশ্রণ। যৌন আকর্ষণ ও অনুরাগের বর্ণনায় কেহ যদি দৈহিকের দিকে বেশি ঝোঁকেন, তাহা হইলেই তাঁহার রচনাকে অশ্লীল বলিতে পারি না; যদিও তাহাকে শ্রেষ্ঠ কবিতার আসন দিতেও পারি না। কিন্তু দৈহিক একেবারে বাদ দিলেও কেমন অস্বাভাবিক লাগে। তবে একথা মানি যে, দৈহিক আকর্ষণের বা সম্ভোগের চিত্র অপরিণত-বুদ্ধি পাঠক পাঠিকার পক্ষে ভাল নয়। এই জন্য আমি পুস্তক-প্রকাশক হইলে আপনার বক্ষ্যমান সমুদয় রচনাই ছাপিতে পারিতাম। কিন্তু যাহা Promiscuously ছেলেমেয়ে বালক-বৃদ্ধ সকলের হাতে পড়ে এরূপ Publicationএ ছাপা কাহারও পক্ষে সঙ্গত বোধ করি না। যাহা হউক, আপনি বোধহয় এসব ঝুটা Philosophy শুনিতে চান না। এখন কাজের কথা বলি।

·· আমার বিবেচনায় গদ্যপদ্য সবগুলি এক কেতাবে ছাপায় দোষ নাই, কারণ সবগুলিতেই পুষ্পধন্বার কীর্ত্তি বা প্রভাব বিদ্যমান আছে।

···আমি চাকরী করিয়া খাই, সাহিত্য চর্চ্চা করিবার সময় পাই না। নতুবা ইচ্ছা হয় যে আর কোনরূপে না পারি, আপনার 'বনলীলা' বা 'বংশী গোপাল' এবং অন্যান্য কবিদের কোন কোন কবিতার appreciation লিখিয়াও সাহিত্যসেবা করি। কিন্তু তাহার সময় কোথা? মণিহারী দোকান বা পাঁচ ফুলের সাজি সাজাইতে সাজাইতে বুঝি—বা আয়ু শেষ হয়।

ইতি—

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীযুক্তা শান্তাদেবী প্রণীত 'রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

শ্রীযুক্তা শান্তাদেবী এই চিঠির প্রসঙ্গে লিখেছেন—"বাংলাদেশের বাহির হইতে 'প্রবাসী'কে গড়িয়া তুলিতে এবং শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করিতে সম্পাদককে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেন, যোগেশচন্দ্র রায়, বামনদাস বসু, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি প্রবাসী বাঙালীরা লেখার কার্য্যে তাঁহার সহায় ছিলেন। বাংলা দেশের লেখকদের নিকট এই সময় তিনি বেশী লেখা পাইতেন না। অনেকের ধারণা নামজাদা লেখকের লেখা পাইলেই তিনি নির্ব্বিচারে ছাপিতেন এবং গল্প ও কবিতা বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। এই ধারণা যে কতখানি ভুল তাহা যাঁহারা তাঁহার সহিত কাজ করিয়াছেন এবং যাঁহারা নিজেদের লেখা পাঠাইতেন তাঁহারাই জানেন। .... বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁহাকে কখনও কখনও মতামতের জন্যই রচনা পাঠাইতেন। তাঁহার গৃহে রক্ষিত রামানন্দের ৪২।৪৩ বৎসর পূর্ব্বেকার চিঠি উদ্ধৃত করিলে বুঝা যাইবে তিনি কতটা সব দিক দেখিয়া বিচার করিতেন।"

(পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি)

৩০নভেম্বর ১৯০৩

সবিনয় নিবেদন,

আপনাকে অনেক দিন পত্র লিখি নাই, আপনার সহিত সাক্ষাৎও নাই। বোধ হয় ৺কৃপায় আপনার কায়িক কুশল আছে। এ পক্ষের সকল কুশল জানিবেন।

একটা কথা বলিবার আছে। গত কল্যকার তারিখের ''রঙ্গালয়' পত্রে দুইটি প্যারা আছে, উহাতে বাঙ্গালী গ্রন্থকারের দায়িত্বের কথা তুলিয়া আপনার 'অশ্রুমতী'র কথাও লেখা আছে। ব্যাপার এই যে, ''রাজস্থান সমাচার" নামক হিন্দী কাগজে এবং সেই সঙ্গে "বেঙটেশ্বর সমাচার" প্রভৃতি

অন্য সকল হিন্দী কাগজে আপনার 'অশ্রুমতী'র কথা ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন চলিতেছে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে 'অশ্রুমতী'র অনুবাদ হইয়া উহার অভিনয়ও চলিতেছে। এই অভিনয় কারণ লোকের মনে অনায়াসেই বাঙ্গালী বিদ্বেষ যেন দৃঢ়ভূত হইতেছে। যে সকল হিন্দুস্থানী লেখক-বন্ধু বাঙ্গালীর পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে বলিতেছেন যে আপনি সোজা মহারাণা উদয়পুরকে পত্র লিখিয়া ত্রুটি স্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন যে ভবিষ্যতে নূতন সংস্করণ করিতে হইলে অশ্রুমতীর ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের আন্দোলনটা একেবারেই নিভিয়া যায়। উদয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজা ফতে সিং বাহাদুর বড়ই যোগ্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি আপনার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাইলে জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে শান্ত রাখিতে পারেন। রাজস্থানে একটা ক্ষত্রিয় সভা হইয়াছে। এই সভার সদস্য রাজওয়াড়ার সকল করদ ভূপতি; এই সভার প্রতাপও খুব। বাঙ্গালী বিরোধের আন্দোলনটা এই সভাই গ্রহণ করিয়াছে। তাই আশু কুফল ফলিবে বলিয়া আমার আশঙ্কা। রাজস্থানের বাঙ্গালী চাকুরেদের মধ্যেও এমন আশঙ্কা খুব হইয়াছে। আপনি বাঙ্গালীর শিরোমণি—বাঙ্গালা জাতির মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, বাঙ্গালী জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে আপনি নানাবিধ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, বিশেষ আমার আপনার উপর একটু আবদার চলে, তাই সাহস করিয়া এত লিখিতে পারিতেছি। সত্য বটে, নাটকের হিসাবে 'অশ্রুমতী'তে কোন দোষ নাই, সত্য বটে, নাটককারের সকল দেশেই যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতার আপনি কোথাও অপব্যয় করেন নাই, তথাপি যখন একটা অছিলা ধরিয়া দুষ্ট·······লেখকগণ বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিষম বিদ্বেষের উদ্গার করিতেছে, তখন একটু সাবধান হইলে, একটু নরম হইলে বাঙ্গালীরই পক্ষে শ্লাঘার কথা হইবে, জানিবেন। আমি শুনিলাম যে, পূর্ব্বে আপনি উদয়-পুরের কোন এজেন্টের নিকট স্বীকার পাইয়াছিলেন যে 'অশ্রুমতী'র নূতন সংস্করণে আপনি ভাব বদলাইয়া দিবেন। বোধ হয় হিন্দী 'বঙ্গবাসী'তে ও 'ভারতমিত্রে' একথা প্রকাশিতও হইয়াছিল। যদি আমার খবর ঠিক হয়, তাহা হইলে এমন অনুমান করা আমার পক্ষে অন্যায় হইবে না যে, 'আপনি মহারাজা বাহাদুরের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া পত্র লিখিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। একখানি চিঠিতে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ভাষায় রাণা প্রতাপ-

বংশাবতংস বর্ত্তমান মহারাণা ফতেহ সিংহ মহোদয়ের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতে বোধ হয় আপনার সঙ্কোচ বোধ হইবে না। বিশেষ যখন এইরূপ করিলে একটি প্রবল জাতি ও সম্প্রদায়ের amour propre পুষ্টি হইবে এবং বাঙ্গালী জাতির সদ্ভাবের সূচনা করা হইবে, তখন আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি এ ব্যাপারে সঙ্কোচ করিতেই পারেন না।

মহারাণা বাহাদুরকে সরাসরি আপনি পত্র লিখিলে হয়ত তাঁহার হস্তগত না হইতে পারে। আপনি যদি ত্রুটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হ'ন ত আমাকে বলিবেন। আমি যোগ্য লোকের দ্বারা আপনার পত্র খোলা দরবারে মহারাণার হস্তগত করাইয়া দিতে পারিব এবং যাহাতে আপনার মর্য্যাদা অনুসারে রাণা দরবার হইতে পত্রোত্তর ও অভিবাদন আপনার হস্তগত হয় সে পক্ষেও যথেষ্ট চেষ্টা করিব। আপনি জানিবেন যে ত্রুটি স্বীকার করিলে হিন্দুস্থানী সমাজে তথা মহারাণার দরবারে আপনার মান-সম্ভ্রম বৃদ্ধিই পাইবে। আমি সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছি। যদি বাঙ্গালী বুধমণ্ডলীর পক্ষ হইতেও এই ব্যাপার লইয়া মহারাণার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করা হয় তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির প্রতিষ্ঠা রাজস্থানে বাড়িয়াই যাইবে।

আমার পত্রের উত্তর দিবেন। যদি প্রয়োজন মনে করেন ত আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা কহিতে পারি। অনেক দিন দেখা-শুনা নাই, একবার দেখা করিলেও কোন অ-লাভ নাই। ইতি
১৪ অগ্রহায়ণ ১৩১০

অনুগত

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায

[১৩২৩ সালের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে কিছুকাল দৈনিক হিন্দী 'ভারতমিত্রে'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কথামত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহারাণা ফতেসিং এর উদ্দেশ্যে ইংরেজীতে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি এই মর্মে আশ্বাস দেন যে যদি অনবধানতাবশত ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের মনে ব্যথা দিয়ে থাকেন তাহলে তা দূর করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করবেন।

(প্রমথ চৌধুরীর চিঠি)

মোরাবাদি, রাঁচি
৮।১১।৩১

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। তোমাদের কাছ থেকে যে দু'চারখানি চিঠি পেয়েছি সেগুলি সবই আমার ভালো লেগেছে তার কারণ তোমাদের চিঠি সব সহজভাবে লেখা। অনেকের দেখতে পাই—চিঠি লিখতে বসলেই লিখতে বসেন—অর্থাৎ তার ভিতর কতকটা সাহিত্য পুরে দিতে চান, তাতে অবশ্য তাঁদের চিঠিগুলো প্রবন্ধের ছোট ভাই হয়ে ওঠে। এ দোষ যে আমার নেই, তা বল্‌তে পারিনে।

লেখার আর্ট সম্বন্ধে আমি যত বক্তৃতা করেছি বাঙ্গলা দেশের কোন লেখকই বোধহয় ততটা করেন নি। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের আমার ওপর চটবার এও একটা কারণ। কেননা আমার ওসব কথা পড়ে লোকের এ মনে হওয়া আশ্চ। নয় যে আমি দেশসুদ্ধ লোককে লেখা শেখাতে বসেছি, যেন আর কেউ লিখতে জানেন না ; কাজেই তাঁরা বলেন, বীরবলের লেখা "কাপিবুক" স্বরূপ তাঁরা গ্রহণ করতে রাজী নন্, ও লেখার উপর মক্স করলে তাঁদের হাতের লেখা খারাপ হয়ে যাবে! এ কথাটি ঠিক। একজনের লেখা আর একজন যদি অক্ষরে অক্ষরে নকলও করতে পারেন—.হলে সে লেখা নকলই হবে, আসল জিনিষ হবে না। আর জাল আদালতে সব সময় ধরা না পড়লে সাহিত্যে ধরা পড়েই পড়ে।

আমি আর্ট জিনিষটের উপর এত ঝোঁক দিই কেন বল্‌ছি। শুধু সাহিত্য নয়—সব বিষয়েই আমি আমাদের জাতের অমনোযোগের পরিচয় নিত্যই পাই—বাঙ্গালীর মনটা একেবারে ঢিলে হয়ে গিয়েছে, কোন বিষয়কেই সে-মন একালে চেপে ধরতে এঁটে ধরতে পারে না। আমি এই ঢিলেমীর বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই প্রতিবাদ করি। আমার সংগীত সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে technique সম্বন্ধে যা লিখেছি সেটি একটু মন দিয়ে পড়ে দেখো, তার থেকেই আমার মনোভাব স্পষ্ট করে জানতে পারবে। গান গাইতে হলে গলা ও মনকে, ছবি আঁকতে হলে হাত ও মনকে যেমন এক করে আনা চাই—লিখতে হলে

তেমনি ভাব ও ভাষাকে এককরে আনা চাই। এর জন্যে সাধনা আবশ্যক। হিন্দুমতে গুরু কেবল ভেদ বাৎলে দিতে পারেন, সাধনা সাধককেই করতে হবে। তবে ধর্মের চাইতে সাহিত্যের শিক্ষা দেওয়া ঢের বেশি শক্ত; কেননাধর্মগুরু সকলকে নিজের পথে চালাতে চান—কিন্তু সাহিত্য-গুরু যদি ওরকম কোন লোক থাকেন সকলকে নিজ নিজ পথে চলতে বলেন। তাঁর হাতের গোড়ায় এমন কোনও সাধন-পদ্ধতি নেই যা সকলেই অবলম্বন করে সফল হতে পারে। যারা সাহিত্যের পথে কতকটা অগ্রসর হয়েছে তারা সে পথের নূতন পথিকদের এই পর্যন্ত বলতে পারে যে—এ পথ যুগপৎ, সহজ ও কঠিন—এই কথাটি মনে রেখে চলো। এ পথ সহজ কেন না, নিজের পথে স্বভাবই মানুষকে এ পথে নিয়ে যায়, আর এ পথ কঠিন; কেন না, সাহিত্যপন্থীদের পক্ষে নিজের স্বভাবকে ফুটিয়ে তোলা দরকার। যিনি এই ফুটিয়ে তোলার দিকে যতটা মন দেবেন—যতটা যত্ন করবেন, তিনিই প্রমাণ পাবেন যে দিনের পর দিন তাঁর স্বভাবেরও পাপড়ির পর পাপড়ি খুলে যাচ্ছে। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য যে beneath contempt, তার কারণ বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরা নিজের স্বভাবের বিশেষত্বের পরিচয় পর্যন্ত নেন না, সে স্বভাবকে ফুটিয়ে তোলা ত দূরে থাক্। তাঁরা সকলেই সামাজিক মনোভাব প্রকাশ করতে চান্। এঁরা ভুলে যান যে, যা সকলের মত তা কারও মত নয়, আর আজকে যাকে সামাজিক মত বলছ—গতকাল সে একজন মাত্রের মত ছিল। দেখতে পাচ্ছি চিঠিটি ক্রমেই বক্তৃতার মত হয়ে উঠছে সুতরাং এইখানেই থামা দরকার।

কিরণশঙ্কর Presidency College-এর History-র Professor হয়েছে শুনে সুখী হলুম। ওর লেখবার সখও আছে, হাতও আছে, ব্যারিষ্টার হয়ে এলে—খুব সম্ভবতঃ ও সাহিত্যের দিকে পিঠ ফেরাত। এই কাজে যদি লেগে থাকে তাহলে কিরন সাহিত্যচর্চা করবার সুযোগ ও অবসর দুই পাবে। আমি ব্যারিষ্টারিতে ফেল করেই সাহিত্যে পাশ করেছি। ব্যারিষ্টারিতে পাশ করতে হলে সাহিত্য ত্যাগ করতে হয়; সুতরাং ভয় হয়—কেন না ও স্থান হচ্ছে মনের যমের বাড়ী।

আমার ভাইয়ের খবর আমি এখানে আসবার দিন পেয়েছি। খবর সব ভাল।

আমি ১৪ই এখান থেকে বেরিয়ে ১৫ই কলকাতায় পৌছব। তারপর আবার সেই আফিস কলেজের ঘানি ঘোরাব। তাতে আমার আপত্তি নেই,

দুঃখ শুধু এই যে বুঝতে পারছিনে যে ঐ পরিশ্রম করে যে তেল ভাঙ্গছি তা আমাদের জাতের চরকায় দেওয়া চলবে কিনা।

ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

[১৩৬১ সালের মাসিক বসুমতীর বৈশাখ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]
চিঠিটি সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা।

(অবনীন্দ্রনাথের চিঠি)

Tagore Studio
5, Dwarkanath Tagore Lane
Calcutta
রবিবার ১৯১৩

কল্যাণীয়া স্বরূপা,

তোর চিঠিতে সব খবর পেয়ে নিশ্চিন্তি হলেম। যতই লোভ দেখাও এখন কলকাতা ছেড়ে কোথাও নড়ছিনে—বেশ লাগছে কলকাতা, আহা এমন স্থান কি আর আছে! কোথায় লাগে তোদের ঘাটশীলা—আহা, এই সহরের বাড়ি-ঘেরা দৃশ্য কি চমৎকার! সকালে একটু একটু কুয়াসার মধ্যে দিয়ে বাড়িগুলোর উপর দেখছি রোদ আর ছায়া পড়েছে, দেখাচ্ছে ঠিক যেন পর্বতের গায়ে আলোছায়ার ঝরণা ঝরছে। মাঝে মাঝে একটা চিমনি ধূয়া ছাড়ে আর মনে হয় যেন বনের মধ্যে কারা চড়ুই ভাতি খেতে বসেছে—রান্নার গন্ধ পর্যন্ত নাকে আসে! তার উপর এখন আবার ছট্‌পূজো লেগেছে সিংঘীর বাগানে—সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত চমৎকার সুরে চারিদিকে মাদোল ঢাক ঢোলের সঙ্গে মেয়েরা গান জুড়ে দিয়েছে, ওধারে কোথায় একটা নূতন বাড়ি হচ্ছে—মজুররা ছাত পিটছে তালে তালে দুপ দুপ, মনে হয় ঠিক যেন কাঠঠোক্‌রা ডাকছে কুব কুব। থেকে থেকে মোটরগাড়ি

ভোঁ, সেও সুরে বেজে যাচ্ছে রামশিঙে। একদল পায়রা ছাতে—নীল আকাশের গায়ে কালো দিয়ে লেখা—চুপ করে বসে থাকতে থাকতে অকারণে ঝাঁক বেঁধে উড়ে পড়লো আবার একটা পথ হারিয়ে এসে বসলো আমাদের কার্ণিশে রোদ পোহাতে, কি সুন্দর। ঠিক যেন কাঁচ পোকার সাড়ি পরে টুনুদিদি বসে আছেন। বারাণ্ডার উপরে রোদ পড়েছে এলিয়ে, একদল চড়াই তারি উপর চেঁচামেচি ডিগবাজি-খেলা জুড়েই হঠাৎ পালালো, দেখি জলি কুকুর প্রবেশ করেছেন পায়ে পায়ে। বাগানে লট্‌কান গাছে ফুল ধরেছে, তারি মধু খেতে একটা প্রজাপতি সকালে দুপুরে ঘুরঘুর করছে। ফুলগুলো লাল জামা পরা টুনুদিদির খোকাটির মতো গুটিসুটি রোদে ঘুম যাচ্ছে। কাগডিমি আকাশে সন্ধ্যাবেলা ফানুস্ ওঠে, কোনটা মানুষ, কোনটা হাতি, কোনটা কিম্ভূতকিমাকার গোলাকার! রাতে রেডিওতে দূরে খবর আসে আর তারপর বাদশা মশায় কাসেন, কাঁদেন, ঘুমিযে ঘুমিযে স্বপ্ন দেখেন নিশ্চয়, কিন্তু সকালে সব ভুলে যান্, বলতে পারেন না।

* * ইতি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে ; মাসিক বসুমতীর ১৩৬১ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'অবনীন্দ্রচরিতম্' থেকে উদ্ধৃত]

অবনীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দার কথাপ্রসঙ্গে শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর তাঁর 'অবনীন্দ্রচরিতম্'-এ লিখেছেন, "এই বারান্দাটি গুরুদেবের কাছে ছিল সবচেয়ে প্রিয়, ছিল তাঁর নিষ্ঠার নীড়, ছিল অবন পটুয়ার খেয়ালের কারখানা, নাম দিয়েছিলেন Tagore Studio। বেলঘরিযার "গুপ্তনিবাসে"ও গুরুদেবকে দেখেছি আর একটি দক্ষিণের বারান্দায়। কিন্তু সেই পরস্মৈপদী বারান্দায় শান্তি পাননি তিনি। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরূপা দেবীকে লেখা এই পত্রখানি পড়লেই অবসন্ন হবে তাঁর অলিন্দ-প্রীতির কাহিনী।"

(শ্রীঅরবিন্দের চিঠি)

১

30th August, 1905

প্রিয়তমা মৃণালিনি,

তোমার ২৪ এ আগষ্টের পত্র পাইলাম। তোমার বাপ-মা'র আবার সেই দুঃখ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কোন ছেলেটি পরলোক গিয়াছে, তাহা তুমি লিখ নাই। দুঃখ হলে বা কি হয়। সংসারে সুখের অন্বেষণে গেলেই সেই সুখের মধ্যেই দুঃখ দেখা যায়, দুঃখ সর্ব্বদা সুখকে জড়াইয়া থাকে, এই নিয়ম যে পুত্র কামনার সম্বন্ধেই ঘটে তাহা নহে, সব সাংসারিক কামনার ফল এই। ধীর চিত্তে সব সুখদুঃখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র উপায়।

আমি কুড়ি টাকা না পড়িয়া দশ টাকা পড়িয়াছিলাম, তাই দশ টাকা পাঠাইব বলিয়াছিলাম, পনের টাকা যদি দরকার পনের টাকাই পাঠাইব। এই মাসে সরোজিনী তোমার জন্য দার্জ্জিলিংএ কাপড় কিনিয়াছে, তার টাকা পাঠাইয়াছি। তুমি যে এই দিকে ধার করিয়া বসেছ, তাহা কি করিয়া জানিব। পনের টাকা লেগেছিল, পাঠাইয়াছি, আর তিন চার টাকা লাগিবে, তাহা আগামী মাসে পাঠাইব। তোমাকে এইবার কুড়ি টাকা পাঠাইব।

এখন সেই কথাটি বলি। তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক, অসাধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান মহাপুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেষ্টা সফল হয়, সহস্র লোকের মধ্যে দশজন অসাধারণ, সেই দশ জনের মধ্যে একজন কৃতকার্য্য হয়। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ স্ত্রীজাতির সব আশা সাংসারিক সুখ-দুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তাহার স্ত্রীকে সুখ দিবেনা, দুঃখই দেয়!

হিন্দুধর্ম্মের প্রণেতৃগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অসামান্য চরিত্র, চেষ্টা ও আশাকে বড় ভালবাসিতেন, পাগল হোক, বা মহাপুরুষ হোক, অসাধারণ লোককে বড় মানিতেন, কিন্তু এ সকলের স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা হয়, তাহার কি উপায় হইবে? ঋষিগণ এই উপায় ঠিক করিলেন, তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে বলিলেন, তোমরা অদ্য হইতে পতিঃ পরমো গুরুঃ, এই মন্ত্রই স্ত্রীজাতির একমাত্র মন্ত্র বুঝিবে। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, তিনি যে-কার্য্যই স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে, উৎসাহ দিবে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া জানিবে, তাঁহারাই সুখে সুখ, তাঁহারই দুঃখে দুঃখ করিবে। কার্য্য নির্ব্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার।

এখন কথাটি এই, তুমি হিন্দুধর্ম্মের পথ ধরিবে, না নূতন সভ্যধর্ম্মের পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ করিয়াছ সে তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচজনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিযা উড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগলামীর পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার ওর স্বভাবই বলবান, তবে তুমি কি কোণে বসিযা কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধ রাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন। হাজার ব্রাহ্ম স্কুলে পড়িয়া থাক তবু তুমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্ব্ব পুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে।

আমার তিনটি পাগলামী আছে, প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরৎ দেওযা উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না সে চোর। এপর্যন্ত ভগবানকে দুই আনা দিয়া চোদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া হিসাবটা চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত্ত রহিয়াছি। জীবনের অর্দ্ধাংশটা বৃথা গেল, পশুও নিজের ও নিজের পরিবারের উদর পূরিয়া কৃতার্থ হয।

আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি ইহা বুঝিলাম। বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম। ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা। যে টাকা সরোজিনী বা উষাকে দিয়াছি তার জন্য কোন অনুতাপ নাই, পরোপকার ধর্ম্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা মহাধর্ম্ম, কিন্তু শুধু ভাই-বোনকে দিলে হিসাবটা চোকে না। এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটি ভাইবোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়।

কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিণী হইবে? কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া যাহা সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব; এই আমার ইচ্ছা, তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। তুমি বলছিলে 'আমার কোন উন্নতি হল না' এই উন্নতির একটা পথ দেখাইয়া দিলাম, সে পথে যাইবে কি?

দ্বিতীয় পাগলামী সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে, পাগলামীটা এই, যে কোন মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতেই হইবে, আজকালকার ধর্ম্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্ম্মিক! তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্ম বলে, নিজের শরীরের, নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কারণ তোমার অত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমার পিছনে-পিছনে আসিতে কোন বাধা নাই, সেই পথে সিদ্ধি সকলের হইতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কেহ তোমাকে ধরিয়া নিয়া যাইতে পারিবে না, যদি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব।

তৃতীয় পাগলামী এই, যে অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা

মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্ম তেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল। তুমি ন-মাসির কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলে, কোথাকার বদ্‌লোক আমার সরল ভাল মানুষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইযাছে। তোমার ভাল মানুষ স্বামীই কিন্তু সেই লোককে ও আর শতশত লোককে সেই পথে, কুপথ হোক বা সুপথ হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহস্র সহস্র লোককে প্রবেশ করাইবেন। কার্য্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চযই।

এখন বলি, তুমি এ বিষয়ে কি করিতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি, তুমি উষার শিষ্য হইয়া সাহেব-পূজা-মন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হইযা স্বামীর শক্তি খর্ব্ব করিবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে? তুমি বলিবে, এই সব মহৎ কর্ম্মে আমার মত সামান্য মেয়ে কি করিতে পারে, আমার মনের বল নাই, বুদ্ধি নাই, ওই সব কথা ভাবিতে ভয় করে। তাহার সহজ উপায আছে, ভগবানের আশ্রয় নাও, ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে একবার প্রবেশ কর, তোমার যে যে অভাব আছে তিনি শীঘ্র পূরণ করিবেন, যে ভগবানের নিকট আশ্রয় লইয়াছে, ভয় তাহাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দেয়। আর আমার উপর যদি বিশ্বাস করিতে পার, দশ জনের কথা না শুনিয়া আমারই কথা যদি শোন, আমি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি। তাহাতে আমার বলের হানি না হইয়া বৃদ্ধি হইবে, আমরা বলি স্ত্রী স্বামীর শক্তি, মানে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্খার প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে।

চিরদিন কি এইভাবে থাকিবে, আমি ভাল কাপড় পরিব, ভাল আহার

করিব, হাসিব নাচিব, যতরকম সুখ ভোগ করিব, এই মনের অবস্থাকে উন্নতি বলা চলে না। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েদের জীবন এই সঙ্কীর্ণ ও অতি হেয় আকার ধারণ করিয়াছে। তুমি এই সব ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এস, জগতে ভগবানের কাজ করিতে আসিয়াছি, সেই কাজ আরম্ভ করি।

তোমার স্বভাবের একটা দোষ আছে, তুমি অতিমাত্র সরল। যে যাহা বলে তাহাই শোন। ইহাতে মন চিরকাল অস্থির থাকে, বুদ্ধি বিকাশ পায় না, কোন কর্ম্মে একাগ্রতা হয় না। এটা শোধরাতে হইবে, একজনেরই কথা শুনিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, লোকের নিন্দা ও বিদ্রূপকে তুচ্ছ করিয়া স্থির ভক্তি রাখিতে হইবে।

আর একটা দোষ আছে, তোমার স্বভাবের নয়, কালের দোষ। বঙ্গদেশে কাল অমনতর হইয়াছে। লোকে গম্ভীর কথাও গম্ভীর ভাবে শুনিতে পারে না ; ধর্ম্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্খা, মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, যাহা গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিযে হাসি ও বিদ্রূপ ; সবই হাসিযা উড়াইতে চায়, ব্রাহ্মস্কুলে থেকে তোমার এই দোষ একটু একটু হইয়াছে, বারিরও ছিল, অল্প পরিমাণে আমরা সকলেই এই দোষে দূষিত, দেওঘরের লোকের মধ্যেও আশ্চর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মনের ভাব দৃঢ় মনে তাড়াইতে হয়, তুমি তাহা সহজে পারিবে, আর একবার চিন্তা করিবার অভ্যাস করিলে তোমার আসল স্বভাব ফুটিবে, পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের দিকে তোমার টান আছে, কেবলি একমনের জোরের অভাব, ঈশ্বর উপাসনায় সেই জোর পাইবে।

এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কথা, কারুর কাছে প্রকাশ না করিয়া নিজের মনে ধীর চিত্তে এই সব চিন্তা কর, এতে ভয় করিবার কিছু নাই, তবে চিন্তা করিবার অনেক জিনিষ আছে। প্রথমে আর কিছু করিতে হইবে না, কেবল রোজ আধ ঘণ্টা ভগবানকে ধ্যান করিতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয। মন ক্রমে ক্রমে তৈয়ারি হইবে। তাঁর কাছে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতে হয, আমি যেন স্বামীর জীবনউদ্দেশ্য ও ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করিযা সর্ব্বদা সহায হই, সাধনভূত হই। এটা করিবে ?

তোমার ·····

[শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে 'অরবিন্দের পত্রাবলী' থেকে উদ্ধৃত]

সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের গোপন চিঠি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রে ষ্ট্রীটে তাঁর বাসা তল্লাসীর সময় পাওয়া যায়। আলিপুরের প্রসিদ্ধ বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দকে মজঃফরপুরের বোমার গুপ্তচক্রের প্রবীন বিপ্লবী নেতা প্রতিপন্ন করার জন্যে সরকারী কৌঁসলী মিঃ নর্টন এই চিঠিগুলি আদালতে প্রকাশ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই মামলায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি অসামান্য আইন জ্ঞান এবং তর্কশক্তিবলে মিঃ নর্টনের চাল উল্টে দিয়ে প্রমাণ করেন যে অরবিন্দের সঙ্গে গুপ্ত বিপ্লবীদলের কোন সম্পর্ক ছিল না। ভারতীয় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই চিঠিগুলির এক অপূর্ব ভাষ্য করেন। এর পর বিচারকেরা শ্রীঅরবিন্দকে নির্দোষ বলে মুক্তি দেন।

২

৭ই এপ্রিল, ১৯২০

স্নেহের বারীন,

তোমার চিঠি পেয়েছি, এপর্য্যন্ত উত্তর লেখা হয়ে উঠেনি। এই যে লিখতে বসেছি, সেটাও একটা miracle (আশ্চর্য্য কাণ্ড) কেন না আমার পত্র লেখা হয় once in a blue moon (ক্ষুদে মঙ্গলবারে একবার) বিশেষ বাংলায় লেখা, যা এই পাঁচসাত বৎসর একবারও করিনি। শেষ ক'রে যদি Post-এ (ডাকে) দিতে পারি তা হ'লেই miracle (অসাধ্যসাধনটা) সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম, তোমার যোগের কথা। তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও, আমিও নিতে রাজী। তার অর্থ, যিনি আমাকে, তোমাকে প্রকাশ্যেই হোক, গোপনেই হোক, তাঁর ভগবতী শক্তি দ্বারা চালাচ্ছেন, তাঁকেই দেওয়া। তবে এর এই ফল অবশ্যম্ভাবী জানবে যে, তাঁহারই দত্ত আমার যোগপন্থা—যাকে পূর্ণ যোগ বলি—সেই পন্থায় চলতে হবে। ... .যা নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, জেলে যা দিয়েছিলেন.........সেটি ছিল পথ খোঁজার অবস্থা, এদিক-ওদিক ঘুরে দেখা পুরাতন সকল খণ্ডযোগের এটি ওটি ছোঁয়া, তোলা, হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা, এটির একরকম পুরো অনুভূতি পেয়ে ওটির পিছনে যাওয়া।

তারপর পণ্ডিচেরীতে এসে সেই চঞ্চল অবস্থা কেটে গেল। অন্তর্য্যামী জগৎগুরু আমার পন্থার পূর্ণ নির্দ্দেশ দিলেন। তার সম্পূর্ণ theory (তত্ত্ব)

যোগ শরীরের দশ অঙ্গ, এই দশ বৎসর ধরে তারই development (বিকাশ) করাচ্ছেন অনুভূতিতে, এখনও শেষ হয়নি, আরও দুই বৎসর লাগতে পারে।

যোগপন্থাটি কি, তাহা পরে লিখবো, অথবা তুমি এখানে এস, তখনই সেই কথা হবে। এবিষয়ে লেখা কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল। এখন এইমাত্র বলতে পারি যে, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণকর্ম্ম ও পূর্ণভক্তির সামঞ্জস্য ও ঐক্যকে মানসিক ভূমির (level) উপরে তুলে মনের অতীত বিজ্ঞানভূমিতে পূর্ণ সিদ্ধ করা হচ্ছে তার মূল তত্ত্ব। পুরাতন যোগের দোষ এই ছিল যে, সে মন বুদ্ধিকে জানত আর আত্মাকে জানত। মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ত্ব করতে পারে, অনন্ত অখণ্ডকে সম্পূর্ণ ধরতে পারেনা, ধরতে হলে সমাধি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ ইত্যাদিই মনের উপায়, আর উপায় নেই। সেই লক্ষ্যহীন মোক্ষলাভ এক একজন করতে পারেন বটে, কিন্তু লাভ কি? ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত আছেনই। ভগবান মানুষে যা চান, সেটি হচ্ছে তাঁকে এখানেই মূর্ত্তিমান করা, ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে—to realise God in life (জীবন-ক্ষেত্রে ভগবানকে মূর্ত্ত করা)।

পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য বা ঐক্য করতে পারেনি। জগৎকে মায়া বা অনিত্য লীলা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফল হয়েছে জীবনী-শক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি; গীতায় যা বলা হয়েছে, "উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্" ভারতের "ইমে লোকাঃ" সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। কয়েকজন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কযেকজন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে, আর ... ও জাতি প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্মসিদ্ধি? আগে মানসিক level-এ (ভিত্তিতে) যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্ম রসাপ্লুত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত করতে হয়, তার পর উপরে উঠা। উপরে অর্থাৎ বিজ্ঞানভূমিতে না উঠলে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব, জগতের সমস্যা solved (মীমাংসা) হয় না। সেইখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন—এই দ্বন্দের অবিদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখতে হয় না; জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। তখন ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয়, গীতায় যাকে বলে "সমগ্রং মাং জ্ঞাতুম্।" অন্নময় দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, আনন্দ এই হল আত্মার পাচটি ভূমি। যতই উঁচুতে উঠি, মানুষের spiritual evolution-এর

(আধ্যাত্মিক বিকাশের) চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয়; শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয়—দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সত্ত্বা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হয়ে জীবনে মূর্ত্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগপন্থার central clue (মূল কথা)।

এরূপ হওয়া সহজ নয়। এই পনের বৎসরের পরে আমি এই মাত্র বিজ্ঞানের তিনটি স্তরের নিম্নতর স্তরে উঠে নীচের সকল বৃত্তি তার মধ্যে টেনে তোলবার উদ্যোগে আছি, তবে এই সব সিদ্ধি যখন পূর্ণ হবে, তখন ভগবান আমার through (মধ্য) দিয়ে অপরকে অল্প আয়াসে বিজ্ঞানসিদ্ধি দেবেন, এর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে। আমি কর্ম্মসিদ্ধির জন্য অধীর নই। যা হবার ভগবানের নির্দ্দিষ্ট সময়ে হবে, উন্মত্তের মত ছুটে ক্ষুদ্র অহংয়ের শক্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাপ দিতে প্রবৃত্তি নেই। যদি কর্ম্মসিদ্ধি না-ও হয়, আমি ধৈর্য্যচ্যুত হব না; এ কর্ম্ম আমার নয়, ভগবানের। আমি আর কারুর ডাক শুনব না; ভগবান যখন চালাবেন, তখন চলব।

ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠা—আত্মার ঐক্যের মূর্ত্তি-সংঘ চাই। এই idea বা ভাবকে নিয়েই দেবসংঘ নাম দেওয়া হয়েছে—যারা দেবজীবন চায় তাদেরই সংঘ দেবসংঘ। সেইরূপ সংঘ এক জায়গায় স্থাপন করে পরে দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। এইরূপ চেষ্টার উপর অহংয়ের ছায়া যদি পড়ে সংঘ দলে পরিণত হয়। এই ধারণা সহজে হ'তে পারে, যে (শুদ্ধ) সংঘ শেষে দেখা দেবে এটিই তাই; (যেন) সব হবে এই একমাত্র কেন্দ্রের পরিধি; যারা এর বাহিরে তারা ভেতরকার লোক নয়, (অথবা ভেতরকার) হলেও তারা ভ্রান্ত, আমাদের যে বর্ত্তমান ভাব তার সঙ্গে মেলে না বলেই (যেন ভ্রান্ত)।

তুমি হয়ত বলবে সংঘের কি দরকার? মুক্ত হয়ে সর্ব্বঘটে থাকব. সব একাকার হয়ে যাক, সেই বৃহৎ একাকারের মধ্যেই যা হয়। সে সত্যি কথা; কিন্তু (তা হচ্ছে) সত্যের একটি দিক মাত্র। আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে; আবার মুক্তি ভিন্ন জীবনের effective (কার্য্যকরী) গতি নেই। অরূপ যে মূর্ত্ত হয়েছে সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার খামখেয়ালি নয়; রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলেই রূপ গ্রহণ, আমরা জগতের কোনও কাজে বাধা দিতে চাই না; রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ,

কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে; এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।

রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিষ নয় বলে, বিলাতী আমদানী, বিলাতী ঢং-এর অনুকরণ মাত্র। তবে তারও দরকার ছিল। আমরাও বিলাতী ধরণের রাজনীতি করেছি; না করলে দেশ উঠতো না, আমাদের experience (অভিজ্ঞতা) লাভও পূর্ণ development (বিকাশ) হতো না। এখনও তার দরকার আছে, বঙ্গদেশে তত নাই, যেমন ভারতের অন্য প্রদেশে। কিন্তু এখন সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরবার; ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম্ম তারই অনুরূপ করা চাই।

লোকে এখন রাজনীতিকে spiritualise (অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত) করতে চায়⋯ ⋯তার ফল হবে, যদি কোন স্থায়ী ফল হয়, একরকম Indianised Bolshevism (ভারতীয় বলসেভিজম্) সে রকম কর্ম্মেও আমার আপত্তি নেই, যাঁর যে প্রেরণা, তিনি তাই করুন। তবে এটা আসল বস্তু নয়, অশুদ্ধরূপে Spiritual (অধ্যাত্ম) শক্তি ঢাললে—কাঁচা ঘটে কারণোদধির জল—হয় ঐ কাঁচা জিনিষটা ভেঙ্গে যাবে, জল ছড়িয়ে নষ্ট হবে, নয় অধ্যাত্ম শক্তি evaporate করে (লুপ্ত হয়ে) সেই অশুদ্ধ রূপই থাকবে; সর্ব্বক্ষেত্রেই তাই। Spiritual influence (অধ্যাত্ম প্রেরণা) দিতে পারি, তবে সেই শক্তি expended (খরচ) হবে শিব-মন্দিরে বানরের মূর্ত্তি স্থাপন করতে। বানরটি প্রাণপ্রতিষ্ঠায় শক্তিমান হয়ে ভক্ত হনুমান সেজে রাম। অনেক কাজ হয়ত করবে, যতদিন সেই শক্তি থাকবে। আমরা কিন্তু ভারত-মন্দিরে সেই হনুমান নয়—দেবতা, অবতার, স্বয়ং রাম।

সকলের সঙ্গে মিলতে পারি—কিন্তু সমস্তকে প্রকৃত পথে টানবার জন্য আমাদের আদর্শের spirit (ভাব) ও রূপকে অক্ষুণ্ণ রেখে। তা না করলে দিশেহারা হব। প্রকৃত কর্ম্ম হবে না। Individually (ব্যক্তিগতভাবে) সর্ব্বত্র থেকে কিছু হবে বটে, সংঘরূপে সর্ব্বত্র তার শতগুণ হয়। তবে এখনও সে সময় আসেনি। তাড়াতাড়ি রূপ দিতে গেলে ঠিক যা চাই তা হবে না। সংঘ হবে প্রথম চড়ান রূপ; যার আদর্শ পেয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে, নানা স্থানে কাজ করবে; পরে Spiritual Commune-এর (অধ্যাত্ম সংঘ) মত রূপ দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সব কর্ম্মকে আত্মানুরূপ, যোগানুরূপ আকৃতি দেবে। শত

বাধা রূপ নয, অচলায়তন নয ; স্বাধীন রূপ, সমুদ্রের মত যা ছড়িয়ে যেতে পারে, নানা ভঙ্গী লযে এটিকে ঘিরে, ওটিকে প্লাবিত করে, সবকে আত্মস্থাৎ করবে ; করতে করতে Spiritual Community (দেবজাতি) দাঁড়াবে। এইটি হচ্ছে আমার বর্ত্তমান idea (ভাব), এখনও পুরো developed হযনি। সবটা ভগবানের হাতে, তিনি যা করান।

তারপর তোমার পত্রের কয়েকটি বিশেষ কথার আলোচনা করি। তোমার যোগের সম্বন্ধে যা লিখেছ, সে সম্বন্ধে এই পত্রে বিশেষ কিছু লিখতে চাই না, দেখা হলে সুবিধা হবে। দেহকে শব-দেখা সন্ন্যাসের নির্ব্বাণ, পথের লক্ষণ, এই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না, সর্ব্ব বস্তুতে আনন্দ চাই—যেমন আত্মায তেমনি দেহে। দেহ চৈতন্যময়, দেহ ভগবানের রূপ। জগতে যা আছে তাতে ভগবানকে দেখলে "সর্ব্বমিদম্ ব্রহ্ম—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" এই দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয। শরীরেও সেই আনন্দের মূর্ত্ত তরঙ্গ ছোটে, এই অবস্থায় অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার, বিবাহ সবই করা যায়, সকল কর্ম্মে পাওয়া যায় ভগবানের আনন্দময় বিকাশ। (আমি নিজের মধ্যে) অনেকদিন মানসিক ভূমিতে মনের ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয় ও অনুভূতি আনন্দময় করে তুলছি। এখন সেই সব বিজ্ঞানানন্দের supramental রূপ ধারণ করছে। এই অবস্থায়ই সচ্চিদানন্দের পূর্ণ দর্শন ও অনুভূতি।

দৈবসংঘের কথা বলে তুমি লিখেছ—"আমি দেবতা নই, অনেক পিটিয়ে শানান লোহা।"……দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, তাঁকেই প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে পারে। বড় আধার আছে মানি। তোমার নিজের সম্বন্ধে সে বর্ণনাকে আমি accurate (যথাযথ) বলে গ্রহণ করছি না। তবে যেরূপ আধারই হোক, একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হ'ন, তারপর বড় ছোট এ সবেতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বেশী বাধা হতে পারে, বেশী সময় লাগতে পারে, বিকাশের তারতম্য হতে পারে, তারও কিছু ঠিক নেই। ভিতরের দেবতা সে সব বাধা ন্যূনতার হিসাব রাখে না ; ঠেলে ওঠে। আমারও কি কম দোষ ছিল, মনের, চিত্তের, প্রাণের, দেহের কম বাধা ছিল ? সময় কি কম লাগে নি ? ভগবান কি কম পিটিয়েছেন ? দিনের পর দিন, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দেবতা হয়েছি বা কি হয়েছি জানিনা ; তবে কিছু হয়েছি বা হচ্ছি—ভগবান তা গড়তে চেয়েছেন তাই যথেষ্ট। সকলেই তা। আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তিই এই যোগের সাধক।

আমি যা অনেক দিন থেকে দেখে আসছি তার দু'একটা কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এ'ধারণা হয় যে, ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্ম্মবোধের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্ব্বত্রই দেখি inability or unwillingness to think (চিন্তা ক'রবার অক্ষমতা বা অনিচ্ছা) বা "চিন্তা-ফোবিয়া।" মধ্যযুগে যাইহোক, এখন কিন্তু এই ভাবটি ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তত তার শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ, দেখবে দুটি জিনিষ—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে ; সেই শক্তির বলে জগৎকে সে গ্রাস করতে পারছে ; আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাঁদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত। লোকে বলে, য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট—এ সব নবসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা।

তারপর ভারতে দেখ। কয়েকজন solitary giants (একক অতিকায় মহাপুরুষ) ছাড়া সর্ব্বত্রই সোজা মানুষ অর্থাৎ average man (সাধারণ গড়পড়তা মানুষ) যে চিন্তা করতে চায়না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায সরল চিন্তা, সোজা কথা ; য়ুরোপে চায গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্য কুলীমজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনেও সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে, য়ুরোপের শক্তি ও চিন্তার fatal limitation (অলংঘ্য সীমা) আছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি, nebulous metaphysics (কুহেলিকাময় তত্ত্বশাস্ত্র), Yogic hallucination (যোগজ মতিভ্রম) ; ধোঁযায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই limitation (সীমা) surmount (অতিক্রম) করবার য়ুরোপে কম চেষ্টা হচ্ছে না। আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণে ; আর যার সেই বোধ আছে, তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান, এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মত উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্য শক্তির (উপাসনা) দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই, সহজের উপাসক, সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিশাল চিন্তা-সমুদ্রে সাঁতার দিযে বিশাল জ্ঞান পেয়েছিলেন ;

বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তারা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, বাহ্য ধর্মের গোড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটি ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

বাঙ্গালা দেশেই এই দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা। বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের capacity (সামর্থ্য) আছে; intuition (অন্তর্জ্ঞান) আছে, এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এইগুলিই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীশক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তাহলে বাঙ্গালী ভারতে কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না, সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ; তারপর অবসাদ, তমোভাব। এদিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি, জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে, শেষে বাঙ্গালী নিজের দেশে কি হয়েছে—খেতে পাচ্ছেনা, পরবার কাপড় পাচ্ছেনা চারিদিকে হাহাকার, ধনদৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি, চাষ পর্য্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ করেছে। শক্তি-সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই সেখানে প্রেমও থাকেনা; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে; ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মনে-প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায়? বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এ দেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতে আর কোথাও তত নাই।

তুমি বলছ চাই ভাবোন্মাদনা; দেশকে মাতান। রাজনীতি ক্ষেত্রে ওসব করেছিলাম। স্বদেশী সময়ে যা করেছিলাম সব ধূলিস্মাৎ হয়েছে। অধ্যাত্ম-*ক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছিনা যে কোন ফল হয়নি। হয়েছে; যত movement (আন্দোলন) হয়, তার কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে,* তবে তা অধিকাংশই possibility (সম্ভাবনার) বৃদ্ধি; স্থির ভাবে actualise (বাস্তব রূপদান) করবার এটা ঠিক রীতি নয়। সেইজন্য আমি আর emotional excitement (প্রাণজ উত্তেজনা, আবেগমত্ততা) ভাব, মন মাতানকে base (প্রতিষ্ঠা) করতে চাই না। আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে

আমি চাই বিশাল বীরসমতা ; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ দৃঢ, অবিচলিত শক্তি, শক্তি-সমুদ্রে জ্ঞানসূর্য্যের রশ্মির বিস্তার ; সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ ঐক্যের স্থির ecstasy (তীব্র আনন্দ)। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ' ক্ষুদ্র-আমিত্ব-শূন্য পূরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই ; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভেতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবৎ-জীবন লাভ করে, এটাই আমিই চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।

এই lecture (বক্তৃতা) পড়ে একথা ভাববে না যে, আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ। ওঁরা যা বলেন যে, বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা করছি। তবে otherside of the shield (বিপরীত দিক) কোথায় দোষ, ত্রুটি ন্যূনতা তা দেখাবার চেষ্টা করেছি। এগুলি থাকলে সে জ্যোতি মহাজ্যোতিও হবেনা, স্থায়ীও হবেনা।

এই অসাধারণ লম্বা চিঠির তাৎপর্য্য এই যে, আমিও পুঁটলি বাঁধছি। তবে আমার বিশ্বাস যে, সে পুঁটলি St. Peterএর (খৃষ্টের প্রথম শিষ্য, খৃষ্টীয় স্বর্গের দ্বারী) চাদরের মত, অনন্তের যত শিকার তার মধ্যে গিজ গিজ করছে। এখন পুঁটলি খুলছি না, অসময়ে খুলতে গেলে শিকার পালাতে পারে। দেশেও এখন যাচ্ছিনা, দেশ তৈয়ারি হয়নি বলে নয়, আমি তৈয়ারি হইনি বলে। অপক্ক অপক্কের মধ্যে গিয়ে কি কাজ করতে পারে ?

ইতি

তোমার "সেজদা"

[শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে "অরবিন্দের পত্রাবলী" থেকে উদ্ধৃত। পত্রে বন্ধনীভুক্ত বাংলা প্রতিশব্দগুলি শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত।]

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের এই চিঠিটি অত্যন্ত মূল্যবান। এর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অন্তরের কথা ব্যক্ত করেছেন এবং রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করে কেন যে তিনি অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর যোগ সাধনের উদ্দেশ্যই ছিল দেশের কল্যাণ।

তাঁর মতে এই কল্যাণ সহজ সাধনায় নেই। সহজ সাধনায় আছে শুধু ভাবাতিশয্য। শক্তি সাধনা ত্যাগ করার ফলেই বাংলার এই দুর্গতি। তাই তিনি জ্ঞান ও শক্তির সাধনায় আত্মোৎসর্গ করতে চেয়েছেন। কেননা জ্ঞান ও শক্তি না থাকলে প্রেম সাধনাও ব্যর্থ।

(দেশবন্ধুর চিঠি)

ষ্টেপ্ এসাইড্
দার্জ্জিলিং
৯।৬।২৫

কল্যাণবরেষু—

তুমি বোধ হয় জান, স্বরাজ্যদলকে আমি অনেক টাকা ধার দিয়ে এসেছি। কিন্তু সে টাকা আমাকে শোধ করবার এখন ও দলের আর সাধ্য নাই। ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে আমার নিজ খরচের জন্য যা কিছু ছিল, প্রায় সবই স্বরাজ্য-দলের জন্য দেওয়ায়, এখন আমি একেবারে কপর্দ্দকহীন ; এবং এমনও অবস্থা হ'তে পারে যে আমার শরীর সারবার পূর্ব্বেই আমাকে এস্থান ছেড়ে কল্‌কাতা আস্‌তে হ'তে পারে। দুঃখ দেশের জন্য, কারণ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে আমার সমস্ত শক্তি, শ্রম ও সাধনা দেশের পক্ষে নিয়োজিত করা একান্ত আবশ্যক। আমার মনে হয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দই দেশের পক্ষে ভীষণ ভাগ্য-পরীক্ষার বৎসর। আমার শরীর এখনও সারে নাই। সামান্য উপকার হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রতি সপ্তাহেই—সোমবার একবার ক'রে জ্বর হয়। কাল যে জ্বর হয়েছে, তা এখনও সারেনি, আমি রোগশয্যায় শায়িতাবস্থায়ই তোমার কাছে চিঠি লিখছি। মহাত্মা আজ সকালে জলপাইগুড়ি রওনা হয়ে গেছেন। ভরসা করি তোমরা সব ভাল আছ, আর কাজকর্ম্মও বেশ চলেছে।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস

[শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত "দেশবন্ধু-স্মৃতি" নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

(শরৎচন্দ্রের চিঠি)

• ১

বাজে শিবপুর, হাওড়া
১৬-৮-১৯

পরমকল্যাণীয়েষু ;

অমল, 'ভারতী'র আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়াছে।[১] ইংরেজের মারমূর্ত্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল করে। এ একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর, কত পশু হতে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'ল।

আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নূতন করে পেলাম রবিবাবুকে[২]। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

'নারায়ণে'র সময় সি আর. দাশ একদিন আমায় বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কিনা বলুন।

তোমার কাগজের নামই শুনেছি—কখনও চোখে দেখিনি। পাঠিও না দু-একখানা। তোমার এডিটর[৩] এখন জেলে। চালাও জোর্‌সে! তোমার নাম ডাক এখান থেকে শুনেই আমরা খুশী হই। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।

ইতি-আশীর্ব্বাদক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীঅমল হোমের সৌজন্যে]

১। চিঠিখানি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে লেখা। শ্রীঅমল হোম তখন লাহোরের দৈনিক 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

২। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি গ্রহণ করেন আর জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তা ত্যাগ করেন।

৩। কালীনাথ রায় ছিলেন 'ট্রিবিউনে'র সম্পাদক।

২ বাজে শিবপুর, হাওড়া

৯ই আগষ্ট '২০

পরমকল্যাণীয়াসু,—

...আমার মানসিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন তুমি বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছ, এবং বহুদিন হইতেই আমি নীরবে আছি। কিন্তু আমার মত যখন তোমার বয়স হইবে, তখন হয়ত ইহা বুঝিতেও পারিবে যে জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ, এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।

ভীষ্ম যে একদিন স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন সে কথাটা চিরদিনের জন্য মহাভারতে লেখা হইয়া গেল, কিন্তু কত অলিখিত মহাভারতে যে এমন কত শরশয্যা নিত্যকাল ধরিয়া নিঃশব্দে রচিত হইয়া আসিতেছে তাহার একটি ছত্রও কোথাও বিদ্যমান নাই। এমনি করিয়াই সংসার চলিতেছে।

তোমার এই দাদাটির অনেক বয়স হইয়াছে, অনেকের অনেক প্রকার ঋণ এ নাগাদ শোধ করিতে হইয়াছে, তাহার এই উপদেশটা কখনো বিস্মৃত হইয়ো না যে, পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়া যত বড়ই হোক, তাহাকে দমন করার পুণ্যও সংসারে অল্প নয়।

যে বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেরায় একেবারে উপর পর্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি থিতাইয়া থাকে ত থাক্‌না। কি সেখানে আছে নাই-বা জানা গেল; কি এমন ক্ষতি?......

দুঃখের ব্যাপারে আমিই সকলকে ছাড়াইয়া চলিয়াছি, আর সবাই আমার পিছনে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া আসিতেছে—এ ধারণা সত্যও নয়, সাধু নয়। সৌভাগ্যের দম্ভে রাবণকে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু দৈন্য ও দুর্ভাগ্যের অহঙ্কারে গৌতমীকে যখন সমস্ত অর্জিত পুণ্যের জরিমানা দিতে হইয়াছিল, তখন সে বিচার ইংরেজ হাকিমের আদালতেও হয় নাই, কালা-গোরার মকদ্দমায় পিনাল কোডের ধারাতেও নিষ্পত্তি হয় নাই।...বই আমি যাই লিখিনা কেন, এলোমেলো চিঠি লেখায় আমার সমকক্ষ হইতে পারে এরূপ ব্যক্তি যথেষ্ট নাই।*

...দাদা।

[লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা ; শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে]

সমাপ্ত

গ্রন্থ-পঞ্জী

(বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম মাত্র এখানে উল্লেখ করা হ'ল।)

আত্মকথা ... ... প্রমথ চৌধুরী

আত্মচরিত ... ... রাজনারায়ণ বসু

আত্মচরিত ... ... শিবনাথ শাস্ত্রী

আত্মজীবনী ... ... দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আত্মজীবনী ... ... সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আদর্শ লিপিমালা ... ... আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ... ... চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ... ... যোগেশচন্দ্র বাগল

চারিত্রপূজা ... ... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চার অধ্যায় ... ... „

চিঠিপত্র (৫ খণ্ড) ... ... „

চিত্র-চরিত্র .. ... প্রমথনাথ বিশী

ছিন্নপত্র .. . রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবন-স্মৃতি ... ... „

জাভাযাত্রীর পত্র ... ... „

দ্বিজেন্দ্রলাল ... ... নবকৃষ্ণ ঘোষ

দেশবন্ধু-স্মৃতি ... ... হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পত্র-কৌমুদী ... . রাজেন্দ্রলাল মিত্র

পত্রাবলী .. .. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথে ও পথের প্রান্তে ... ... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্যারীচরণ সরকার ... .. নবকৃষ্ণ ঘোষ

প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন (২ খণ্ড) .. সুরেন্দ্রনাথ সেন

বাংলা সাময়িক পত্র (২ খণ্ড) ... ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ... সুকুমার সেন

বাংলার নব যুগ . .. মোহিতলাল মজুমদার

বিজ্ঞানাঞ্জন .. ... রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে .. . . ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরবলের হালখাতা ... ... প্রমথ চৌধুরী

ভানুসিংহের পত্রাবলী ... ... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা ... শান্তা দেবী
মহারাজ নন্দকুমার ... ... সত্যচরণ শাস্ত্রী
মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত ... যোগীন্দ্রনাথ বসু
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ... অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী
মহাত্মা অশ্বিনীকুমার ... শরৎচন্দ্র রায়
মধু-স্মৃতি ... ... নগেন্দ্রনাথ সোম
রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য .... .. যতীন্দ্রমোহন বাগচী
রাজা রামমোহন রায় ... ... নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ শিবনাথ শাস্ত্রী
লিপিমালা ... রামরাম বসু
শিবনাথ জীবনী ... .. হেমলতা দেবী
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (৯খণ্ড) ... ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২ খণ্ড) .. ,,
সবুজ-কথা . . . সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় . .. রামগোপাল সান্যাল
য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র ... .. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Bengal Under the Lieutenant Governors. Vol II) C. M. Buckland
English Letters of the XIX Century ... ... James Aitken.
The Life And Letters of Raja Rammohan Roy. ... Sophia Dobson Collet
The Life of Girish Chunder Ghosh. Monmotho Nath Ghosh.

(অনুসন্ধান, কর্ম্মযোগিন (ইংরেজী), প্রবাসী, বান্ধব, বঙ্গদর্শন, বঙ্গবাণী, বসুমতী, ভারতী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, শনিবারের চিঠি, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সাহিত্য ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা।)
